১২৯৮ সাল। ষষ্ঠ বর্ষ। বৈশাখ।

সাধক ও অধ্যাপক মণ্ডলীর জনৈক সেবক

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

লেখকগণ।

Printed and published for proprietor by Udoya Churan
At the New Balmick Press, 159 Manick tolla Street
Calcutta.

ষষ্ঠ বর্ষ।

৬ষ্ঠ ভাগ। বৈশাখ, সন ১২৯৮ সাল। ১ম খণ্ড।

বেদব্যাসের প্রার্থনা।

বদামস্তে কিম্বা জননি ! বয়মুচ্চৈর্জ্জড়ধিয়ো,
ন ধাতা নাপীশো হরিরপি ন তে বেত্তি পরমম্‌।
তথাপি ত্বদ্ভক্তির্ম্মুখরয়তি চাস্মকমসিতে !
তদেতৎ ক্ষন্তব্যং ন খলু পশুরোষঃ সমুচিতঃ ॥

মা! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তোমার যে অপার মহিমার ঈয়ত্তা করিতে পারেন না, আমি জড়মতি, মূর্খ, বিষয়মোহে মুগ্ধ, আমি তোমার সে দেবগণেরও অজ্ঞেয়, অবোধ্য মহিমার বিষয় কেমন করিয়া বর্ণন করিব? কিন্তু মা! আমার অনুরাগ, আমার প্রেম, আমারই রসনাকে স্থির থাকিতে দেয় না। তাই অশক্ত হইলেও এ ক্ষীণ রসনা তোমা গুণগানে সর্ব্বদা উন্মত্ত! তাই বলিয়া মা এ পশুর ন্যায় অবোধ সন্তা প্রতি বিরক্ত হওয়া উচিত নয়। অতএব এ অধমকে ক্ষমা কর।

আমরা নিরেট মূর্খ তাহাই নিজের দুঃসাহসের উপর নির্ভর করিয়া এই ঘোর কলিযুগে কলিরোগগ্রস্ত সংসারে সেই অপার অনন্ত অসীম শক্তিরূপিণী মা! তোর দুর্ভেদ্য, দুর্ব্বোধ্য, দুরধিগম্য মহিমা কীর্ত্তন করিয়া তোকে বুঝিতে ও বুঝাইতে প্রয়াস পাই। কিন্তু রসনাকে যে কিছুতেই স্থির রাখিতে পারি না। যে রসনা মা তোর গুণ কীর্ত্তন প্রয়াসী তাহাকে সংযত করি কোন্ সাহসে? তাহাই, অক্ষম বুঝিলেও তাহাকে প্রশ্রয় দিয়া থাকি।

পূর্ণ পাঁচটী বর্ষ আমরা আপন উচ্ছাসে আপনি উচ্ছসিত হইয়া মা'র গাথা গাহিয়া আসিতেছি। কি গাহিয়াছি, কেন গাহিয়াছি, তাহা মা'ই জানেন—আর জানেন মা'র প্রেমিক-সাধক-সন্তান। মা স্বয়ংই গীতায় বলিয়াছেন, যে আমি আমার প্রেমিক সাধক দ্বারাই জগতের যাবতীয় নৈবেদ্য গ্রহণ করি, যাবতীয় শ্রোতব্য শ্রবণ করি, দ্রষ্টব্য দর্শন করি। আমিই সাধক, সাধকই আমি। আমাতে আর আমার ভক্তে কোন প্রভেদ নাই। সুতরাং আমাদের তান-লয়-বিহিন গাওনা মা'র কর্ণগোচর হইয়াছে কি না তাহা বুঝিতে হইলে আমাদের অগ্রে দেখিতে হইবে যে মা'র ভক্ত সন্তানকে আমরা পরিতৃপ্ত করিতে পারিয়াছি কি না। মধ্যে মধ্যে পাঠকগণের এক আধখানি পত্র পাঠে আমাদের সে আশার সঞ্চার হয়—মনে হয় বুঝি আমাদের এ ক্ষীণ সঙ্গীত মা'র কর্ণগোচর হইয়াছে। তবে আমরা মধ্যে মধ্যে এরূপ পত্রও পাইয়া থাকি যাহাতে পাঠক বেদব্যাসের ভাবের গূঢ়তা ও কাঠিন্য জন্য কিছু অনুযোগ করিয়াছেন। কিন্তু সে অনুযোগের আমরা কোনরূপ প্রতিবিধান করিতে ইচ্ছা করি না। কেননা আমাদের প্রধানতম উদ্দেশ্যই বঙ্গীয় হিন্দু সাধারণের অন্তঃকরণে যাহাতে, ধীশক্তির বৃদ্ধি, অন্তঃসারের পরিপুষ্টি হয়, মনুষ্যত্ব সংগঠিত হয়, মানব আত্মবান হয়, তদপক্ষে চেষ্টা করা। অধ্যয়ন, শ্রবণ, শিক্ষা সমস্তেরই লক্ষ্য, পূর্ব্বোক্ত বিষয় গুলির প্রতিই থাকা উচিত। ...ন এক দুর্ভেদ্য বিষয় বা ভাব লইয়া আলোড়ন, উদ্বর্ত্তন ও রোমন্থন ...। করিয়া সেই বিষয় বা ভাবকে যত পরিমাণে সুব্যক্ত করিতে পারা ...সই পরিমাণে অন্তঃকরণের পরিপুষ্টি হইবে, অর্থাৎ অন্তঃসারের

বৃদ্ধি হইবে, ধীশক্তি পরিপুষ্ট হইবে, মনুষ্যত্ব সংগঠিত হইবে, মানব আত্মবান হইয়া প্রকৃত কল্যাণ লাভ করিবে এবং সাধারণ মনুষ্যের অজ্ঞাত গম্ভীর তত্ত্ব সকল চিদ্দর্পণে ক্রমশঃ সুন্দররূপে প্রতিভাত হইবে। নচেৎ যাহা জানি, যাহা বুঝি, যাহা রোচক তাহা লইয়া চর্ব্বিতচর্ব্বণ করান বেদব্যাসের উদ্দেশ্য নহে। বেদব্যাস সাধ্যমত মা'র নিত্য নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া, নূতন ভাবে ভাবুক হইয়া, নূতন সঙ্গীত রচনা করিয়া পাঠকের অন্তঃকরণের পরিপুষ্টির জন্য, পাঠকের ক্ষুধার্ত্ত অন্তঃকরণের সুন্দর সুন্দর সুখাদ্যের সমাবেশ করিয়া দিবেন। বেদব্যাস রঙ্গিণী নহেন যে, পাঠকের রোচক করিয়া, পাঠকেরই বুদ্ধি অনুযায়ী প্রবন্ধের অবতারণা করিয়া, কেবল পাঠকের আমোদ বর্দ্ধনে নিজ কর্ত্তব্য অবহেলা করিবেন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি বেদব্যাস আপন ভাবে বিভোর। আপন মনে আপন ধ্যানে আপনি বিভোর হইয়া বেদব্যাস মা'র মহিমা কীর্ত্তন করিবেন। ভক্ত সাধক সে কীর্ত্তন শ্রবণে নিশ্চয়ই অনুরাগী হইয়া আত্মকার্য্য সাধন করিবেন, ইহাই বেদব্যাসের দৃঢ় বিশ্বাস। বেদব্যাস বারবনিতা নহে, নটী বা ভট্ট নহে যে পর পরিতুষ্টি সাধনের জন্য, তাহাদের রোচক করিবার জন্য, নানা বিলাস দ্রব্যে বেশবিন্যাস করিয়া সাধারণের নিকট আত্মবিক্রয় করিতে প্রস্তুত হইবে। হিন্দুর বর্ত্তমান বিকৃত রুচির আমূল পরিবর্ত্তন ঘটাইবার জন্যই বেদব্যাসের জন্ম। অতএব হিন্দু! বর্ত্তমান বৃত্তির দাস হইয়া তরল চিন্তার আশ্রয় লইও না। যাহাতে অন্তঃকরণের বৃত্তি সমূহ সুগভীর ভাবরাশি ধারণ করিয়া সম্যক পরিপুষ্টি লাভে ক্ষমতাবান হয় সে পক্ষেই যত্নবান হউন। গভীরতত্ত্বের আলোচনা করিতে অভ্যাস করুন। মন যাহাতে অতিগূঢ়তত্ত্বের মধ্যেও সহজে প্রবেশ লাভে সমর্থ হয় তাহার চেষ্টা করুন, তাহা হইলেই ধীশক্তির বৃদ্ধি হইবে, অন্তসারের পরিপুষ্টি হইবে, মনুষ্যত্ব সংগঠিত হইবে, আত্মবান হইয়া প্রকৃত কল্যাণ লাভে সমর্থ হইবেন।

প্রতিমূর্ত্তিপূজা রহস্য।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

শিষ্য। আপনার উপদেশে, প্রায় সমস্ত সংশয়ই বিধৌত হইয়াছে ; কিন্তু একটি বিষয় বুঝিতে পারিলাম না। মায়ের দূরত্ব নৈকট্যাদি নাই তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, যে কোন স্থানে থাকিয়া পূজা করিলেই মা তাহা জানিতে পান ইহাতেও কিছুমাত্র সংশয় নাই, এবং প্রতিমার মধ্যে মায়ের অস্তিত্ব আছে তাহাও সত্য, আর মনুষ্য প্রতিমাদির সহিত মায়ের প্রতিমার তুলনা হইতে পারে না তাহাও বিশেষরূপে বিদিত হইয়াছে। কিন্তু প্রভো! ব্যবহার যেরূপ প্রচলিত আছে, তাহা আপনার সিদ্ধান্তের বিপরীত। প্রচলিত ব্যবহার মতে যেন অচেতন প্রতিমারই পূজা করা বিবেচিত হয়। সকলেই যেন পুত্তলকেই মা বলিয়া ডাকে, যেন তাহাকেই সম্বর্দ্ধনা করে, পুত্তলের ভালমন্দই যেন মায়ের প্রতি আরোপিত করে ; সুতরাং পুত্তল পূজা নয় বলিয়া কিরূপে বিশ্বাস করিব !

আচার্য্য।—না না। তাহা কখনই না। ভারতবর্ষের কোন ব্যক্তিই তাহা করে না। ভারতের একটি অতি সাধারণ প্রাণীও পুত্তল পূজক নহে। পুত্তলকে কেহই জগদম্বা বলে না, তাদৃশ বিশ্বাসও করে না, তাহার পূজাও করে না। পূজা করে মায়ের, দর্শন করে মায়ের, ধ্যানও করে মায়ের, মা ব্যতীত আর কিছুই কেহ অনুভব করিতে পায় না। ঐ যে কতকগুলি দুর্ভাগ্য প্রণীর আবির্ভাব হইয়াছে,কেবল উহারা ব্যতীত, আর কেহই মায়ের দর্শনে বঞ্চিত হয় না। উহারাই জড়, পুত্তলমাত্র দর্শন করিয়া মাতৃদর্শনের আনন্দে প্রবঞ্চিত হয়। কিন্তু হিন্দু সন্তানগণ তাহা নহেন। তাঁহারা কেহই পুত্তলের কোন ধার ধারেন না। তাঁহারা দৃষ্টি প্রসারণ করিলেই পুত্তলের আকার অন্তর্হিত হইয়া যায়। কেবল মায়ের আকার মাত্রই তাঁহাদিগের নয়ন-গৃহের অতিথি হইয়া থাকে।

শিষ্য। আমি সামান্যজ্ঞানে, এ কথার রহস্য ভেদ করিতে প্রারি নাই। ইহা যেন দৃষ্টি বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত বলিয়া বিবেচনা হইতেছে। আপনি অনুগ্রহ

পূর্ব্বক একটু বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দেন। জড় প্রতিমাকার যদি কোন পূজকের নয়ন গোচর না হয়, তাহার সহিত যদি উপাসকের ধ্যানস্থানের কোন সংস্রব না থাকে, উপাসক মাত্রেই যদি জড় প্রতিমাংশ বাদ দিয়া মায়ের রূপেরই দর্শন, স্পর্শন, ধ্যান মনন করে, তবে যদৃচ্ছাক্রমে যেখানে সেখানে সাধারণ মৃৎপিণ্ডাদিতে মায়ের পূজা না করিয়া, মায়ের মূর্ত্তির ন্যায় প্রতিমূর্ত্তি গঠন করে কেন? মা সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমানা রহিয়াছেন, তাঁহার আকার প্রকার ঐশ্বর্য্য মহিমাদি ও সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতেছে, সুতরাং যথেচ্ছা ক্রমে সকলস্থানেই মায়ের পূজা করা যায়। কিন্তু তাহা না করিয়া মৃত্তিকার দ্বারা হস্ত পদাদি অবয়ব গঠন করার উদ্দেশ্য কি? ঐ সকল হস্ত পদাদিকে যদি মায়ের হস্ত পদাদি না বলা হয়, কিম্বা না ভাবা হয়, তবে উহা নির্ম্মাণ করায় কোনই প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। পুত্তলের করচরণাদিকে মায়ের করচরণ বলিয়া ধরিয়া লয় বলিয়াই, পুত্তল-নির্ম্মাণের আবশ্যকতা বিবেচনা হয়। প্রচলিত ব্যাবহারও ইহারই আনুকূল্যে প্রমাণ করিয়া দেয়। পূজাকালে, পুত্তলের পায়েই পাদোদক দান করিয়া থাকে, অর্ঘ্যও পুত্তলেরই মস্তকে সমর্পিত হয়, আচমনীয় এবং মধুপর্ক তাহারই মুখস্থান লক্ষ্য করিয়া প্রদত্ত হয়, গন্ধ চন্দন, পুষ্পাভরণ, পত্রাদিও পুত্তলের যথা নিয়মিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সুসজ্জিত ও বিন্যস্ত হইয়া থাকে। অতএব পুত্তলকেই মা ভাবিয়া, এবং তাহার জড় অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি গুলিকেই মায়ের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিরূপে ভ্রান্তি বিশ্বাস করিয়া জড় পুত্তলের অর্চ্চনা করাই সপ্রমাণ হয়। জড় পুত্তলের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি যদি মায়ের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলিয়া বিশ্বাস না থাকে, তাহাকেই যদি মা বলিয়া না দেখে, পুত্তল যদি অন্যান্য সাধারণ দ্রব্যের ন্যায়, মায়ের অধিষ্ঠান স্থান মাত্র বলিয়া নিশ্চিত হয়, তবে উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রমে পূজা করিলেও কোন দোষ হইতে পারে না, পুত্তলের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিপরীত ক্রমে মায়ের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পূজা বা পরিকর্ম্মাদি করিলেও, বোধ হয়, কোনই হানি হয় না। আপনিই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "মা সর্ব্বত্রই সর্ব্বাবয়ব, সর্ব্বমহিমা ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যাদির সহিত সমভাবে বিরাজ করিতেছেন" সুতরাং পুত্তলের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যেই সর্ব্বাবয়বাদিবিশিষ্টা, পরিপূর্ণা মায়ের অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহার

পদদেশেও মা হস্তপদাদি সমস্ত অবয়বান্বিতা হইয়া দেদীপ্যমানা আছেন, প্রত্যেক হস্তে এবং হস্তাঙ্গুলীতেও মা সর্ব্বাবয়ববিশিষ্টা হইয়া বিরাজ করিতেছেন, এবং মুখ নাসিকাদি প্রত্যেক অবয়বেই মা ঐরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। অতএব, প্রতিমার কেবল পদদেশেও মায়ের করচরণ মস্তকাদি সমস্ত অঙ্গের উপহার দেওয়া যাইতে পারে, এবং কেবল মুখপ্রদেশেও মায়ের পাদোদকাদি সর্ব্বাঙ্গের উপকরণ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহা বোধ হয় কেহ কখনও করেন না, পুত্তলের অঙ্গানুক্রমেই মায়ের অঙ্গের উপহার প্রদত্ত হইয়া থাকে। সুতরাং জড় পূজাই সপ্রমাণ হইতেছে। অথচ আপনি প্রতিজ্ঞার ন্যায় প্রকাশ করিতেছেন,"ভারতের একটি হিন্দুও পুত্তল পূজক নহে।" সুতরাং আমার হৃদয় অতিশয় সমালোড়িত হইয়াছে। আপনি কৃপা প্রকাশে এই দুর্নিবার সন্দেহ অপনোদন করুন।

আচার্য্য। বৎস! তোমার সারগর্ভ সংশয়াবলী শুনিতে পাইয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম। আমি, যথাশক্তি, ইহার মীমংসার চেষ্টা করিতেছি। তুমি শ্রদ্ধা সহকারে অভিনিবিষ্ট হইয়া শ্রবণ করিবে।

তোমার এই প্রসঙ্গের সংশয়াবলী হইতে আমি চারিটি প্রশ্নের নিষ্কাসন করিলাম। তুমি ভাবিয়া দেখ, তোমার অভিপ্রায়ানুরূপ হইয়াছে কি না।

১ম। পুত্তলের যদি কেহ পূজার্চ্চনা না করেন তবে, যে কোন আধারেই সর্ব্বব্যাপিকা মায়ের আরাধনা না করা হয় কেন।

২য়। উপাসক দৃষ্টি করিবেন পুত্তলের প্রতি, অথচ পুত্তলের আকার প্রকার এবং রূপাদি তাঁহার নয়ন গোচর হইবে না, তিনি সনাতনী মায়ের রূপই সন্দর্শন করিবেন ইহা কিরূপে সঙ্গত হয়।

৩য়। যদি মৃণ্ময়াদি মূর্ত্তি কেহ না দেখিতে পান আর তাহার পূজাও না করেন তাহা হইলে পুত্তলের প্রয়োজন কি।

৪র্থ। পুত্তলের করচরণাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পাদ্য অর্ঘ্যাদি সমর্পণ করিয়াই সকলে অর্চ্চনা করেন, অথচ তাহা পুত্তলের পূজা নহে একথা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়।

কেমন, এই চারিটিইত তোমার অভিমত—সার প্রশ্ন?

শিষ্য। আজ্ঞা, হ্যাঁ, এই কএকটি বিষয়ই আমার সার জিজ্ঞাস্য।

আচার্য্য। তবে শ্রবণ কর, আমি যথাক্রমে এক একটির মীমাংসা করিতেছি।

প্রথম প্রশ্নের মীমাংসা।

আচার্য্য। বাবা! তোমার প্রথম প্রশ্নটি শুনিয়া নিতান্ত বিস্মিত ও দুঃখিত হইলাম। তুমি, হিন্দুবংশে, বিশেষ ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যে, এপর্য্যন্ত হিন্দুর প্রাত্যহিক উপাসনাটিও দেখিতে পাও নাই ইহা নিতান্তই শোচনীয় বিষয়! হিন্দুগণ বারমাস মধ্যে অতি অল্প দিনই প্রতিমূর্ত্তির উপরে মায়ের পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু অবশিষ্ট সমস্ত দিনেই জল, মৃত্তিকা (ঘট) পাষাণ (সালগ্রামশিলা) এবং বাণ লিঙ্গাদি) পুষ্প, চন্দন বা বৃক্ষাদির উপরে মায়ের পূজা করিয়া থাকেন। হিন্দু পূজা না করেন এমত স্থান অতি অল্পই থাকিতে পারে। মাকে সর্ব্বব্যাপিকা রূপে জানেন বলিয়াই হিন্দুগণ এইরূপ অর্চ্চনা করিতে পারেন এবং করেন। ইহা আর কোন সম্প্রদায়ে মানেওনা করেওনা। তবে তুমি, এইরূপ সাধারণ পূজা স্থল থাকিতে, আবার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণের প্রয়োজন কি ইহা জিজ্ঞাসা করিলে করিতে পার। কিন্তু সে বিষয় আমি তৃতীয় প্রশ্নের মীমাংসার সঙ্গেই উপস্থিত করিব।

দ্বিতীয় প্রশ্নের মীমাংসা।

আচার্য্য। এখন দ্বিতীয় প্রশ্নের বিষয় বলিব। প্রথমে তুমি আমার একটি প্রশ্নের উত্তর করিয়া বুঝাইয়া দেও। ঐ যে গঙ্গাস্নান পথে, অশ্বথ বৃক্ষটির তলে একটি স্ত্রীলোক দেখাযাইতেছে ইনি কি নিমিত্ত প্রায় একঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত ওখানে দাঁড়াইয়াআছেন জানিয়া আইস দেখি?

শিষ্য "যে আজ্ঞা" বলিয়া, ধীরে ধীরে সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, একটি স্থবিরা আর্য্যগেহিনী নিস্তব্ধভাবে সকুম্ভকক্ষে দণ্ডায়মানা। সেখানে অনেক দিন যাবৎ "বারএয়ারি" পূজা হইয়া গিয়াছে। মূল দেবতার প্রতিমূর্ত্তির নিরঞ্জন হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার সমভিব্যাহারের কয়েকটি অপূজিত বালকবালিকার পুত্তল, দর্শন প্রমোদের নিমিত্ত, যথাযথ সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছে। স্থবিরা নারীটি তাহার একটির প্রতি অনিমেষ

নয়নে দৃষ্টি করিয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার সজল নয়নদ্বয়ের বক্ষে যেন স্নেহের তরঙ্গলহরী উদ্গীর্ণ হইতেছে, বেগবান্ আগ্রহের প্রবাহ যেন রাশি রাশি বিসর্পিত হইয়া মূর্ত্তিটিকে ডুবাইয়া ফেলিয়াছে। তাঁহার হৃদয়ের প্রেমাকর্ষণই যেন প্রবলতর হইয়া মূর্ত্তিটিকে একস্থানে স্থিরভাবে বসাইয়া রাখিয়াছে। অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়া গণ্ডস্থল দ্রব করিয়াছে, নির্ম্মল আনন্দের প্রভা যেন শোকের কলঙ্কে ঘেরিয়া রাখিয়াছে, মুখমণ্ডলে যেন অভাবের ভাব আর ভাবের ভাব—যেন প্রাপ্তির ভাব আর অপ্রাপ্তির ভাব—যুগপৎ সমুপস্থিত হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছে, তরল মেঘমালা সমাবৃত সন্ধ্যাকাশে যেন পূর্ণশশীর প্রভামালা মিশ্রিতা হইয়াছে। স্থবিরার অন্য দৃষ্টি নাই, অন্য মন নাই, অন্য জ্ঞানও নাই। তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত অন্তঃকরণ এবং সমস্ত আত্মা ও দেহ যেন ঐ মূর্ত্তিটিতে সমর্পিত হইয়া অচেতনমূর্ত্তিটি চেতনা হইয়াছে, এবং পুত্তলের জড়তা গুণ স্থবিরার বিনিময় প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনি জড় মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। এই অবস্থায় থাকিয়া, বিকার প্রাপ্ত যোগীর ন্যায়, অতি মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে পুত্তলের সহিত দুই একটি স্নেহমাখা আলাপ সম্ভাষণ করিতেছেন। শিষ্য, এই ঘটনা দেখিয়া ক্ষণকাল বিস্ময়স্তিমিত ও কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। অনন্তর, গুরুর আদেশমতে অতি সম্মানের সহিত ধীরে ধীরে মৃদুভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন।

জিজ্ঞাসু।—মা গো! আমাকে আপনি সন্তান স্বরূপে গ্রহণ করুন! আমি একটি বিষয় জানিবার নিমিত্ত আপনার সমীপবর্ত্তী হইয়াছিলাম, এখন আপনার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া অতীব বিস্মিত ও প্রবলতর জিজ্ঞাসোৎসুক হইয়াছি। মা! আপনি কি নিমিত্ত এরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, আপনি কে? কোন বাধা না থাকিলে, তাহা অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলেই আমি পূর্ণাভিলাষ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইব।

এইরূপ তিন চারিবার বলিলে, স্থবিরার শ্রবণদ্বার উদ্ঘাটিত হইল, তাঁহার হৃদয় এবং নয়ন ঐ পুত্তল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল। তখন অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা হইয়া জিজ্ঞাসুকে বলিলেন।

স্থবিরা। বাবা! আমি একজন হতভাগিনী নারী। এই গ্রামবাসী

সর্ব্বপূজনীয় অধ্যাপক মহাশয় আমার পরম গুরু। আমি এই গঙ্গা স্নান হইতে আসিয়া আমার ভবানন্দকে দেখিতেছিলাম, এবং দুই একটি মনের কথা বলিতেছিলাম। এখন কর্ত্তার আহ্নিকের সময় হইল, বাড়ী চলিলাম।

জিজ্ঞাসু। মা! আপনার ভবানন্দ কোথা?

এই কথার অর্দ্ধ শ্রবণ মাত্রে, পণ্ডিত পত্নীর হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, প্রাণ আকুল হইল, নয়নদ্বয় অশ্রুধারা আবিলীকৃত হইল, গণ্ডস্থল আর্দ্র হইয়া গেল। এবং বলিতে লাগিলেন।

স্থবিরা। বাবা! আজ ছয় মাস যাবৎ ভবানন্দ, পাঁচ বৎসরের হইয়া, এ অভাগিনীকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে,দারুণ শমন আমার ভবানন্দকে সহিতে পারিল না। এইযে, গৃহের উত্তর ভাগে বালকের পুত্তলটি দেখিতেছ, ইহা ঠিক আমার ভবর অনুরূপ! তাকাইলে, যেন আমার ভবানন্দকেই গড়িয়া রাখিয়াছে বলিয়া মনে হয়, যেন আমার ভবানন্দই বসিয়া রহিয়াছে। তাই যেতে আস্‌তে ইহার প্রতি দৃষ্টি পড়িলেই আমার ভব আসিয়া উপস্থিত হয়। এই পুত্তল আমার জাগ্রত ভব হইয়া পড়ে। ভব আমার চাঁদমুখে হাসিয়া হাসিয়া কথা বলিতে থাকে। তাই এখানে সময়ে সময়ে দাঁড়াইয়া থাকি।

এই বলিয়া পুনর্ব্বার পুত্তলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিহ্বলা হইলেন। জিজ্ঞাসু অনেক সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহাকে শান্ত্যকরিয়া গৃহে প্রেরণ করিলেন, এবং আচার্য্যের নিকট পুনরুপস্থিত হইয়া আনুপূর্ব্বীক্রমে সমস্ত বিষয় নিবেদন করিলেন।

আচার্য্য। কেমন, বাবা! এই দৃশ্যের দ্বারা তোমার কিছু শিক্ষা হইয়াছে কি?

শিষ্য। না, প্রভু! আমিত বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারি নাই! উহাতে আমার আলোচিত বিষয়ের কিছু শিক্ষা হইতে পারে কি না তাহাওত আমি চিন্তা করি নাই!

আচার্য্য। ঐ স্থবিরা দেবীর ভবানন্দ-দর্শন ঘটনার ন্যায়, আমাদের মায়ের দর্শন ঘটনা সম্ভবপর হইতে পারে কি না?

শিষ্য। আজ্ঞা না, তাহা কিরূপে হইবে?

আচার্য্য। ইনি পুত্তল বালকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভবানন্দ দর্শন করিলেন কিরূপে?

শিষ্য। কিরূপে করিলেন, তাহা ঠিক বলিতে পারিব কি না জানি না। তবে যাহা বিবেচনা হয়, তাহা আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি।

ভবানন্দের আকৃতিটি অক্ষুণ্ণরূপে মা ঠাকুরাণীর হৃদয়পটে অঙ্কিত রহিয়াছে। এখন ঐ প্রতিকৃতি দর্শনমাত্রেই তাহার স্ফুরণ হইয়াছে।

আচার্য্য। তৎপর?

শিষ্য। তৎপর আর বলিতে পারি না, আপনিই অনুগ্রহ পূর্ব্বক বুঝাইয়া দিন।

আচার্য্য। তৎপর ভবানন্দের আকার পরিস্ফুরিত হইয়া ইহাঁর হৃদয় এবং নয়ন পরস্পরে পরস্পরের অনুপাতী হইয়া যেন এক হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং উভয়ের ক্রিয়া এবং বিষয়ও যেন একই হইয়া প্রকাশ পাইতেছিল। ইহাঁর হৃদয়ের বিষয় ছিল ভবানন্দ এবং নয়নের বিষয় ছিল ভবানন্দের প্রতিকৃতি ঐ পুত্তলটার আকার। আর মনের ক্রিয়া হইল ভবানন্দের আকৃতির উদ্গীরণ করিয়া চক্ষুর নিকটে সমর্পণ করা, এবং চক্ষুর ক্রিয়া হইল প্রতিমূর্ত্তি পুত্তলের আকার উদ্ভাসিত করিয়া মনের নিকট সমর্পণ করা। এতদুভয় বিষয় এবং উভয়বিধ ক্রিয়াই যেন এক হইয়া গিয়াছিল। নয়নধারাবাহীক্রমে বাহির হইতে পুত্তলের রূপাদি লইয়া মনের নিকট যাইতেছিল, মনও ভবানন্দের আকার লইয়া নয়নের নিকট যাইতেছিল। এইরূপে উভয়ের আনুকূল্যে উভয়ের একত্ব ঘটনা হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং পুত্তলের আকার আর ভবানন্দের আকারও মিশাইয়া গিয়া এক হইয়াছিল। নয়ন যাহা দেখিতেছিল তাহার মধ্যেও ভবানন্দের আকার মিশ্রিত রহিয়াছিল, আবার মন যাহা দেখিতেছিল তাহাতেও পুত্তলের আকার মিশ্রিত রহিয়াছিল। সুতরাং এই অবস্থায় ইহাঁর চক্ষুও ভবানন্দ আর পুত্তল এতদুভয়ই দেখিতেছিল, মনও ভবানন্দ আর পুত্তলই দর্শন করিতেছিল।

অবশেষে মনের বল বৃদ্ধি পাইল। কারণ মনই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিয়োক্তা,

মনের অধীন হইয়া, মনের ইচ্ছানুসারেই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া হইয়া থাকে, কিন্তু মনের ক্রিয়া ইন্দ্রিয়ের নিয়োগাধীন নহে। অতএব কেবল নয়নেন্দ্রিয়ের বিষয় পুত্তলের রূপ নয়নের আকৃতির মধ্যে ডুবিয়া গিয়া অন্তর্হিত হইল। সুতরাং চক্ষুও কেবল ভবানন্দই দর্শন করিতে লাগিল। পুত্তলের আকারের মধ্যে ভবানন্দের আকার হইতে বিভিন্নরূপ বা বিরুদ্ধরূপ যে সকল জড়ভাবাদি ছিল তাহা চক্ষুর আড়ালে পড়িল। চক্ষুর নিকট, তখন পুত্তল চেতন ভবানন্দ হইয়া পড়িল। মন যে রূপের স্থাপন করিয়াছে কেবল সেইরূপ—সেই চেতন ভবানন্দ মাত্রই—নয়নের ক্রোড়ে বিরাজ করিতে লাগিল। ঠিক এইরূপ অবস্থায়ই ইনি ভবানন্দের আনন্দে পুলকিতা হইয়া উহাকে সস্নেহ বাক্যাদির প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

কথাটা না বুঝিয়া থাকত, আর একটুক বিশদ করা যাইতেছে। স্থবিরা দেবী, যে পুত্তলকে তাঁহার পুত্র বলিয়া দেখিতেছিলেন তাহাতে আংশিক বিরুদ্ধ দুই জাতীয় ধর্ম্ম আছে। এক উহার আকার প্রকার দৈর্ঘ্য,প্রশস্ততা ও বর্ণাদি; দ্বিতীয়, মৃণ্ময়ত্ব জড়ত্বাদি। তন্মধ্যে উহার প্রথম জাতীয় গুণ গুলি হয়ত ইহাঁর পুত্র ভবানন্দের ঠিক সদৃশ হইতে পারে। সুতরাং ওগুলিকে ভবানন্দের গুণ বলিয়াই বলা যাইতে পারে। কারণ ভবানন্দেও ঠিক ঐ সকল গুণ ছিল। আর ঐ দ্বিতীয় জাতীয় গুণগুলি কেবল পুত্তলের, উহা ভবানন্দের নহে, ভবানন্দের মৃণ্ময়ভাব জড়ভাবাদি ছিল না। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, উক্ত উভয়বিধ দৃশ্যের মধ্যে কেবল পুত্তলের গুণগুলি উহঁার কেবলমাত্র নয়নের দৃশ্য,আর উহাতে ভবানন্দের যে গুণগুলি আছে তাহা উহঁার নয়ন এবং মন এতদুভয়ের দৃশ্য। তন্মধ্যে তুমি যে অবস্থায় উহঁাকে দেখিয়াছিলে তখন, উহঁার নয়নে কেবল ঐ ভবানন্দের গুণগুলিই প্রকাশ পাইতেছিল, এবং কেবল পুত্তলের গুণগুলি অন্তর্হিত হইয়াছিল। তাই বলিয়াছি যে পুত্তল উহঁার দৃষ্টির অগোচর হইল।

কিন্তু তথাপি ইহা বুঝিতে হইবে যে, ঐ পুত্তলের নিজগুণ জড়ত্ব মৃণ্ময়ত্বাদি যে কখনও একবারও কিছুমাত্র উহঁার নয়নক্ষেত্র অধিকার করিতেছিল না তাহা নহে। থাকিয়া থাকিয়া একএকবার উহারাও অতি সামান্য মাত্রায় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিস্ফুরিত হইত। যখন ঐরূপ হইত

তখনই উহাঁর আনন্দের প্রতিদ্বন্দ্বী নিদারুণ শোকের উদ্দীপন হইত। ভাবের মধ্যে অভাব কালিমা আসিত, চন্দ্রপ্রভা মেঘাবৃতা হইত। তাই তুমি আনন্দ এবং শোক এতদুভয়ের লক্ষণ দেখিয়াছিলে, এবং অভাব ও ভাবের বিগ্রহ দেখিয়াছিলে। পরে যখন তোমার বাক্যের দ্বারায় উহাঁর মন অন্যদিকে আসিল, তখন নয়ন একাকী থাকিল, এবং কেবল নিজের বিষয় সেই জড়ত্ব মৃণ্ময়ত্বাদি মাত্রই দেখিতে লাগিল, স্থবিরার সুখতৃপ্তি-তিরোহিতা হইল, কেবল শোকের ভাব আসিল, সুতরাং রোদন করিতে করিতে বাড়ী চলিয়া গেলেন। ইহাই ঐ স্থবিরা দেবীর ঘটনা। কেমন, সব বুঝিতে পাইলে ত ?

শিষ্য।—আজ্ঞা হ্যাঁ, আমি যথোচিত তৃপ্ত হইয়াছি। উহার দ্বারা প্রস্তাবিত বিষয়ের কি সহায়তা হইল তাহা বুঝিতে পারিলেই চরিতার্থ হই।

আচার্য্য। তুমি বুঝিতে পারিবে কি না তাহা আমার ক্ষমতাধীন নহে। তাহা মায়ের কৃপা আর অকৃপার অধীন। মায়ের অনুগ্রহ হইলেই তাঁহার রহস্য ভেদ করিতে পাইবে। অতএব তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া মনোনিবেশ পূর্ব্বক শুনিতে থাক।

প্রস্তাবিত স্থলে, যদিও ঠিক সর্ব্বাংশেই উক্ত দৃষ্টান্তের যোজনা হইবে না সত্য ; কারণ উভয় স্থলের অনেকাংশেই পার্থক্য ও বিসদৃশতা আছে। পুত্তল আর ভবানন্দের যেরূপ সম্বন্ধ,মা আর প্রতিমার সেইরূপ সম্বন্ধ নহে। পুত্তল বাহিরের সামগ্রী বাহিরেই থাকে, আর ভবানন্দের মূর্ত্তি উহাঁর মনের মধ্যে অবস্থিতি করে, বাহিরের পুত্তলের মধ্যে কেবল তাহার মিথ্যা কল্পনা মাত্র। ভবানন্দ ব্যক্তি তখন বিদ্যমানই নাই,—মনেও নাই, বাহিরেও নাই। সুতরাং পুত্তলের সহিত তাহার মিথ্যা পরিকল্পনা সম্বন্ধ মাত্র। কিন্তু এই শ্যামা প্রতিমা আর মায়ের সেইরূপ সম্বন্ধ নহে। মায়ের আকার এই শ্যামা প্রতিমার অন্তর বাহিরেও সত্যসত্যই বিরাজ করিতেছে, মা এখানে দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন, আবার সাধকের হৃৎক্ষেত্রেও মা সত্যসত্যই দেদীপ্যমানা। সুতরাং পুত্তলের মধ্যে মায়ের মিথ্যা কল্পনা হইল না, এবং পুত্তলের সহিত মায়ের আধারাধেয় ভাব অথবা তাদাত্ম্য সম্বন্ধই বলিতে

পারা যায়। অতএব উভয়ত্র একপ্রকার সম্বন্ধ হইল না। এই কথাটি স্মরণ রাখিয়া এখন প্রকৃত বিষয় শুন।

কথিত দৃষ্টান্তের দ্বারা একথাটি বোধ হয়, তুমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছ যে পুত্তলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাকিবে অথচ পুত্তলের জড়ত্ব, মৃণ্ময়ত্বাদি গুণ তাহার চক্ষে পতিত হইবে না, এরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে; কেমন, বটে তো?

শিষ্য। আজ্ঞা হঁ্যা তাহা বুঝিয়াছি, এখন তাহার পর হইতে বলুন।

আচার্য্য। এই স্থবিরার ভবানন্দ জ্ঞানটিকে তুমি ভ্রান্তি জ্ঞান বলিয়া বিশ্বাস করিও না। ভ্রান্তিজ্ঞানের কতক লক্ষণ এখানে আছে বটে কিন্তু বাস্তবিক ইহা ভ্রান্তি নহে। শাস্ত্রে ইহাকে "বিকল্পজ্ঞান" বলে। বস্তুর প্রকৃততত্ত্ব বুঝিয়া শুনিয়া যদি অন্যরূপ কল্পনা করিয়া লয় তাহারই নাম বিকল্পজ্ঞান। এখানে পুত্তলের কি পুত্তলত্ব জানিয়া শুনিয়াই ঐ স্ত্রীলোকটি উহাকে নিজের ইচ্ছায় ভবানন্দ রূপে কল্পনা করিয়া লইয়াছেন, এজন্য ইহা বিকল্পজ্ঞান হইল। বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব না জানিবার বলি প্রথম হইতেই অন্যরূপে ধারণা করিয়া লয় তাহার নাম ভ্রান্তিজ্ঞান। যেমন রজ্জুকে না জানিয়া তাহাকে সর্প বলিয়া ধারণা করা ইত্যাদি। অতএব স্থবিরায় ভ্রান্তিজ্ঞান হয় নাই। ভ্রান্তিজ্ঞান হইলে উহা দৃষ্টান্ত স্থলে উপনীত হইতে পারে না, ইহা স্মরণ রাখিও। এখন প্রকৃত বিষয় শ্রবণ কর।

ভবানন্দের প্রতিমূর্ত্তির পুত্তলের মধ্যে দুই জাতীয় রূপাদি দেখিয়াছ ইহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। মায়ের প্রতিমূর্ত্তির মধ্যে কিন্তু কেবল দুই জাতীয় রূপাদি নহে, ইহাতে তিন প্রকারের রূপাদি গুণ আছে। এক, পুত্তলের মৃণ্ময়ত্ব জড়ত্বাদি; দ্বিতীয়, মায়ের আকার প্রকার ও রূপাদির সদৃশ রূপাদি; তৃতীয়, মায়ের প্রকৃত নিজরূপাদি। মা সর্ব্ব-মহিমা ঐশ্বর্য্যাদির সহিত সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজ করিতেছেন, এবিষয় পূর্ব্বেই বিস্তার ও বিষদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

উক্ত তিনটির মধ্যে, জড়ত্ব মৃণ্ময়ত্বাদির সহিত মায়ের কিছুমাত্র সংস্রব নাই, সাদৃশ্যাদিও নাই। উহা মায়ের অসম্পৃক্ত, উহা পুত্তলের নিজ গুণ। আর স্বীয় প্রকাশক আকার, হস্ত পদাদি অবয়ব এবং

অঙ্গের রূপাদি যাহা কিছু আছে তাহার সহিত মায়ের সম্বন্ধ আছে। তাহা মায়ের আকারের সদৃশ। অতএব উহা মায়ের অসম্পৃক্তরূপে পুত্তলের ধর্ম্ম নহে, কিন্তু সম্পৃক্ত বা সম্বদ্ধরূপে। আর তৃতীয়টীর সহিত পুত্তলের নিজস্ব রূপে কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। উহা পুত্তলের মধ্যে থাকিলেও মায়ের নিজের ধর্ম্ম।

এখন ঘটনার যোজনা করিয়া লও। সাধক যখন প্রতিমা নিকটে করিয়া মায়ের অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন প্রতিমার দিকেই দৃষ্টি করিয়া থাকেন। কেবল তখন কেন, উপাসনার আদ্যোপান্তই তাঁহার দৃষ্টি প্রতিমাতেই নিপতিত হয়। এবং প্রতিমার নিজগুণ মৃণ্ময়ত্ব জড়ত্বাদি আর মায়ের সদৃশ আকার প্রকারাদির দর্শন হইতে থাকে, তাঁহার নয়নগোলকে তখন কেবল তাহাই প্রতিফলিত হয়। নয়নও তখন সেই পৌত্তলিক আকার প্রকারই মনের নিকটে সমর্পণ করে। সর্ব্ব বিষয়ের পরীক্ষক, সর্ব্ববিষয়ের সঙ্কল্পক ও বিকল্পক মন মহাশয়ের আজ্ঞা প্রতিপালনের নিমিত্ত, তাঁহার ইঙ্গিত পালন হইল কি না, তাহা পরীক্ষা করার নিমিত্ত তাঁহার নিকট উপনীত করে। মন, ভৃত্য প্রদত্ত উপহার প্রাপ্ত হইয়া তাহার পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। তখন তাঁহার নিজের নিকট যে মায়ের প্রকৃত মূর্ত্তি, মায়ের আনন্দময়ী প্রতিমা বিরাজ করিতেছে তাহা আনিয়া নয়নের নিকটে উপস্থিত করেন, এবং নয়ন প্রদত্ত ছবির সহিত তুলনা করিয়া থাকেন, দেখেন তুলনায় উভয়ের নিতান্ত অনৈক্য, নিতান্ত বিসদৃশতা। তাঁহার নিজের নিকটে আনন্দময়ী চৈতন্যবতী জাগ্রতী মা বিরাজ করিতেছেন। আর চক্ষুর প্রদত্ত বিম্বটী তাহা নহে। উহা নিতান্ত জঘন্য, উহা মৃণ্ময় জড়ভাব প্রকাশক, এবং মায়ের সদৃশ কতকগুলি আকার প্রকারের অভিব্যঞ্জক, কিন্তু সত্য মায়ের বিম্ব নহে। ইহা দেখিয়া ভৃত্যের উপর নানাবিধ তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া মায়ের প্রকৃত মূর্ত্তিটি তাহাকে দিয়া পরীক্ষা পূর্ব্বক মায়ের যথার্থ মূর্ত্তির ছবি আনিবারনিমিত্ত পুনর্ব্বার নয়নকে প্রেরণ করেন।

নয়ন প্রভুর আজ্ঞা প্রণোদিত হইয়া, প্রভুর নিগ্রহে উত্তেজিত হইয়া পুনর্ব্বার মায়ের পুত্তল প্রতিমূর্ত্তির নিকট উপস্থিত হয়, এবং অতি অভিনি-

বেশ ও প্রযত্ন সহকারে পুত্তল হইতে মায়ের প্রকৃত রূপ বাছাই করিয়া চুণিয়া লইবার চেষ্টা করিতে থাকে। কিন্তু প্রথমেই তাহার ফল লাভ করিতে পারে না। এবারও সেই জড়তাময় ভাব আসিয়াই উপস্থিত হয়। ক্রমে আরও তীব্রতর আগ্রহ সহকারে মায়ের প্রকৃত রূপের অন্বেষণ করিতে থাকে, প্রতিমার প্রতি অণুতে অভিনিবিষ্ট ও অণুপ্রবিষ্ট হয়। কিন্তু এবারও প্রকৃত ফল লাভ হয় না। প্রত্যুত উহার জড়তা সম্পর্কাধীন প্রভু প্রদত্ত মায়ের সেই প্রকৃত আদর্শটিও মলিন হইয়া পড়ে। মায়ের প্রকৃত ছবিও যেন জড়াকার হইয়া আইসে। নয়ন সেই প্রকৃত ছবি ভুলিয়া যায়। সুতরাং বিশেষ পরীক্ষা করিতে না পারিয়া উভয় বিমিশ্রিত অপরিস্ফুট-প্রায় সেই জড়াকারকেই লইয়া গিয়া এবারও মনের নিকট উপনীত করে। মন মহাশয় এবারও ভৃত্যকে অকৃতকার্য্য জানিয়া নিগ্রহানুগ্রহ সহকারে, স্বয়ং চক্ষুর পশ্চাৎ পশ্চাতে মায়ের প্রকৃত ছবিখানি ধরিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যক্ষ রূপে অগ্রসর হয়েন। তখন নয়ন আর মন যেন এক হইয়া যায়, উভয়ের প্রার্থক্য অনুভব করা যায় না।

এবার প্রভু সঙ্গে সঙ্গে আছেন, এবার আর চক্ষুর কোন দুষ্কাম করার জো নাই। এবার যতক্ষণে পার যেমন করিয়া পার মায়ের প্রকৃত মূর্ত্তি আনিতেই হইবে; নতুবা নিস্তার নাই। এবার নয়ন "হা মা!—কোথায় মা!" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের অন্বেষণ করিতে থাকে; অশ্রু-ধারায় গণ্ড,বক্ষ ভাসিয়া যায়, জলধারার সঙ্গে সঙ্গে নয়নের কপটতাদি মলমালিন্য যাহা কিছু থাকে তাহাও কমিয়া যায়, সুপ্রসন্নতা হয়, দীনভাব হয়, মায়ের প্রতি ঐকান্তিকতা হয়। সুতরাং মাও কতকটা কৃপা দৃষ্টি না করিয়া স্থির থাকিতে পারেন না। এবার জড়ত্ব মৃণ্ময়ত্বাদি খাটি পৌত্তলিক গুণগুলি আর নয়নক্ষেত্রে স্থান পাইল না। উহারা সেখানে প্রবেশ করিয়াও নিকটবর্ত্তিনী মায়ের সত্য মূর্ত্তির প্রভায় পরাজিত হইয়া তাহার মধ্যেই ডুবিয়া গেল, অদৃশ্য হইয়া পড়িল। কিন্তু মায়ের প্রকৃত মূর্ত্তি পাওয়া গেল না। এবার এই প্রতিমার, মধ্যেই মায়ের সদৃশ যে সকল আকার প্রকার রূপাদি আছে তাহা প্রকাশ পাইতে লাগিল। কিন্তু মন সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহার নিকট যে মায়ের আনন্দময়ী চৈতন্যময়ী জাগ্রতী মূর্ত্তি আছে

তাহার সহিত উহা মিলিল না। কারণ উহা জড় পুত্তলের রূপ, এবং তাহারই আকার প্রকার মাত্র। উহাতে মায়ের আকার প্রকার রূপাদির সাদৃশ্যথাকিলেও ঠিক মায়েরই উহা নহে। সুতরাং উহা কৃত্রিম রূপ। উহা দেখিলে মা-দর্শনের তৃপ্তিলাভ হইতে পারে না। সুতরাং নিতান্ত প্রব্যথিত হইলেন, এবং মায়ের প্রকৃত মূর্ত্তিখানি পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধরিয়া আবার নয়নের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিমার দিকে চলিলেন। নয়নকে নানা-বিধ তাড়ন পীড়ন করিতে লাগিলেন। চক্ষুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তীব্রতর বলের দ্বারা তাহার বল অভিভূত করিলেন। নির্ম্মল মনের অণু প্রবেশ বশতঃ চক্ষুর অপাটবাদি সমস্ত দোষ তিরোহিত হইল, অভি-মান জড়ত্বাদি সমস্ত মলমালিন্য নিঃশেষিত হইল, নয়ন পরিষ্কৃত হইল। তখন প্রভুর অশ্রুবলে পরিভূত হইয়া,নয়ন দুর্ব্বল,দীনহীন ক্ষীণ হইয়া "মা! কৈ, মা! কৈ" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে মায়ের দিকে তাকাইয়া অবসন্ন ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল, নিস্তব্ধ, নিশ্চল হইল, স্পন্দন রহিত হইল, অন্যদিকে গতি রহিত হইল। আর কি মা স্থির থাকিতে পারেন? মা কি সন্তানের রোদন দেখিতে পারে? সন্তানেয় মর্ম্ম বেদনা সহ্য করিতে পারে? কখনই না, তখন সন্তানের দুঃখই মায়ের নিজ দুঃখ মধ্যে পরিগণিত হয়, তাহা নিবারণ না করিলে মায়ের শান্তি লাভ নাই' সুতরাং মায়ের কৃপা বিলোকন হইল। চক্ষুর প্রসন্নতা হইল, চক্ষুর প্রসাদ গুণে তখন নিতান্ত তরল মেঘমালার অন্তরালে চন্দ্রোদয় হইল! প্রভামালা বিকীর্ণ হইল। মেঘের কর্কশ প্রভা, মলিন বর্ণ,উজ্জ্বল ও চিক্কণ হইয়া উঠিল, ইতস্ততঃ তমোরাশি বিদূরিত করিয়া দেদীপ্যমান হইল। পুত্তলের জড়তা কর্কশতা মলিন বর্ণে ও আকার প্রকারের অন্তরালে মায়ের আনন্দ-ময়, চৈতন্যময়, জাগ্রত আকার উদিত হইল। পুত্তলের চরণের অন্তরালে মায়ের চরণ প্রকাশিত হইল, তাহার মুখের অন্তরালে মায়ের শ্রীমুখমণ্ডল বিকাশিত হইল, পুত্তলের নয়নের কোণে মায়ের ত্রিনয়ন প্রকাশিত হইল, পুত্তলের বাহু চতুষ্টয়ের কোণে কোণে মায়ের বাহু চতুষ্টয় উদিত হইল, এবং পুত্তলের দেহ ভাগের আড়ালে আড়ালে মায়ের দেহ ভাগ প্রকাশিত হইল মায়ের পীযুষ নিস্যন্দিনী-হৃদয়-তাপ-হারক সুশীতল রশ্মিমালার দ্বারা

জড় পুত্তলের অন্ধকার বিদূরিত হইল, মায়ের আনন্দময়ী প্রভার দ্বারা প্রতিমার কর্কশভাব অপনোদিত হইল। মায়ের চৈতন্যের দ্বারা প্রতিমা চেতনা হইয়া উঠিল। মায়ের জাগ্রতভাব প্রকাশিত হইয়া পুত্তলের জলন্ত জাগ্রতভাব হইল। মায়ের চিক্কণ লাবণ্য প্রকাসিত হইয়া পুত্তলের রুক্ষতাকে প্রভাময় করিল। মায়ের অলৌকিক সমুজ্জ্বল নীলকান্তি বিকাশিতা হইয়া পুত্তলের অপবিত্র নীলীরসের নীলবর্ণকে স্বর্গীয়নীলীমা করিয়া তুলিল। মায়ের মৃণালিকাবৎ তনুযষ্টির কোমলতা বিকাশ হইয়া কঠিন পুত্তল মার্দ্দব গ্রহণ করিল, নবনীত কোমল হইয়া পড়িল। মায়ের দয়া, স্নেহ ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, মাধুর্য্যাদি নিখিল গুণরাশি প্রকাশিত হইয়া অচেতন কর্কশ পুত্তলকে দয়াময়ী স্নেহময়ী মূর্ত্তি করিয়া তুলিল। এখন পুত্তল, মা হইয়া গেল। পুত্তলের সমস্ত গুণ, সমস্ত শক্তি সমস্ত আকার প্রকার রূপাদি মায়ের প্রভার অনুপ্রবেশে রূপান্তরিত হইল। এবার নয়ন কৃতার্থ হইল। এবার পুত্তলের সমস্ত রূপাদি মায়ের রূপে মাখাইয়া অস্তিত্ব শূন্য-বৎ হইল। উহা সাধকের নয়ন ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াও আত্মপ্রকাশ করিতে পারিল না, যথা যথারূপে উদ্ভাসিত হইতে পারিল না। অবশেষে মুখ্যরূপে মায়ের রূপই প্রকাশ পাইতে লাগিল, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সুধাংশু মরীচিমালা গৌণভাবে সম্বলিত তরলতর অভ্রাবলীর ন্যায় পৌত্তলিক আকারও অত্যল্পতরমাত্র উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। কিন্তু পুত্তলের মৃণ্ময়ত্ব জড়ত্বাদি একবারে সমূলে অন্তর্হিত হইল। প্রতিমার মধ্যে মায়ের সদৃশ যে সকল গুণরাশি আছে তাহাই সেইরূপ অন্তর্হিতঅন্তর্হিতভাবে, মায়ের প্রকৃত রূপের কোলে কোলে আড়ালে আড়ালে অতি সামান্য প্রকাশ পাইতে লাগিল। কিন্তু তাহা এত অল্প যে, তাহা যেন হইতেছে না বলিয়াই অনুভূত হয়। তাহা চক্ষুর গ্রাহ্যতায়ই উপস্থিত হয় না।

এইবার মনের আশা মিটিল, চিরাভিলাষ পরিপূর্ণ হইল, অভাব বিদূরিত হইল। এবার সাধক মনের সাধে বাহিরে মাকে অর্চ্চনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাই উচ্চতর মূর্ত্ত্যুপাসকের উপাসনার নিয়ম।

যাঁহারা মধ্যম শ্রেণীর মূর্ত্ত্যুপাসক, তাঁহাদের ঠিক এই অবস্থা হয় না। তাঁহাদের ঘটনা একটু অন্যরূপ। তাঁহাদের নয়নে, মায়ের প্রকৃত

রূপাদি এত পরিস্ফুট ভাবে প্রকাশিত হয় না,তাহা আপেক্ষিক অপরিস্ফুট থাকে। মধ্যম উপাসকদিগের অন্যান্য পূর্ব্বা বস্থা গুলি সমস্তই সমান হইয়া শেষকালে, উচ্চসাধকের বিসদৃশ ঘটনা হইয়া থাকে। মধ্যম সাধকের নয়নে, পুত্তলের মৃণ্ময়তা জড়তাদি বাদে মায়ের সদৃশ যে সকল আকার প্রকারাদি থাকে তাহাই অধিকতর প্রকাশিত হয়, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের প্রকৃত রূপ কিঞ্চিত মাত্র আভাসিত হয়। আর যাহারা অধম সাধক তাহাদের নয়নে মায়ের সদৃশ আকার প্রকারাদি মাত্রই উদ্ভাসিত হয়, তাহাতে মায়ের নিজরূপ কিছুই আভাসিত হয় না। কিন্তু পুত্তলের জড়ত্ব মৃণ্ময়ত্বাদি নয়নের নিকটও স্থান পাইতে পারে না। এই তিন শ্রেণীর ব্যতীত আর কোন্ রূপ মূর্ত্ত্যুপাসক ভারতবর্ষে নাই। অতএব পুত্তলের জড় আকার প্রকার কাহারই নয়ন গোচর দ্রব্য নহে, নয়নের একমাত্র বিষয় সকলেরই জগদম্বা। কেমন, এখন বুঝিতে পারিলে যে, পুত্তলের দিকে দৃষ্টি করিলেও পুত্তলের দর্শণ না হইয়া মায়ের দর্শন হইতে পারে?

শিষ্য।—আজ্ঞা হ্যাঁ, আপনার কৃপায় আমি চরিতার্থ হইলাম।

আচার্য্য।—তোমার আনন্দ বর্দ্ধনের নিমিত্ত আরও কএকটি দৃষ্টান্তের দ্বারা এবিষয় সুদৃঢ় রূপে তোমার হৃদয় মধ্যে অঙ্কিত করিব।

ঐ দেখ, তোমার কিঞ্চিৎদূরে ঐ পথের পার্শবর্ত্তী বাড়ীখানির দিকে একবার দৃষ্টি করিয়া দেখ। ঐ দেখ, ঐ একতলা কোটাটির ছাতের উপরে দাঁড়াইয়া পূর্ণ যৌবনা অনবগুণ্ঠিতা একটি রমণী গঙ্গার তরঙ্গ লহরী দর্শন করিতেছে। কেমন লক্ষ্য হইতেছে কি?

শিষ্য।—আজ্ঞা হ্যাঁ দেখিলাম। অতি মনোহরা আকৃতি বটে, যেন মায়ের আনন্দময়ী প্রতিমাখানি স্বর্গ ধাম হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। প্রভো! অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম! যেন মূর্ত্তিমতী মাই দাড়াইয়ে রহিয়াছেন! ঐ বাড়ীখানি কাহার? ইনি কাহার কন্যা?

আচার্য্য।—সে পরিচয় আবশ্যক হইলে পরে জানিতে পাইবে, এখন আর কিছু দেখিতে পাইয়াছ কি না বল দেখি?

শিষ্য।—আজ্ঞে না, আরত কিছুই দেখিতে পাই না?

আচার্য্য।—ঐ দেখ, ঐ দৃষ্টে, ঠিক উহার বিপরীত দিকে, সদানন্দ তত্ত্বনিধি মহাশয়! যাঁহাকে "ভবৌষধের" ভোলাদাস বলিয়া অবগত আছ। দেখ, ইনি অপরাহ্ণে ঐ ভাগীরথী কূলে বসিয়া মায়ের মহিমা গুণাদি গান করিতে করিতে হঠাৎ পশ্চান্মুখ হইয়া ঐ কন্যাটীকে দেখিতে পাইয়াছেন, এবং একাগ্র মনে একাগ্র প্রাণে ঐ দিক দৃষ্টি করিয়া কি মধুর গান করিতেছেন! ঐ শুন কি হৃদয় গ্রাহিণী পদাবলি!

একবার হের! হেরম্ব জননি!।
কৃপা কটাক্ষ নয়নে এদীন সন্তানে॥

কেমন ঠিক এই না বটে?

শিষ্য।— ও! হ্যাঁ। আমি পূর্ব্বেও উহা দেখিয়াছি বটে তবে ওদিগে বিশেষ মনোনিবেশ করি নাই। তাইত, বড়মধুর দৃশ্যইত বটে! ইনিই কি সেই ভোলাদাস মহাশয়! আজ ধন্য হইলাম, ইহাঁর দর্শনে চরিতার্থ হইলাম।

আচার্য্য। বলদেখি, ঐ কন্যাটির প্রতি দৃষ্টি করিয়া ইনি কি দেখিতেছেন, কি দেখিয়া ঐরূপ বিমুগ্ধহৃদয়ে ঐ মধুর পদাবলী গান করিতেছেন? ইনি কি ঐ নরক কীট মনুষ্যাত্মার নরকময় দেহটা দেখিয়া ঐরূপ আনন্দে বিহ্বল হইয়াছেন? অথবা উহার ব্যক্তিগত কোন নরকীয়ভাব প্রকাশক কিছু দর্শণ করিতেছেন? কখনই না, উহার ব্যক্তিগত কোন কিছুই সদানন্দের নয়নগোচর হইতেছে না। সদানন্দ ঐ আকৃতির প্রতি নয়ন নিয়োগ করিতেছেন সত্য, নয়নদ্বয় ঐ জড় আকৃতিতেই নিবদ্ধ আছে সত্য, কিন্তু তাহার অভিনিবেশ ওখানে নহে। উহাঁর নয়ন ঐ আকৃতির অন্তর্গত নির্ম্মাণোপাদান অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভৌতিক পদার্থের বিকার অস্থি মাংসাদি দর্শন করিতেছে না। তাহার জড়ত্বাদিও গ্রহণ করিতেছে না। কিম্বা ঐ জড়াকৃতির আকার প্রকার দৈর্ঘ্য প্রশস্ততা, বা রূপলাবণ্যাদিও দেখিতেছে না। কারণ ঐ সকল দর্শন সদানন্দ মহাত্মার ন্যায় সাধক লোকের আনন্দজনক হইতে পারেনা। ইহা তুমিও অবশ্য বিশ্বাস করিতেছ।

তবে ইনি কি দেখিতেছেন? কাহার প্রত্যক্ষ করিয়া, মন প্রাণ খুলিয়া দিয়া ঐরূপ সুধাধারা সেচন করিতেছেন? ইনি সর্ব্বদা যাঁহার অন্বেষণ

করিয়া থাকেন, যাঁহার নিমিত্ত মন, প্রাণ, আত্মা, জীবন সমস্ত বিসর্জন করিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিয়া, সেই আনন্দময়ী মাকে প্রত্যক্ষ গোচর করিয়া। সদানন্দ, হুতাশনাঙ্গে আলোকের ন্যায়, দর্পনাঙ্গে সুধাংশুকিরণের ন্যায়, ঐ জড়াকৃতির মধ্যে, জড়াকৃতির সঙ্গেসঙ্গে, জড়াকৃতির উপরে উপরে, জড়াকৃতি অন্তরালে করিয়া আনন্দময়ীর আনন্দমূর্ত্তি দর্শন করিতেন। উহার বর্ণের সঙ্গে মায়ের বর্ণ, উহার চরণের সঙ্গে মায়ের চরণ, বাহুর সঙ্গে মায়ের বাহু, এবং মুখের সঙ্গে সেই শ্রীমুখমণ্ডল, নয়নের সঙ্গে সেই কারুণ্যামৃতশ্রাবী নয়ন, হৃদয়ের সঙ্গেসঙ্গে সেই সর্ব্বংসহ হৃদয়, উদরের সঙ্গেসঙ্গে সেই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের পরিপোষক সর্ব্বোদরীর উদর প্রত্যক্ষ করিতেছেন। এইরূপ উহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মায়ের একএক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দর্শন করিতেছেন। সদানন্দ উহার দয়ার উপরে উপরে মায়ের দয়া দেখিতেছেন, উহার স্নেহ মমতার সঙ্গেসঙ্গে সেই অপার স্নেহমমতা অনুভব করিতেছেন, এবং উহার ক্ষমাতে সেই ক্ষমা, উহারস্ত্রীত্বে সেই স্ত্রীত্ব, মাতৃত্বে সেই মাতৃত্ব, লাবণ্যে সেই লাবণ্য দর্শন করিতেছেন। এইরূপ ইহার একএক ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জগদম্বার এক একটি ভাব এবং একএক গুণের উপরে উপরে মায়ের একএকটি গুণ প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তাই সদানন্দ এত আনন্দে মগ্ন হইয়াছেন, এত স্বচ্ছন্দে গান করিতেছেন। মায়ের আনন্দ না হইলে, মাতৃসুধা না পাইলে কি সদানন্দের মন গলিতে পারে? তাহা কখনই নহে। সন্দেহ হয়, তুমি গিয়া জিজ্ঞাসা কর, সদানন্দ আমার কথারই অনুবাদ মাত্র করিবেন।

এই মনুষ্য দেহেতে যেমন জগদম্বার দর্শন হইতে দেখিলে, মৃণ্ময়াদি মূর্ত্তিতেও ঠিক এইরূপেই জগন্মায়ের প্রত্যক্ষ হয়। বাস্তবিক জ্ঞানে মায়ের সম্বন্ধে, মৃণ্ময়াদি প্রতিমা, আর এই মানুষী প্রতিমার কিছু মাত্র পার্থক্য ভাব নাই। যেজ্ঞানে পুত্তলের দেহকে মায়ের দেহ নয় বলিয়া বিশ্বাস করিবে, ঠিক সেই জ্ঞানেই ঐ যুবতীর অন্ন রসময় দেহকেও মায়ের দেহ নয় বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। এবং যেজ্ঞানে পুত্তলের রূপ লাবণ্যেও আকার প্রকারাদিকে মায়ের রূপাদি হইতে ভিন্ন বিশ্বাস করিবে, সেইজ্ঞানে ঐ নারীর পার্থিব দেহের রূপাদিকেও বিভিন্ন বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে

পারিবে না। ইহার অন্তঃকরণাদিস্থিত যেসকল ভাব ও গুণাবলী আছে তাহাও ঐ নিয়মেই মা হইতে ভিন্ন বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। সুতরাং এই মনুষ্য দেহে মায়ের দর্শন করিতে পারিলে পুত্তলেও তাহা হইতে পারে।

শিষ্য। প্রভো! আমার একটি সন্দেহ উপস্থিত হইল, কৃপাপ্রকাশে শ্রবণ করিতে হইবে। অনেকে, অন্ধকারময় রাত্রিযোগে মানবকে ভূত প্রেত বলিয়া দর্শন করিয়া থাকে, রজ্জুকেও অনেক স্থলে সর্পজ্ঞান করে, ঝিনুকেরজত দর্শন হয়। তখনও মানবের হস্তপদ আকার প্রকারাদি ভূত প্রেতের হস্তপদাদি হইয়া দাঁড়ায়, শুক্তি রজত হইয়া যায়, রজ্জু সর্প হইয়া যায়, অর্থাৎ আপনি এখানে একটু কথান্তর করিয়া যাহা বলিলেন সেই খানেও, আমার বিশ্বাস, ঠিক এইরূপ ঘটনাই হয়। কিন্তু লোকে তাহাকে আরোপিত জ্ঞান, বা মিথ্যাজ্ঞান, অথবা ভ্রান্তিজ্ঞান বলে। সেই জ্ঞান যথার্থ নহে। তাহার যথার্থ জ্ঞানের বিষয় মানুষ রজ্জু এবং শুক্তি। যে বস্তু বাস্তবিক যাহা, তাহাকে ঠিক তাই বলিয়া জানার নামই সত্যজ্ঞান, আর অন্যরূপ জানার নাম মিথ্যা জ্ঞান।

তাহা হইলে সদানন্দ মহাশয়ের এই জ্ঞানকে ভ্রান্তিজ্ঞান না বলা হইবে কেন, এবং পুত্তলের মধ্যে মায়ের দর্শনই বা মিথ্যা দর্শন না হইবে কেন এই কথাটি মীমাংসিত করুন।

আচার্য্য। তোমার এই প্রশ্ন নিতান্তই অনবধানতামূলক। ইহার কোন মূল্যই নাই। ইহার মীমাংসা রূপান্তরে পূর্ব্বেই দর্শিত হইয়াছে, একটু অবহিত হইলে, এখন তোমার এই জিজ্ঞাসা উদিত হইতেই পারে না।

ভ্রান্তিজ্ঞানও সত্যজ্ঞানের তুমি যে লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়াছ তাহাই যথার্থ। কিন্তু মা যখন সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজ করিতেছেন, সুতরাং ঐ যুবতী দেহ এবং পুত্তলেও জাজ্বল্যমানা আছেন, তখন সেইখানে মায়ের দর্শন হওয়া ভ্রান্তি হইবে কোন্ নিয়ম মতে? বরং মা যেখানে আছেন সেইখানে তাঁহাকে না দেখিয়া অন্যরূপ দর্শন করাই ভ্রান্তি। মা এই মানুষী দেহে আছেন, পুত্তলের মধ্যেও আছেন, ঐ খানে যাহারা

মাকে দেখিতে পায় না, যাহারা কেবল পুত্তল আরমানুষী যুবতী মাত্র দেখিতে পায় তাহারাই ঘোরতর ভ্রান্ত নিদারুণ অন্ধ।

অতএব পুত্তলের প্রতি দৃষ্টি করিলেও পুত্তল বাদ দিয়া যে মায়ের দর্শন হইতে পারে না ইহা অমূলক কথা ইহা নিশ্চিত হইল।

আবার আর এক প্রকারে তোমার বুঝানের চেষ্টা করিতেছি। এই চারিদিকে যত দ্রব্য,যত পদার্থ দেখিতেছ ইহার প্রত্যেকটির মধ্যেই অনেক গুলি করিয়া দৃশ্যান্তর আছে। এমনকি সাতটি দৃশ্যান্তর ব্যতীত এজগতে কোন পদার্থই নাই। তৎর ১৪।১৫টি, ২০।২৫টি, ৪০।৫০টি দৃশ্যও অনেক পদার্থেরমধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। আমার অন্য কোন দৃষ্টান্ত এখানে উপস্থিত করার আবশ্যক নাই। ঐযে যুবতী কন্যাটি দেখিতেছ উহার দেহের মধ্যেও বহুতর দৃশ্যান্তর আছে।

ঐ সমস্ত দৃশ্যবলীর সকলগুলি, কিম্বা দুইটি মাত্র দৃশ্যও ঠিক এক সময়ে এক প্রযত্নে এক অভিনিবেশে কাহারো দৃষ্টি গোচর হইতে পারে না। কিন্তু পর পর ভিন্ন ভিন্ন প্রযত্নে ভিন্ন ভিন্ন অভিনিবেশে ভিন্নভিন্ন এক-একটি দৃশ্যের প্রকাশ হইয়া থাকে। এঁকবারের অভিনিবেশও প্রযত্নে এক সময়ে কেবল একটি মাত্র দৃশ্যই একজনের নয়ন গোচর হয়। অথচ দৃষ্টি কিন্তু ঐ সমষ্টি দৃশ্যবলী সম্পন্ন দ্রব্যটির উপরে প্রতিবদ্ধ থাকে। বিষয়টি বুঝিবার নিমিত্ত কএকটী দৃষ্টান্ত লও,—

আর অন্যত্র গিয়া প্রয়োজন নাই ঐ স্ত্রীলোকটির নিকটেই তুমি দশবারজন লোক আনীয়া উপস্থিত কর। তন্মধ্যে ইহাঁর পিতা, স্বামী, পুত্র আর একজন লম্পট, একজন তত্বজ্ঞানী থাকুন, আর কএকজন সাধারণ লোক থাকুক। সকলকেই ঐ যুবতীটির প্রতি দৃষ্টি করিতে বল। তৎপর প্রত্যেকের নয়ন গোলকের মধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখ, ঐ স্ত্রীটির পাদতলী হইতে সকেশ মস্তকপর্য্যন্ত সম্পূর্ণ মূর্ত্তিটি বিম্বিতা হইয়াছে কিনা। যখন দেখিবে যে ঠিক তাহাই হইয়াছে, তখন নিশ্চয় জানিতে পারিবে যে সকলেই উহাঁর প্রতি দৃষ্টি করিয়াছেন, সকলেরই নয়নেন্দ্রিয়ের সহিত ঐ মূর্ত্তির সম্বন্ধ হইয়াছে। তৎপর একেএকে উহাঁদের সকলকেই জিজ্ঞাসা করিয়া জান উহাঁরা কে কিরূপ আকার সন্দর্শন করিলেন। প্রথমে ঐ

সাধারণ লোক গুলিকে কন্যাটির প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিবরণ জিজ্ঞাসা কর। দেখিবে উহারা সকলে সকল অঙ্গের প্রকৃত অবস্থা বলিতে পারিবে না। কেহ হয়ত মুখখানির কথা বলিতে পারিবে, কিন্তু পাদ দুখানির অবস্থা নহে, কেহ পায়ের কথা বলিতে পারিবে, কিন্তু বাহুর কথা নহে, কেহবা বাহুর অবস্থা বলিবে কিন্তু মধ্যদেশের নহে। এইরূপ সকলেই কখনই সকল অঙ্গের অবস্থা বর্ণন করিতে পারিবে না। অথচ সকলের নয়নেই কিন্তু গোটা মূর্ত্তিটির বিম্বই নিপতিত হইয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসায় তাহারা উত্তর করিবে যে,আমি অমুক অঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করিনাই সুতরাং তাহার অবস্থা বলিতে পারিলাম না।

তৎপর, ইহাঁর পিতার নিকট জিজ্ঞাসা কর তিনি বলিবেন, তিনি উহাতে কন্যার ভাব ব্যতীত অন্যভাব দেখিতে পান নাই। আবার শিশু পুত্রটি মাতৃভাব ব্যতীত আর কোন ভাব দেখিতে পাইবে না, স্বামীটি নিজের প্রেমময়ী গৃহলক্ষ্মীর ভাবমাত্র দেখিবেন, এবং নরাধম লম্পট ব্যক্তিটা উহাতে কেবল অপূর্ব্ব ভোগ্যত্বের ভাব মাত্রই সন্দর্শন করিবে। তৎপর যিনি তত্ত্বজ্ঞানী তিনি কেবল এক অদ্বিতীয় সত্তামাত্র পদার্থটি দেখিবেন। তিনি কোন রূপও দেখিবেন না, কোন আকার প্রকারও নহে, কোন ভাবও নহে, কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গও নহে, অদ্বিতীয় বস্তু ব্যতীত আর কিছুই তাঁহার নয়ন গ্রহণ করিবে না। অথচ সকলের নয়নেই ঐ একই মূর্ত্তি উপনীত হইয়াছে।

অতএব ইহা জানাগেল যে চক্ষুর সম্মুখে থাকিয়া, চক্ষুতে প্রতিবিম্বিত হইলেই যে তাহা চক্ষুর প্রত্যক্ষগোচর হইবে এমন নহে। কিন্তু মনের সঙ্গে মিলিত হইয়া নয়ন আগ্রহ সহকারে উহার যে অংশটির প্রতি লক্ষ্য করিবে, যেটিদেখিবার নিমিত্ত প্রযত্ন করিবে, যেটিতে অভিনিবিষ্ট হইবে কেবল সেই অংশটি মাত্রই দেখিতে পাইবে। তদ্ব্যতীত অন্য একটিও তাহার নয়নগোচর হইবে না। তাহা নয়নগোলকে প্রতিবিম্বিত হইলেও, কার্য্যতায়, না হওয়ার ন্যায় ঘটিবে।

অতএব পুত্তলের প্রতি দৃষ্টি করিলে এবং পুত্তলই নয়নগোলকে বিম্বিত হইলেও পুত্তল প্রত্যক্ষ গোচর না হইতে পারে। পুত্তলের প্রতি যাঁহার

লক্ষ্য পড়িবে না, পুত্তল দেখিবার নিমিত্ত যাঁহার প্রযত্ন নাই, পুত্তলে যাঁহার অভিনিবেশ নাই পুত্তলের সহিত নয়ন সংযোগ হইলেও পুত্তলের দিকে তাকাইলেও তিনি পুত্তল দেখিতে পাইবেন না। তাঁহার, যাঁহার নিমিত্ত অভিনিবেশ যাঁহাকে সন্দর্শন করার জন্য তিনি ব্যাকুল, যাঁহার অলৌকিক রূপমাধুরীর প্রতি তাঁহার লক্ষ্য সেই সর্ব্বব্যাপিকা সর্ব্বাধিষ্ঠাত্রী মাকেই তিনি প্রত্যক্ষ করিবেন, মায়ের সৌন্দর্য্য রাশি দর্শন করিয়াই তাঁহার নয়ন চরিতার্থ হইবে। আর যাহারা দুর্ভাগ্য প্রাণী, যাহাদের দুরদৃষ্ট রাশি পর্ব্বতায়মান, তাহারা মায়ের প্রতি অভিনিবেশ বা লক্ষ্য করিতে পারে না, মায়ের রূপও দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। তাহাদের লক্ষ্য, অভিনিবেশ এবং প্রযত্নাদি সমস্তই পুত্তলের প্রতি এবং পুত্তল মাত্র দর্শন করিয়াই প্রতিনিবৃত্ত হয়। ইহাই তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত মীমাংসা। কেমন এখন তৃপ্তি হইল কি ?

শিষ্য। আজ্ঞা হ্যাঁ, আমি চরিতার্থ হইলাম।

"ব্রাহ্মণের অবনতি।"

ভারতবর্ষে বর্ণ চতুষ্টয় বিরাজিত। বর্ণচতুষ্টয় দ্বারাই ভারতের গৌরব ছিল। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রথম স্থানীয়। ব্রাহ্মণের প্রভিভাবলে ভারতের উন্নতি এবং জগতের শিক্ষা। অতি পুরাকালে সপ্তদ্বীপা বসুধার মধ্যে জম্বুদ্বীপ প্রধান ছিল। জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষ অন্য অষ্ট বর্ষের (হরিবর্ষ, কুরুবর্ষ প্রভৃতির) প্রধান ছিল। ভারতবর্ষেই প্রথম মনুষ্যের অধিষ্ঠান হয়। ভারতের শিক্ষা ও সভ্যতায় ইতর দেশীয় বর্ব্বরগণ যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করে এবং ভারতের আধিপত্যে সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। এমন কি ভারতের শিক্ষার পূর্ব্বে পৃথিবীর অন্য কোন দেশে সামান্য গণনা পর্য্যন্ত জানিত না। ভারত ত্রিজগৎ খ্যাত। ভারতের রত্ন সম্পদ্ ও গুণগ্রাম পৃথিবীতে প্রচারিত ছিল বলিয়া কৌতূহল, শিক্ষা ও জিগীষা প্রভৃতি প্রবৃত্তির প্রেরণায় বৈদেশীয়গণ নিয়ত ভারতের জন্য

ব্যগ্র থাকিত। সেই হেতু বিজাতীয় বিদেশীয়গণ বহুকাল হইতে এদেশে প্রবেশ জন্য প্রয়াসী। সগররাজ কর্তৃক নির্ব্বাসিত শক পুলিন্দাদি অনার্য্যগণের অন্তরে বিদ্বেষ বহ্নি সতত আজ্বল্যমান ছিল। তাহাও বিদেশীয় আক্রমণের একতর কারণ। ক্ষত্রিয় তখন বাহু স্বরূপ ভারতের রক্ষক ও পালক ছিল। বর্ণ চতুষ্টয়ের সামঞ্জস্যে ভারত অদ্বিতীয় গুণগ্রামে মণ্ডিত ছিল; ব্রাহ্মণগণ নিঃস্বার্থভাবে জগতের হিত কামনা করিতেন। লোভ, মোহ, মাৎসর্য্য তাঁহাদের কিছুই ছিল না। সংসারের অতুল-সুখের হেতু ভূত রাজত্ব পর্য্যন্ত তাঁহারা তৃণবৎ তুচ্ছ করিয়া জগতের হিত চেষ্টা করিতেন। বস্তুতঃ সর্ব্বথা বিষয় নিস্পৃহতা ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহারও ছিল না। ধর্ম্মজগতে ব্রাহ্মণ অদ্যাপি অদ্বিতীয়। আসুর-জগতে ব্রাহ্মণ চিরকাল বিষণ্ণ। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নাই, এমন কোন দেশ নাই যাহারা ব্রাহ্মণের মত নিঃস্বার্থতা বিদ্যাবত্তা, ধর্ম্ম-যাজনা ও ব্রহ্মোপসনার পরাকাষ্ঠাপ্রদর্শন করিতে পারে। ব্রাহ্মণগণ বিষয়ের দাস ছিলেন না। বিষয় কিঙ্কর স্বোদর পূরক অকৃতজ্ঞ অশুচিময় মানব ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য হৃদগত করিতে পারে না। কারণ সে অন্ধ, অন্তর কাপট্যময়, বিদ্বেষ তাহার সহচর। ব্রাহ্মণ অস্ত্রবলে বলবান্ ছিলেন না; বিলাস-বিলোল ছিলেন না। কেবল গুণে, স্বভাবে, সারল্যে ও তপোনিষ্ঠায় সকলের শিরোভূষণ ছিলেন। "গুণাঃ পূজাস্থানম" কেবল এই মহাবাক্য বশে ব্রাহ্মণ নিতান্ত মাননীয় ছিল। এবংবিধ ভূদেব ব্রাহ্মণের গ্লানি হইলে ভগবানের গ্লানি হয়; এই জন্য ভগবান অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইতিহাসে তাহার বর্ণনা আছে। আর্য্যগণ তাহা অবগত আছেন। বিজাতীয়গণ সময়ে সময়ে ভারতলোভে আক্রমণ করিয়াও সম্পূর্ণপর্য্যুদস্ত হইয়া যায়। ক্রমে কাল মাহাত্ম্যে ব্রাহ্মণের তপনিষ্ঠা ও অনুষ্ঠান ক্ষীণ হইতে লাগিল, ক্ষত্রিয়গণ বিলাস ও আত্মদ্রোহ পাপে প্রবৃত্ত হইতে লাগিল; ভারতের দুরদৃষ্ট বশতঃ ভারত বিজাতীয় হস্তে নিগৃহীত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ লোভে আত্মবিস্মৃত হইলেন। ব্রাহ্মণ পরিপালক ক্ষত্রিয় সূর্য্য চিররাহুকবলে কবলিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ অনাথ হইয়া উঠিলেন। ক্রমে বিষয়-বিষ ব্রাহ্মণের পবিত্র অন্তঃকরণে প্রসূত হইল।

ব্রাহ্মণ অধঃপাতে পতিত হইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের অবনতিতে ভারতেরও অবনতি অবশ্যম্ভাবী। যতদিন বিজাতীয় অধিকার ভারতে থাকিবে ততদিন ভারত ক্রমশঃ পূর্ব্ব গৌরব বিহীন হইয়া অভিনব মূর্ত্তি ধারণ করিবে। ইহা স্বীকার্য্য। যিনি যখন ভারতের অধীশ্বর হইবেন তিনিই তখন স্বীয় মতানুসারে ভারত পরিবর্ত্তিত করিবেন। তাঁহার স্বার্থানুরূপ ভারত শাসিত হইবে। জাতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তই তদনুযায়ী হইবে। বল, কৌশল, ছল যাহা প্রয়োজন, তাহাই তখন নিয়োজিত হইবে; তবে যতদুর আত্মরক্ষা করা যায় তাহাই মতিমত্তার কার্য্য। ইচ্ছা পূর্ব্বক, স্বার্থবৃদ্ধির আশায়, অথবা স্বমত রক্ষার্থ অন্ধ হইয়া যে আত্ম বিক্রয় করে, সে অবশ্যই ঘৃণিত ও হেয়। ব্রাহ্মণের মধ্যে এখন এতাদৃশ লোকও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। চাকুরী করা শাস্ত্রে শ্ববৃত্তি বলিয়া ঘৃণিত, চাকুরীর লোভে ব্রাহ্মণে অনায়াসে ব্রহ্মণ্য পরিহার করিয়া ঘৃণিত কার্য্যে নিরত। ব্রাহ্মণের অশেষ দুর্গতি ঘটিয়াছে। ব্রাহ্মণের দুর্গতিতেই ভারতের অবনতি। ব্রাহ্মণ আত্মহারা হইয়া নীচতা গ্রহণ করিতেছেন। আপৎসময়ে প্রত্যেক আর্য্যের বিশেষরূপে সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের। শত্রুগণ অশেষ উপায়ে ব্রাহ্মণের উপর অন্যবর্ণের অবজ্ঞা বুঝাইয়া দিয়াছে। অন্ধ অকৃতজ্ঞ বালক উহাতে আস্থা স্থাপন করিতে পারে; কিন্তু চক্ষুষ্মান ব্যক্তি অদ্যাপি অবজ্ঞা বিরত। ব্রাহ্মণগণ মধ্যে অদ্যাপি এই বিপদ্ সময়ে অবজ্ঞাত, বিড়ম্বিত হইয়াও যাহারা স্বধর্ম্ম পরিপালন করিতেছেন, অবশ্য তাঁহারা পরম পূজনীয়। অদ্যাপি অনেক ব্রাহ্মণ যথা সাধ্য ধর্ম্ম সাধন সম্পাদন করিতেছেন। ক্লেশ স্বীকার করিয়া অশন বসন সহ শিষ্যদিগকে বিদ্যাদান করিতেছেন। পৃথিবীতে আর কোন দেশে এরূপ ঔদার্য্য নাই। ভারতের প্রকৃত হিত বুদ্ধি উহাদের যত আছে, পাশ্চাত্য শিক্ষিতদের তাহার শতাংশও নাই। শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণগণ বিলাতীয় দ্রব্যজাত অতি অল্পই ব্যবহার করেন। লবণ, চিনি, ঔষধ, বসন, ভূষণ, বিলাস দ্রব্য বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ প্রায়ই ব্যবহার করেন না। বসনের অভাবে বিলাতী বসন কিছু কিছু ব্যবহার করেন। কিন্তু এই সমস্ত মহভাব পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিদুরীত হইয়া যায়; ইহাও ব্রাহ্মণগণই

বুঝেন। সম্প্রতি সম্মতি আইন সম্বন্ধে যে এত আন্দোলন হইয়াছে, কোন শাস্ত্রব্যবসায়ী-ব্রাহ্মণ তাহার অনুকূলপক্ষ অবলম্বন করে নাই। যে দুই এক ভট্টাচার্য্য উপাধিধারী দেখা যায়, উঁহারা শাস্ত্রব্যবসায়ী নহে এবং শাস্ত্রব্যবসায়ের ক্ষমতাও আদৌ নাই। শিখিয়াছে ফিরঙ্গি ভাষা, উপাধিও তদাগত। সুতরাং তাহাদের কথা সভ্য সমাজে অনাদৃত। ছলে, বলে, সেই ব্রাহ্মণের উপর অত্যাচার উপস্থিত হইতেছে,এই জন্য ব্রাহ্মণের আরও অবনতি হইবে,দেশও নষ্ট পাইবে। ব্রাহ্মণের বিশেষ সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। এবং অন্যান্য বর্ণের উচিত সেই সতর্কের সাহায্য করা।

"ক্ষমাদয়া দমোদানং ধর্ম্মঃসত্য শ্রুতংঘৃণা
বিদ্যা বিজ্ঞানমাস্তিক্যমেতদ্ ব্রাহ্মণ লক্ষণম্"

ব্রাহ্মণের স্বভাবতঃ ঘৃণা অন্তর্হিত হইতেছে ইহাই অনর্থের একতর কারণ। যতদিন ঘৃণা ও আত্মবোধ ব্রাহ্মণের অন্তরে বলবৎ রূপে বিরাজিত থাকিবে, ততদিন ভারতের পূর্ব্বভাবের ছায়া বর্ত্তমান থাকিবে,অন্যথা ভারত অনার্য্য ম্লেচ্ছময় হইয়া ম্লেচ্ছদেশ হইয়া উঠিবে। প্রত্যেক আর্য্যের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের সোহং চিন্তা এখন আর নাই। ব্রাহ্মণগণ জাগরিত হইয়া সোহম্ চিন্তায় পূর্ব্ববৎ নিযুক্ত হউন, গোত্র প্রবর স্মরণ পূর্ব্বক শুচিময় অন্তরে পিতৃ তর্পণে নিত্যকর্ম্ম সমাধা করিতে আরম্ভ করুন। ব্রাহ্মণ এমনই দুর্গতি লাভ করিতেছে যে, ভাবিলে বিস্ময় রসে শরীর পরিপ্লুত হয়? অন্তর বিদীর্ণ হয়, ইন্দ্রিয়গ্রাম অবসন্ন হইয়া নিস্ক্রিয় হইয়া পড়ে। শোণিতগতিস্তিমিত হয়। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ স্বস্ব কর্ত্তব্য পরিপালনে সাবধান্ হইলে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সহজে একতা জন্মিয়া উঠে, আর বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয় না। এবং প্রত্যেক আর্য্য যথারীতি স্বীয় কর্ত্তব্য পরিপালনে যত্নবান্ হইলে আর্য্যগণের একতা সম্পন্ন হইতে পারে। অনেক ব্রাহ্মণ ইচ্ছা পূর্ব্বক স্বীয় মর্য্যাদা পরিত্যাগ করিয়া পরিণামে গ্লানিভাজন হইয়া থাকেন।

বর্ত্তমান সময়ে চতুষ্পাঠীর জন্য গবর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রদান করিতে অভিলাষী। আপাততঃ আমরা দেখিতেছি ইহাদ্বারা টোল সমূহের উপকার হইবে। সংস্কৃত শিক্ষার বহুল প্রচার হইবে; সুতরাং উপকার

হইবে। টোলগুলির প্রতি এখন লোকের উৎসাহ নাই। কিন্তু এই অত্যল্প সাহায্য লোভে শেষে অচ্ছেদ্য জাগুড়া জালে জড়িত না হইতে হয় ইহাই ভাবনা। প্রথমতঃ অর্থ গ্রহণ, দ্বিতীয়তঃ তজ্জন্য বাধ্যবাধকতা, তৃতীয়তঃ তদনুযোগে অব্যবস্থা প্রদান করিতে হইবে। ব্রাহ্মণগণ সম্পূর্ণরূপে অল্পমূল্যে আত্ম বিক্রয় করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মনস্বী ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্ববৎ পরিণাম চিন্তা করিয়া উপস্থিত ব্যাপারের ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিবেন। যাহারা উদর জ্বালায় অস্থির হইয়াছেন, তাঁহারাও উহাতে উদরপূর্ণ করিতে সমর্থ হইবেন না। লাভের মধ্যে কেবল আত্মবিক্রয়। ব্রাহ্মণাত্মার মূল্য এত অল্প নহে ইহা যেন ব্রাহ্মণ মাত্রেরই মনে থাকে।

বিজিত দেশবাসীগণ চিরকালই জেতৃজন-কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইবে। প্রায়ই কৌশল বা বল এবংবিধ স্থলে প্রয়োজিত হয়। বলে নিপীড়ন অসুরের কার্য্য, কৌশলে পীড়ন ধূর্ত্তের স্বভাব। গুণে মুগ্ধ করা মহতের কার্য্য। অবশ্য সংসার চক্রের বিবর্ত্তনে কচিৎ বল বা কৌশলের প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে অবাধে ন্যায়ের মুণ্ডপাত হইলে মনুষ্যত্ব কি রহিল? কিন্তু বিষয়ের দাস ধন-গৃধ্নু জন অতি অল্প সময়ই ন্যায় রক্ষা করিয়া থাকেন। তাদৃশ লোকের বচন রচনাতে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক আত্মহত্যা করা নির্ব্বোধের কর্ম্ম। ব্রাহ্মণগণ মধ্যে অনেক এরূপ হইয়াছেন যে, যৎসামান্য লোভের দাস হইয়া অনায়াসে আত্মনাশ করিতেছেন। ব্রাহ্মণোচিত প্রতিভা তেজ সারল্য, সত্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া কলুষিত হওয়া ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নহে। অধুনা অসুরতার সময়, যে অসুরতা করিবে সেই সংসারে কাজের লোক হইবে। কিন্তু অসুরের আসুরকার্য্য পরিণামে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, অসুরও নির্ম্মূল হয়। পরিণাম ভাবিয়া, ব্রাহ্মণগণ অসুরক্রিয়া হইতে বিরত হইয়া দেবভাবের প্রয়াসী হইবেন। ব্রাহ্মণত ভূদেব। সংসারে নরদেব প্রধান হইলেও ভূদেবের নিকট পদানত। ব্রাহ্মণ সেই সম্মান পরিত্যাগ করিবেন না। যাহার সম্মান সে রক্ষা করিলে অন্যে তাহা সহজে ক্ষয় করিতে পারে না। শ্যেনপাত অর্থাৎ শ্যেন পক্ষি দ্বারা পক্ষিনাশ অনেকেই দেখিয়াছেন। নির্ব্বোধ

শ্যেন পক্ষী জানে না তাহার স্বজাতি বিহঙ্গকুল ধ্বংস করিতেছে, প্রভুর মনস্তুষ্টি জন্য আত্মনাশ করিতেছে। প্রভু সত্য বুলিলেন আর অমনি শ্যেন গলিয়া গেল—পুলকিত হৃদয়ে আবার পক্ষিনাশে প্রবৃত্ত হইল। ব্রাহ্মণ এরূপ শ্যেন প্রকৃতি প্রাপ্ত হইবেন না। প্রভু সত্য বলিলেই যে, সত্য হইয়াছ ইহার প্রমাণ কি? প্রভু যে, সত্য তাহা কে বলিল? তাহার স্বার্থ সাধন জন্য সে যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, বলিতে পারে, আমরা কেন স্বার্থ বিসর্জন দিয়া অসঙ্গত প্রস্তাবে প্রবৃত্ত হইব? এরূপ পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া অন্ততঃ ব্রাহ্মণগণ অধঃপাত হইতে স্বস্থানস্থিত হইবেন। আমরা বলিতেছি আর্য্যগণ! ঘোর কলিকাল উপস্থিত, সাবধান হইবেন, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ অলৌকিক ব্যবহারেও দেখা যায় যে, কদাচার ও ব্যভিচারে ব্রাহ্মণগণেরই বিশেষ ক্ষতি ও নীচতা লাভ হয়। নীচতা লাভ করিতে মনুষ্যের ইচ্ছা হইতে পারে না। ব্রাহ্মণগণ ঐ দেখ ম্লেচ্ছগণ আর্য্য হওয়ার বাসনায় কত প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছে। উচ্চকুল বা কুলীন বলিয়া পরিচয় দিতে সকলেই প্রয়াসী, তবে কেন ব্রাহ্মণগণ জগতের উচ্চপদারূঢ় হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক রসাতলে যাইতে ইচ্ছা করিতেছেন? ব্রাহ্মণগণ! পূর্ব্বস্মৃতি স্মরণ করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন। কলির যৌবন উপস্থিত, আর নিস্তার নাই। কলির আগমন শুনিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজত্ব পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন। আমরা সেই কলিকালে শান্তভাবে জীবন নির্ব্বাহ করিব, ইহা অসম্ভব। কলিনাশক কল্কীর আবির্ভাবের পূর্ব্বে প্রত্যেকে স্ব স্ব ধর্ম্ম পালন করিলেই অনেকাংশে শান্তিলাভ করিতে পারিবেন। ব্রাহ্মণগণ সাবধান হউন।

স্ত্রী-শিক্ষা।

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি "বিদ্যা নানারূপ আমাদের মঙ্গলের কারণ হইলেও নারীগণের পরম শত্রু। এইরূপ কঠোর শারীরিক পরিশ্রম বা গুরুতর মানসিক চিন্তা এ সমস্ত নারীর পক্ষে বর্জ্জনীয়। কেননা ঐ সমস্ত

কার্য্য দ্বারা নারী জীবনের সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্ব প্রধান উদ্দেশ্য সম্পাদিত হইতে পারে না। এইরূপ হইবার কারণ এই যে নারীগণের মস্তিষ্কের আত্যান্তিক আলোচনার জন্য উহার বিশেষ ক্ষতি হয়। ঐ ক্ষতি পরিপূরণের জন্য নারীর অন্য অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে রক্তাদি মস্তিষ্কে প্রেরিত হয়। অর্থাৎ নারীগণের অন্য অন্য অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত না হইলে নারীগণের মস্তিস্ক পরিপুষ্ট হয় না।" তবে তাহাদের দয়া, সহিষ্ণুতা, কোমলতা ইত্যাদি গুণ গুলি যাহাতে বর্দ্ধিত ও বিকসিত হয় তাহার চেষ্টা ও সেরূপ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

এ সম্বন্ধে স্ত্রী-শিক্ষাদানেচ্ছু কোন এক পত্রিকা বলিয়াছেন যে "স্ত্রী-জাতির প্রকৃতি যেমন পুরুষ হইতে ভিন্ন, সেইরূপ তাহাদিগের শিক্ষারও বিভিন্ন হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। পুরুষেরা এক প্রকার গুণেও রমণীগণ অন্য প্রকার গুণে বিখ্যাত হইবেন এটা অখণ্ডনীয় ঐশিক নিয়ম, যাঁহারা এ প্রভেদ স্বীকার করেন না তাহারা নারী প্রকৃতি অবগত নন। তাঁহারা পুরুষোচিত গুণে নারীগণকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া তাহাদিগকে বিকৃত ও হাস্যাস্পদ করিতে চান এবং তাহাদিগের দ্বারা সমাজের যে কল্যাণ হইত, তৎপথে কণ্টক রোপণ করেন। মুখ দ্বারা আহার ও নাসিকা দ্বারা শ্বাসক্রিয়া সম্পন্ন হইবে ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু মুখের দ্বারা শ্বাস কার্য্য এবং নাসিকা দ্বারা আহার কতক পরিমাণে সম্পন্ন হইতে পারে দেখিয়া যাহারা স্বভাবের ব্যবহার বিপর্য্যয় করেন, তাঁহাদিগের আহার ও শ্বাস ক্রিয়া উভয়েরই ব্যাঘাত হয় সন্দেহ নাই। পুরুষ জাতিকে পুরুষ প্রকৃতির শিক্ষা এবং নারী জাতিকে নারী স্বভাবোপযোগী শিক্ষা দান করাই পরস্পরের এবং জনসমাজের কল্যাণের কারণ, তাহার অন্যথা করিলে অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে। রমণীগণ পুরুষ প্রকৃতি লাভ করিয়া লজ্জা, মধুরতা, বিনয় ইত্যাদি গুণে ক্রমেই হীনা হইতেছেন।" *

---

* আমাদের মতে স্ত্রীজাতির বিভিন্ন প্রণালীর শিক্ষা প্রদান করা নিতান্তই কর্ত্তব্য। এভিন্ন পুরুষের ন্যায় উচ্চ শিক্ষা অর্থাৎ যে প্রণালীর শিক্ষাতে রমণীদের মস্তিষ্কের বিশেষরূপে আল্যেচনা করা আবশ্যক; সে প্রণালীর শিক্ষা দেওয়া নিতান্তই অন্যায়!

সম্প্রতি স্ত্রী-শিক্ষায় যেরূপ অবস্থা তাহাতে যাহা পুরুষের শিক্ষনীয় স্ত্রীলোকেরা প্রায় তাহাই শিক্ষা করিতেছেন স্ত্রী পুরুষ উভয়ের উভয় জাতিয় শিক্ষা না হইলে সংসারের কখনই উন্নতি হইবে না। গৃহস্থালি, গার্হস্থ শিল্প, পাক বিদ্যা এই সকল স্ত্রীলোকের প্রধান ও অবশ্য শিখিতব্য। বর্ত্তমান প্রণালীর স্ত্রীশিক্ষাতে এ সকলের অভাব বশতঃ সমাজের অবস্থা নানা প্রকারে শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বে স্ত্রী-লোকেরা পুস্তক পড়িতেন না, অক্ষর আঁকিতেও জানিতেন না, কিন্তু তাঁহারা গৃহস্থালি গার্হস্থ উপযোগী শিল্প, বিণয়, সদাচার, প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় শিক্ষনীয় বিষয়গুলি উত্তমরূপে শিক্ষা লাভ করিতেন। তাঁহারা বালিকাদিগকে যে সকল খেলা রচনা করিয়া নিবিষ্ট করিয়া রাখিতেন তদ্বারা বালিকাদিগের বালিকা অবস্থাতেই গৃহস্থালি শিক্ষার অনুরাগ সঞ্চার হইত। রাঁধাবাড়ি খেলায় রাধন বিষয়ে অনুরাগ উৎপাদন করিত। পুতুল খেলায় পালন ও তাহা-দের বিবাহ, আত্মীয় কুটুম্বের আদর আহ্বান, দাম্পত্য ধর্ম্মের মর্য্যাদা, লৌকিকতা রক্ষা, প্রতিবেশীপ্রেম, পুত্রবধূ ও কন্যাদিগকে শিক্ষা প্রদান তাহাদের কলহ ভঞ্জন ইত্যাদি গৃহস্থালির শিক্ষা ও অমৃত স্বরূপ লজ্জা, ভয়, বিনয়, কোমলতা প্রভৃতি জন্মিত। বিনা শিক্ষায় কিছুই হয় না, অতএব কি গৃহস্থালি, কি সন্তান পালন সমস্তই শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। যাহা শিক্ষনীয় তাহা শৈশব অবস্থাই শিক্ষা করা কর্ত্তব্য, কেন না বাল্য-কালে যাহা শিক্ষা করা যায়, তাহাতেই উত্তম ব্যুৎপত্তি জন্মে। বয়োবৃদ্ধি সহকারে নানা বিষয়ে বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হওয়ায় সেই সময় কোন বিষয়েই উত্তমরূপে শিক্ষা করা যায় না। তখন ভোগের সময়, সুখভোগে মন ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে, সুতরাং কষ্টসাধ্য শিক্ষা সেই সময় হইতে পারে না। তখন বুদ্ধি প্রশস্ত হয় সত্য, কিন্তু সংসারের নানা চিন্তায় ব্যাকুল হইতে হয় ও ঈদৃশ কষ্ট সহ্য হয় না। এই সকল কারণে শিশুকালেই সমস্ত শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সময়ে বালিকাগণ একমাত্র লেখা পড়ার দিকেই মন সংযোগ করিতেছে। উপরিক্ত কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি অনেকেই শিক্ষা করেন না অথবা শিক্ষা করিতে অবকাশ পান না।

স্কুলের পড়াই শিক্ষা করিবে, না, সাংসারিক কার্য্যগুলির প্রতি মনোযোগ দিবে। কেহ কেহ বলেন যে লেখা পড়া শিখিয়া উত্তমরূপে জ্ঞানলাভ করিলে রমণীগণ অতি সহজেই ঐ সকল কর্ত্তব্য কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। যুক্তি ও তর্ক দ্বারা ইহাই ধারণা হয় সত্য, কিন্তু ঘটনাস্থলে দাঁড়াইয়া দেখিলে দেখা যায় যে, লেখা পড়া শিখিয়া উপরি-উক্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি অনেকেই স্বহস্তে সম্পাদন করিতে সক্ষম হন না এবং কেহ কেহ গৃহস্থালির এ সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম শিক্ষার আবশ্যকতাও তত মনে করেন না।

ফলতঃ আমরা রমণীদিগের উচ্চশিক্ষার (অর্থাৎ যে শিক্ষাতে মস্তিষ্ক অত্যাধিক আলোচনার জন্য শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্ষতি হয়) আবশ্যকতা মাত্রই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। যে শিক্ষাতে ভগবানের আজ্ঞা ও নিয়ম উপেক্ষা হয় সেইরূপ শিক্ষাতে সমাজের মঙ্গল হউক বা নাই হউক তাহা কখনই শিক্ষনীয় নহে। আমরা স্ত্রী জাতির সাধারণ শিক্ষার (আর্থাৎ যে শিক্ষাতে তাহাদের দয়া' সহিষ্ণুতা, কোমলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ গুলি বর্দ্ধিত ও বিকশিত হয়) বিশেষ পক্ষপাতী। বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই বলেন যে, প্রাচীন কালেও আর্য্যেরা রমনীদের উচ্চ শিক্ষা ও স্বাধীনতা প্রদান করিতেন কেন? ইহার উত্তরে আমরা নিম্ন লিখিত ২। ৩টি কথা এস্থানে উদ্ধৃত করা নিতান্ত আবশ্যক মনে করি।

বেদব্যাস।

১২৯৮ সাল। ষষ্ঠ বর্ষ। জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

লেখকগণ।

Printed by Udoya Chyran Pal, At the New Bilmick Press,
159, Manicktolla Street, Calcutta.

ষষ্ঠ বর্ষ।

ষষ্ঠ ভাগ। জ্যৈষ্ঠ, সন ১২৯৮ সাল। ২য় খণ্ড।

দেবি! প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতে, নিত্যং যথা স্রবধাদধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানিসর্ব্বজগতাঞ্চশমং নয়াশু, উৎপাত পাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্॥

মাগো! প্রসন্ন নয়নে একবার কটাক্ষপাত কর। মহাবল পরাক্রম অস্থরগণকে নিধন করিয়া যেমন এখন ত্রৈলক্য রক্ষা করিলি, সেইরূপ প্রবল শক্রর হস্ত হইতে ভবিষ্যতেও সর্ব্বদাই এ অনাথ সন্তান রক্ষা করিতে হইবে। মাগো! আমাদের তুই বিনে আর "আমার" বলিবার নাই! মা! সর্ব্ব জগতের পাপ বৃত্তি করিয়া দে, আর সহ্য হয় না, হৃদয় দগ্ধ হইয়া গেল, ত্রিভুবন ভস্ম অতি সত্বর সকলের পাপ চিন্তা বিধ্বংশ কর। মাগো! আর বিধ পাপাশয়ের পাপাচারাদিদ্বারা সে সকল উৎপীড়ন উপ তাহার শান্তি কর। মা! কেবল মাত্র তুইই আমাদের গতি দের শরণ, ও আশ্রয়। তুই রক্ষা না করিলে, তুই কট আমাদিগের উপায়ন্তর নাই।

স্ত্রী-শিক্ষা।

১। অতি প্রাচীন সময়ের আর্য্যদিগের মধ্যেও কেহ কেহ পুরুষের ন্যায় রমণীদের উচ্চশিক্ষার ও স্বাধীনতার আবশ্যক মনে করিলেও ২।৪টি মাত্র রমণীকে উচ্চ শিক্ষা ও স্বাধীনতা দিয়াই তাঁহারা হয়তঃ বুঝিতে পারিলেন যে, রমণীগণ উচ্চ শিক্ষা ও স্বাধীনতা প্রাপ্ত হওয়ায় তাহাদের জীবনের সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য বিনষ্ট হইতেছে ও সমাজের কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি উপেক্ষিতা ও বিশৃঙ্খল হইতেছে। তাই তাঁহারা (শাস্ত্রকারেরা) প্রায় সকলেই একবাক্যে স্ত্রীর স্বাধীনতার ও উচ্চ শিক্ষার বিরুদ্ধে মত প্রদান করিয়া গিয়াছেন। নতুবা যাঁহারা (মহর্ষিরা) সময় সময় দুই একটী রমণীকে উচ্চশিক্ষা ও স্বাধীনতা প্রদান করিয়াও আবার তাঁহারাই নিজ ব্যবস্থাপত্রে "স্ত্রীজাতির বেদে অধিকার নাই'' তাহাদিগকে কখনই কিছুতেই স্বাধীনতা দিবে না" বলিয়া পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া যাইতেন না।

২। যদি প্রাচীন কালে রমণীদের সর্ব্বত্রই উচ্চশিক্ষা প্রদান করা হইত, তবে আমরা সমস্ত বেদ, পুরাণ, ইতিহাসে ২। ৪টি মাত্র দৃষ্টান্ত না দেখিয়া সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইতাম।

৩। পুরুষের উচ্চশিক্ষার জন্য আর্য্যগণ নানাপ্রকার নিয়ম বিধিবদ্ধ গিয়াছেন। আর্য্যেরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পুরুষদের শিক্ষা সম্বন্ধে চার ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু রমণীদের সম্বন্ধে এ সকল দেখা যায় না। রমণীদের স্ত্রীসুলভ কর্ত্তব্য কর্ম্ম (এ সম্বন্ধে বিস্তার বলা হইবে) ভিন্ন অন্য প্রকার শিক্ষার যে বিশেষ (অমনে করিতেন স্পষ্টরূপে এমন কোন প্রমাণ দেওয়া যাইতে

...মান সময়ে আমরা যে সকল প্রাচীনকালের সাধ্বী রমণীদের লোচনা করিতেছি, তাঁহারা কেহই বেদ পুরাণে, উচ্চ-এরূপ স্পষ্ট কোন প্রমাণ নাই। তবে যে কেহ কেহ রুক্মিণী) উচ্চ শিক্ষার পরিচয় দিতেন, তাহা দ্বারা ইহা

নিশ্চয় প্রতিপন্ন করা যায় না যে তাঁহারা রীতিমত পুরুষের ন্যায় উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও এখানে সেখানে দুই একটী লেখা পড়ায় অশিক্ষিতা প্রাচীণা রমণী আছেন, যাঁহাদের গভীর উপদেশ শুনিলে অবাক হইতে হয়। তাঁহারা পুরাণ ইত্যাদি শ্রবণ করিয়াই উচ্চদরের ধার্ম্মিকা রমণী বলিয়া পরিচিতা হইতেছেন।

আর্য্যগণ শারীরিক ও মানসিক সমস্ত সৎ বৃত্তিগুলির অনুশীলন ও সামঞ্জস্য রক্ষা করাকেই ধর্ম্ম অথবা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই যেমন কাহারও কোন একটী বৃত্তির বিশেষ অনুশীলন দেখিলেই অস্থির হইয়া পড়েন, প্রাচীন আর্য্যেরা সেরূপ হইতেন না। তাঁহারা বলিতেন ও বুঝিতেন যে, দয়াময় ঈশ্বর যে সৎবৃত্তিগুলিই প্রদান করিয়াছেন, সে সকলেরই যথাসাধ্য অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। আর্য্যেরা রমণীদিগকে কুমারী অবস্থায় চিরজীবন থাকিতে আদেশ করেন নাই। তাঁহারা বলিতেন তুমি কুমারী অবস্থায় থাকিবে কেন? ভগবান যে সকল সৎবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন তাহার সামঞ্জস্য রাখিয়া অনুশীলন কর। তাঁহারা বলিতেন,—তুমি স্ত্রীজাতি, তুমি পুরুষের সমান উচ্চ জ্ঞান লাভের অধিকারী নহ—তোমার ক্ষমতা অনুসারেই সাধারণ ভাবে বিদ্যা শিক্ষা কর, বিবাহিতা হও, সন্তান প্রসব ও প্রতিপালন কর, গৃহস্থাশ্রমের তোমার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি সম্পাদন কর, পরোপকার কর, আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী ইত্যাদি যখন যে কোন প্রকার দুঃখ কষ্টে পতিত হইবে, তুমি সাধ্যানুসারে তাহাদের সাহায্য কর তাহা হইলেই তোমার ধর্ম্ম হইবে। সে দিন এক কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে যে, একটি ইংরেজ কুমারী কুষ্ঠগ্রস্থ লোকদিগের শুশ্রুষারজন্য ভারতে আসিয়াছেন। দেশের অনেকেই তাঁহাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ দিতেছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিচার করিয়া দেখিলে তিনি বিশেষ ধন্যবাদের পাত্রী নহেন? হয় ত এই রমণী ঈশ্বর প্রদত্ত অন্যান্য বৃত্তিগুলি একেবারে উপেক্ষা করিয়া এক দয়াবৃত্তির বিশেষ অনুশীলন করিতেছেন। প্রাচীন আর্য্যেরা এরূপ রমণী কি পুরুষকে প্রশংসা করিতেন না। বরং অনেকস্থলে বিবেচনা করিয়া দেখিলে এরূপ ব্যক্তিকে পাপী বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা স্ত্রী এবং পুরুষের যে সকল আদর্শ

লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; তাহাতে সম্পূর্ণরূপে না হউক আংশিকরূপে সমস্ত শারীরিক ও মানসিক সাধু বৃত্তিগুলি যাঁহারা সামঞ্জস্য রাখিয়া অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। তাঁহারা আর্য্য রমণী-দিগকে এরূপ ভাবে শিক্ষা প্রদান করিতেন যে যদ্দারা গৃহস্থাশ্রমের সমস্ত কার্য্যই তাঁহাদের দ্বারা নিষ্পন্ন হইত, এ ভিন্ন প্রাতিবেশী আত্মীয় স্বজনের মধ্যেকাহারও কোন দুঃখ কষ্ট কি পীড়া হইলে তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য ও শুশ্রূষাকরিতেন। আজ যদি ভারতের সমস্ত না হউক অধিকাংশ রমণীগণ সেই পূর্ব্বকালের মত তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন ও প্রাতিবেশী দীন দরিদ্র ও পীড়িত ব্যক্তির সাহায্যও শুশ্রূষা করেন তবে ইংলণ্ড আমেরিকা হইতে রমণীদের আনাইয়া সেবা শুশ্রূষা করার দরকার হয় না ও দীন দুঃখি-দেরও এত কষ্ট সহ্য করিতে হইত না। পরস্পর পরস্পরের যদি সকলেই সাহায্য করি, তবে দুঃখ কষ্ট স্থান পাইবে কেন ?

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের শিক্ষিত মহোদয়গণ ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশেও স্ত্রী শিক্ষার দৃষ্টান্ত দেখিতেছেন এতদ্ভিন্ন শাস্ত্রাদিতেও দেখিতেছেন যে, “কন্যামেব পালনীয়া শিক্ষানীয়তিযত্নতঃ” অর্থাৎ কন্যাকে পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে। কিন্তু কি প্রণালীতে, কি কি শিক্ষা দিলে আর্য্য রমণীগণের হৃদয় আরও প্রশস্ত ও পবিত্র হইবে সে সম্বন্ধে অনেকেরই একেবারেই দৃষ্টি নাই। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর কি কি গুরু-তর দোষ আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। শিক্ষিত মহোদয়গণ কাগজে কলমে স্ত্রী শিক্ষার উন্নতি না দেখিয়া একবার বঙ্গের গৃহে গৃহে পরিভ্রমণ করিয়া ধীরভাবে দেখিবেন যে বর্ত্তমান প্রণালীর শিক্ষাতে উন্নতি অপেক্ষা অবনতির ভাগ অধিক হইয়াছে কি না ?

১। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর সর্ব্বপ্রধান দোষ এই যে, এই শিক্ষাতে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা কিছুই হয় না। ধর্ম্ম ও নীতি বিহীনা শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া এ দেশের যুবকগণের চরিত্র দিন দিন শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। আবার এ দিকে সেই প্রণালীর অনুসারে শিক্ষা রমণীদিগকেও দেওয়া হইতেছে। যে প্রণালী শিক্ষাতে যুবকগণের চরিত্র মন্দ হইতেছে, সেই প্রণালীর শিক্ষায় রমণীদের হৃদয় উন্নত ও পবিত্র হইবে যাঁহারা

বলেন অথবা সেইরূপ শিক্ষার প্রশ্রয় দেন তাঁহারা যে অত্যন্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

২। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের রাজা ভিন্নদেশবাসী। তাঁহাদের ভাষা ধর্ম্ম আচার ব্যবহার রীতিনীতি রুচি ইত্যাদি সমস্তই বিভিন্ন। পুরুষগণ বাধ্য হইয়া সেই ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিতেছেন, কিন্তু রমণীদিগকেও কেন সেই ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিশেষ যত্ন হইতেছে তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ঘরে বাহিরে সকলেই যদি বিজাতীয় ভাষা ও হাবভাব শিক্ষা করি তবে এ দেশের জাতীয় উন্নতি যে কখনই হইবে না তাহা নিশ্চয়। বর্ত্তমান সময়ে এমন অনেক শিক্ষিত স্ত্রীপুরুষ আছেন যাহারা বিলাতে কয়টা বড় বড় ষাঁড় আছে তাহা বলিতে পারেন। কিন্তু এ দিকে দেশের, বাড়ার, বংশের কোন তত্ত্বই জানেন না। স্ত্রীজাতির শিক্ষার ভার সম্পূর্ণরূপে আমাদের হাতেই আছে। আমরা ইচ্ছা করিলেই তাঁহাদিগকে জাতীয় ভাবে শিক্ষা দিতে পারি।

৩। এই ধর্ম্ম ও নীতি বিহীনা শিক্ষার ফলে বর্ত্তমান শিক্ষিতা রমণীগণ বাহিরে কতকটা সাধুতা দেখাইতে সক্ষম হন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের ভিতরে সাধুভাব অনেকেরই নিতান্ত সামান্য। অনেক শিক্ষিত মহোদয়গণ এই প্রকার শিক্ষিতা রমণীর ব্যবহারে সুখী হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু আত্মীয় স্বজন এমন কি পিতা মাতা ভ্রাতা, শ্বশুর ইত্যাদি ব্যক্তিগণ তাঁহাদের ব্যবহারে নিতান্ত অসুখী, এক কথায়, বর্ত্তমান শিক্ষিতা রমণীগণ পতি পুত্র ভিন্ন আর কাহাকেও হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা ভক্তি ও ভাল বাসিতে পারিতেছে না।

৪। শৈশব কাল হইতে কেবল এক মাত্র লেখা পড়ার দিকে রমণীগণ মনসংযোগ করায়, গৃহস্থালির কার্য্যে নিতান্ত অপটুতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান শিক্ষিতা রমণীদের মধ্যে "পাকা গৃহিণী" অতি অল্পই আছেন। অল্পব্যয়ে, অথচ সুচারুরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে অনেকেই সক্ষম নহেন। রমণীদের গৃহস্থালিশিক্ষার অভাবে অনেক পরিবার উৎসন্ন যাইতেছেন। অনেক ভদ্র লোকের সংসারের সামান্য সামান্য কাজ কর্ম্মের জন্য বাহুল্য ব্যয় করিতে হয়। চাকর চাকরাণীর মাহিয়ানা দিতে

দিতেই অনেকে অস্থির। আমরা এমন অনেক পরিবারের অবস্থা জানি যে পুরুষেরা মাসে ২০০। ৩০০ টাকা মাহিয়ানা পান অথবা অন্তোপায়ে আয় করেন,অথচ উপস্থি উক্ত কারণে সমস্তই ব্যয় হইয়া যাইতেছে। কোন কোন স্থলে এমনও দেখিয়াছি যে,কর্ত্তা মাসে ৪০০। ৫০০ টাকা পাইতেন, তাঁহার মৃত্যুর পরদিন স্ত্রী পুত্র কি খাইবে তাহা ভাবিয়া অস্থির হইতে হইয়াছে। ফলতঃ সর্ব্বত্রই যে এই ঘটনা হইতেছে তাহা নয়, তবে অনেক স্থলেই রমণীদের গৃহকার্য্য শিক্ষার অভাবে ব্যয় বাহুল্য হইতেছে ইহা নিশ্চয়।

৫। ধর্ম্ম ও নীতি বিহীন হইলে মানুষের যে সকল দুরবস্থা হইতে পারে, আমাদের সমাজের যুবকযুবতীগণ ক্রমে ক্রমে সেই সকল দুরবস্থার যাইয়া উপস্থিত হইতেছেন। তবে হিন্দু বালক বালিকাগণের পূর্ব্বপুরুষদিগের সঞ্চিত অনেক সদ্‌গুণ ছিল বলিয়া এখনো একেবারে শোচনীয় অবস্থায় যাইয়া দাঁড়ায় নাই। কিন্তু এখনো সাবধান না হইলে পরিণাম ফল বড়ই বিষময় হইবে।

আজ কাল আমাদের দেশে স্ত্রীগণ শিক্ষালাভ করায় আর যত লাভ হউক আর নাই হউক,প্রায় সকলেই ন্যূনাধিক পরিমাণে বিলাসিনী হইয়া পড়িয়াছেন। বিলাসিতা তাহাদের মধ্যে এতদূর প্রবল হইতেছে যে, গৃহে কাজ করা অনেকের নিকট দাস্যবৃত্তি বলিয়া বিবেচিত হয়। পুরুষেরাই স্ত্রী জাতির দুর্দ্দশার একশেষ করিতেছেন। পুরুষেরা স্ত্রী শিক্ষা স্ত্রী শিক্ষা করিয়া আন্দোলন তুলিয়াছেন। স্ত্রী-কলেজ, স্ত্রী-বিদ্যালয়, অন্তঃপুরে স্ত্রী-লোক দ্বারা স্ত্রীদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লিতে, গৃহে গৃহে স্ত্রী-শিক্ষার জন্য সভাসমিতি নানাপ্রকার চেষ্টা করিতেছেন। স্ত্রালোকেরা পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে শিক্ষিতা হইতেছেন। স্ত্রী-শিক্ষিতা হইয়া এই ফল ফলিতেছে যে,—স্ত্রীলোক বিলাসিনী হইয়া পড়িতেছেন। গৃহের কাজকর্ম্ম করিতে গুরুজনের সেবা শুশ্রূষা করিতে অনিচ্ছা হইতেছে। শরীরটিকে বিবিদের অনুকরণে পোষাকে আবৃত করিয়া নবেল পড়িতে, কার্পেট বুনিতে, বিদেশে নিজের সমবয়স্কাদিগকে পত্র লিখিতে, স্বামীকে সাধু ভাষায় সম্বোধন করিতে শিখিয়াছেন। গৃহস্থালির কাজকর্ম্ম এবং অনেকের পক্ষে সন্তান প্রতিপালন ইত্যাদি কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি

আর ভাল লাগিতেছে না। আজ "কথামালা" "বোধোদয়" পর্য্যন্ত পড়িয়া অমনি স্ত্রীগণ শিক্ষিতা হইতেছেন, অমনি গৃহ কার্য্য ত্যাগ করিতেছেন, অমনি সন্তান পালন করা ভার বোধ করিতেছেন। যে শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে রমণীগণ গৃহকার্য্যে অবহেলা করে, সন্তান লালন পালনকে ভার বোধ করে, গুরুজনের সেবা শুশ্রূষাকে অপমান বোধ করে, তাহাই কি শিক্ষা! কেবল কি লেখা পড়া করিলেই স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হইল? গৃহকার্য্য, সন্তান লালন পালন রক্ষণ, স্বামী সেবা, অতিথি সেবা, পূজনীয় ব্যক্তিদের সেবা, এই সকল প্রধানতঃ স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষণীয়।

বর্ত্তমান সময়ে কি পুরুষ, কি স্ত্রী প্রকৃত শিক্ষা কাহারও হয় না। পুত্র অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তাহার ঐহিক সুখবর্দ্ধন করিবে এই উদ্দেশ্যই পিতার মনে জাগরূক থাকে। সুতরাং যে বিদ্যা লাভ করিলে আয় বৃদ্ধি হয়, পিতা তাহার পুত্রগণকে সেই বিদ্যাই শিক্ষা করান। বালকের মনে যাহাতে ধর্ম্মভাবে অনুরঞ্জিত হয়, যাহাতে সুনীতি পরায়ণ হয়, তৎপক্ষে আমাদের দেশের সাড়ে পোনর আনা লোক যত্ন করেন না। এদিকে ইংরাজী শিক্ষার ফলে বালকের মনে পাশ্চাত্য ভাব বদ্ধমূল হইতেছে, হিন্দুদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রে কি আছে তাহা তাহারা অবগত হইতেছেন না, হিন্দু সমাজের মর্য্যাদা তাঁহারা বুঝিতেছেন না, পাশ্চাত্য আচার ব্যবহারের দিকে তাহাদের মন আকৃর্ষিত হইতেছে; সুতরাং তাহা অবলম্বনের জন্য তাহারা আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। এইরূপে বালকগণ কৃতবিদ্য হইয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করিতেছেন। সংসারে ঢুকিতেছে।

সেইরূপ আমাদের রমণীগণেরও প্রকৃত শিক্ষা হয় না ও হওয়ার উপায় নাই। পিতা মাতার শাস্ত্র জ্ঞান নাই কন্যাকে ধর্ম্মকথা শুনাইবেন কিরূপে। পূর্ব্বে কথকতা প্রণালী বাহুল্য রূপে প্রচলিত থাকাতে রমণীগণ রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদি বর্ণিত সদুপদেশ সকল হৃদয়স্থ করিয়া উচ্চভাব লাভ করিত। এখন সে পদ্ধতিটী লুপ্ত প্রায়। প্রাচীনা রমণীগণ উপদেশ পূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা জানিত। কন্যা কি বধূর কোন ত্রুটী দেখিলে, তাহা আওড়াইয়া তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিত। এখনকার

রমণীগণ সে সকল উপদেশ পূর্ণ বাক্য গ্রাহ্য করেন না। তাঁহারা বিদ্যাবতী হইয়াছেন নানা রকমের নাটক উপন্যাস পড়িতে শিখিয়াছেন। এখন কি আর সে কেলে লোকের বাজে কথায় ভাল লাগে? প্রাচীনা রমণীগণ অনেক গুণে বিভূষিতা ছিলেন। গৃহকার্য্য তাঁহারা গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাদের প্রস্তুত করা খাদ্য দ্রব্য লোকে খাইয়া তৃপ্তি লাভ করিলে, তাঁহারা আপনাদিগকে ধন্য বিবেচনা করিতেন। বর্ত্তমান সময়ের রমণীগণের অনেকেই এ বিষয়ে উদাসীন। বৃদ্ধা রমণীগণ পর দুঃখে কাতরা। গৃহের লোকের কথা দূরে থাকুক প্রতিবাসীর মধ্যে কেহ রোগাক্রান্ত হইলে তাঁহারা তাহার সেবা ও শুশ্রূষা করিয়া আপনাদিগকে ধন্যা বিবেচনা করিতেন। ওলাউঠায় রোগীর মলমূত্র পরিষ্কার করিতেও তাঁহারা ঘৃণা বোধ করিতেন না। বসন্ত রোগীর বিভৎস দৃশ্য তাঁহাদিগকে ভীত করিত না, তাঁহারা অনায়াসে রোগীর গায় হাত বুলাইয়া, স্ফোটকের পূঁজ ধৌত করিতেন। বর্ত্তমান শিক্ষিতা রমণীদের মধ্যে এ শ্রেণীস্থ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল।

আমরা এক্ষণে বিলাসিতা ও অতিরিক্ত অধ্যয়নে স্ত্রী-জাতির কি কি ব্যাধি হইতে পারে তাহারই ২। ১টী মাত্র উল্লেখ করিব।

১ম হিষ্টিরিয়া।

বিলাসিতা হিষ্টিরিয়া রোগের কারণ—

"বালিকা প্রতিপালনের প্রণালী, উহাদের সাধারণ স্বভাব, কোন প্রয়োজনীয় কার্য্যের অভাব, অলস স্বভাব, সুখাভিলাস, অতিরিক্ত আদর, সামাজিক রীতি বিশেষের বশীভূত হইয়া ক্লেশ স্বীকার, নৃত্য গীতাদিতে রাত্রি জাগরণ, কল্পনা প্রচুর সরল উপাখ্যান পাঠ ইত্যাদি এই রোগের কারণ মধ্যে গণ্য। এ ভিন্ন প্রেম নৈরাশ্য ইত্যাদিও ইহার অন্যতর কারণ। (See Dr. Roberts, Theory and practice of madicine, Page, 864, 6th Edn.)

শ্রম বিমুখ ও অলস স্বভাব হইলে দেহের ক্রিয়া সকল সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। কারণ উহাতে রক্ত সঞ্চালনের স্বল্পতা হয়, তজ্জন্য হস্ত

পদাদি শীতল, ত্বক শুষ্ক, যকৃতের ক্রিয়াবদ্ধ, অজীর্ণ কোষ্ঠ বদ্ধ, অর্শ, প্রভৃতি নানাপীড়া জন্মিয়া থাকে। এদেশীয় ধনীগণেরও শ্রম বিমুখতা বশতঃ এই শ্রেণীস্থ নানা পীড়া হইয়া থাকে।

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহোদয় তাঁহার ধাত্রীশিক্ষা নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন :—"গর্ভ হলে যে পোয়াতি বরাবর নিয়মিত শ্রম করে, সে বেশ সচ্ছন্দে থাকে, তার পেটের ছেলেও সুস্থ থাকে আর খালাস হওয়ার সময় কষ্টও পায় না। নিয়মিত শ্রম করিলে শরীর সবল থাকে। শরীর সবল ও বশে থাকিলে পোয়াতি সহজেই খালাস হইতে পারে। সংসারের নিয়মিত কাজকর্ম্ম কত্তেই বৌ ঝিরা হিম সিম খেয়ে যায়। তাদের আর কোন রকম শ্রম করিবার দরকার নাই। তবে যাদের দশটা দাস দাসী থাকে তাদের ইচ্ছা ক'রে শরীর খাটাতে হয়, নৈলে খালাস হওয়ার সময় দাস দাসীরা তাঁদের ঠ্যাকাতে পারবে না। গর্ভ হলে যে পোয়াতি শরীর খাটিয়ে আপনার বশে রাখে তারই জিত। সে ধাই না পৌছিতে খালাস হইয়া বসে থাকে। আর যিনি গর্ভ হলে এ রকম ভাবে থাকেন যে, তুলে ধত্যে গলে পড়েন, তাঁদেরই সর্ব্বনাশ। টেনে হিঁচড়ে খালাস না করালে আর তিনি খালাস হইতে পারেন না। এই জন্যই ভদ্রলোকদের ঝি বৌদের চেয়ে ইতরলোকের বৌ ঝির খালাস হইতে এত কম কষ্ট পায়। ভদ্রলোকের ঝি বৌদের খালাস করাতে মাথার ঘাম পায়ে পড়ে। কেবল বসে বসে থাকে, এতে কি না বল হয়, না শরীর বশে থাকে! পুরুষেরা এক আধটুকু কাজ কর্ম্ম করেন এখানে সেখানে যান; কিন্তু মেয়েরা নড়েও বসে না। এখনকার মেয়েগুলো এমন অকেজোও হয়েছে। কেবল বসে বসে কার্পেট সিলাই। আগে দেখেছি ভদ্রলোকের বাড়ীতে মেয়ে মানুষ থাকলে, বাড়ীর কার্য্যের জন্য পুরুষদিগের কিছুরই অভাব হইত না। এখন ঠিক তার উলটো দেখতে পাই। যাঁদের ভাল রকম খাওয়া পরা চলে না মেয়েদের জন্য তাঁদেরও দাস দাসী রাখতে হয়। আজ কাল দেখি, ভদ্রলোকদের ঘরে মেয়েদের জন্যই বাড়ীর পুরুষেরা অস্থির। মিনসে মাসে দশ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে না, কিন্তু স্ত্রীর নবাবীর জন্য দিন তার বার গণ্ডা পয়সা

খরচ না কল্যেই চলে না। আজ কাল ভদ্রলোকের ঘরেই অভাব বেশী ও অনেক ভদ্রলোকের কেবল এইজন্যই সর্ব্বশান্ত হইতেছেন। মেয়েদের রাঁধিবার জন্য মাইনে করা রাধুনি চাই। তাঁহারা সহজেই যে সব কাজ করতে পারেন, সেই সকল কাজের জন্য চাকর চাকরাণী চাই। পুরুষেরা চাকর চাকরাণীর মাইনে যোগাবে না তাদের ভাত কাপড় দিয়ে পুষবে?"

উক্ত মহাত্মার কথাগুলি আজ বঙ্গের সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে। এ দিকে সম্মিলনী, হিতদায়িনী সভা সমিতি "স্ত্রীশিক্ষা" "স্ত্রীশিক্ষা" করিয়া অস্থির হইতেছেন!! আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য, নতুবা শিক্ষিত মহোদয়গণ ইহা জানিয়া শুনিয়াও এই প্রণালী শিক্ষার প্রশ্রয় দিতেছেন কেন? আমরা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী নহি, কিন্তু যে প্রণালীর শিক্ষায় রমণীদের কল্যাণ হইবে, যে প্রণালীর শিক্ষায় সমাজের মঙ্গল হইবে, যেরূপ শিক্ষায় সাধ্বী রমণীর হৃদয় আরো পবিত্র হইবে, সেই প্রণালীর শিক্ষা আমাদের রমণীগণকে কিছুই দেওয়া হইতেছে না।

২। অতিরিক্ত অধ্যয়ন অথবা মানসিক চিন্তা। মনের সহিত দেহের বিশেষ সম্বন্ধ, মানসিক বিকার বশতঃ যে দেহ পীড়িত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। অধিক কাল পর্য্যন্ত মানসিক চিন্তা করিলে এই সকল পীড়া হইতে পারে। যথা :—

মন্দাগ্নি, কোষ্টবদ্ধ, উদরাময়, হৃৎপীণ্ডের ক্রিয়া বৃদ্ধি রজোরোধ ইত্যাদি পীড়া জন্মিবার বিশেষ সম্ভাবনা। অন্যান্য স্থানের ন্যায় মস্তিষ্কের রক্তাবহা গতী সকল পেসীর চাপে রক্ষিত নহে বলিয়া মস্তক অবনত করিয়া পরিশ্রম করিলে হৃৎপীণ্ডের ক্রিয়া বৃদ্ধি হইয়া মস্তিষ্ক রক্তপূর্ণ হয়। তজ্জন্য মস্তক ঘূর্ণন, কর্ণে শব্দ দৃষ্টি হীনতা ইত্যাদি পীড়া জন্মে। আমরা কোথায় বালকগণের এই সকল নানা গুরুতর পীড়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিব না বালকাদগের অপেক্ষা সর্ব্বপ্রকার হীনা ও দুর্ব্বলা বালিকাগণকে এইসকল গুরুতর রোগের হস্তে ইচ্ছাপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিতেছি। ক্রমশঃ
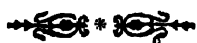
প্রতিমূর্ত্তি পূজা রহস্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আচার্য্য। তোমার প্রশ্ন চতুষ্টয়ের, প্রথম দ্বিতীয় প্রশ্ন গতবারে মীমাংসিত হইয়াছে। এবার তৃতীয় প্রশ্নের বিষয় বলিব। মা সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজ করিতেছেন। জল, স্থল, অন্তরীক্ষ, কোন স্থানেই মায়ের অভাব নাই। মায়ের ঐশ্বর্য্য মহিমাদিও সর্ব্বাধারে সমাকারে দেদীপ্যমান। অতএব জল, স্থল, তরু লতাদি সাধারণ আধার পরিত্যাগ করিয়া প্রতিমা নির্ম্মাণের প্রয়োজন কি। দ্বিতীয়তঃ, প্রতিমা নিকটে থাকিয়াও যদি তাহা উপাসকের দৃষ্টি গোচর পর্য্যন্ত না হইল, তবে তাহা সন্নিধানে রাখিবার আবশ্যকতা কি। এই প্রশ্ন সহজত উপস্থিত না হইয়া পারে না সত্য, কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই তাহা নিরাকৃত হয়। তখন দেখা যায় যে, প্রতিমার ন্যায় দ্বিতীয় একটি পূজা যন্ত্র আর সম্ভবে না। প্রতিমা—সন্নিধানে যেরূপ মায়ের সন্দর্শন হইতে পারে, অন্যত্র কুত্রাপি তাহা হইবে না এবং প্রতিমা ব্যতীত মায়ের পূজা নিষ্পন্ন হওয়াই একরূপ অসম্ভব বিবেচনা হয়।

বিষয়টি একটু দুর্গম হইতে পারে। একটু স্থির ভাবে মনোনিবেশ করিবে। আমি যথা সাধ্য বিস্তার ক্রমে এ বিষয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করিব।

বাহ্য পূজা-প্রসঙ্গে, পূজার তত্ত্ব বিষয় বারিবার দর্শিত হইয়াছে। তখন নিশ্চয় হইয়াছে যে, পার্থিব দেহ ধারিণী গর্ভ ধারিণীর ন্যায় জগদম্বাকে ভাল বাসিতে হইবে। এবং সেই অকপট ভাল বাসার প্রণোদিত হইয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে হইবে। দৃশ্যমানা গর্ভধারিণী মায়ের ন্যায়, সেই অকৃত্রিম পরিচর্য্যা করাই জগদম্বার "পূজা"।

এই পূজাতে দুটি বিষয়ের নিতান্ত প্রয়োজন হইতেছে। একটি মায়ের সন্নিধি। দ্বিতীয়, পূজকের তাহা অনুভব করা। ইহা ব্যতীত প্রকৃত পূজা হওয়া অসম্ভব। মা জাগ্রতরূপে সুন্নিধানে না থাকিলে তাঁহার অঙ্গের পরিচর্য্যাদি (পূজা) করা কস্মিন্‌কালেও হইতে পারে না। আর পূজক যদি মাকে দেখিতে না পায়েন তবে মায়ের সন্নিধির দ্বারাও কোন

ফল নাই। তাহাতে কোন উপহার দান করা যায় না। দানের প্রবৃত্তিও হয় না। মায়ের কর চরণাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির প্রত্যক্ষ দর্শন এবং স্থিরতর নিশ্চয় থাকা চাই। তাহা না থাকিলে কেমন করিয়া যথাযোগ্য-রূপে উপহার প্রদান করি।

মনেকর, তুমি যেন মায়ের সেবা করিতে বসিলে। এখন দশোপচার পূজা করিতে হইবে। তাহা হইলে, প্রথমেই পবিত্র জল সেচনে পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া মায়ের পদ সেবা করিতে হইবে। তৎপর, রক্ত-চন্দন বিমৃক্ষিত দূর্ব্বাক্ষত জবা বিল্ব পত্রের দ্বারা মায়ের ললাট মণ্ডলের উপরিভাগে সীমন্ত দেশে শুভশোভাবহ অর্ঘ দান করিবে। তৎপর, সুগন্ধি সলিলের দ্বারা মায়ের শ্রীমুখ মণ্ডল প্রক্ষালন করাইতে হইবে। অনন্তর, মধুপর্ক দান করিয়া পুনর্ম্মুখ প্রক্ষালন। তৎপর, সুবাসিত তৈলের দ্বারা মায়ের সর্ব্বাঙ্গ অভ্যঞ্জন, তৎপর স্নান ইত্যাদি। এইরূপ এক এক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে এক এক উপহার সজ্জিত করিতে হইবে।

এখন যদি মা তোমার সন্নিধানে বিদ্যমানা না হয়েন, এবং তাহা হইলেও, তুমি তাঁহার কোন অঙ্গাদির অনুভব বা লক্ষ্য করিতে না পার, তবে কেমন করিয়া কোন্ স্থানে কোন্ উপহার সমর্পণ করিবে। আর ঐরূপ নির্লক্ষ্য উপহার দানে প্রবৃত্তিই বা কি প্রকারে হইবে। অতএব পূজাকালে মায়ের সন্নিধি এবং পূজকের তাহা দর্শন হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হয়।

এতদুভয়ের মধ্যে, মায়ের সন্নিধির নিমিত্ত আর কোন চেষ্টার প্রয়োজন নাই। কারণ তাহা স্বতঃ সিদ্ধই সর্ব্বত্র আছে। মা সর্ব্ব ব্যাপিকা সর্ব্বাধারা। তিনি সমস্ত ঐশ্বর্য্য মহিমাদির সহিত সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে সমভাবে বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং সর্ব্বত্রই মায়ের সন্নিধি। কিন্তু তাহার অনুভবের অভাব রহিয়াছে। মা সর্ব্বত্র থাকিলেও তাঁহাকে যথাযোগ্যরূপে সর্ব্বত্র অনুভব বা প্রত্যক্ষ করা যায় না। সুতরাং তাঁহার সেবা করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িল। অতএব যেরূপে তাঁহার দর্শন করা বা অনুভব করা যায় তন্নিমিত্ত যত্ন চেষ্টার প্রয়োজন হইল।

এই ত গেল এ দিকে। তৎপর আরো একটি কথা আছে। সে কথাটি পূর্ব্বের কথা অপেক্ষায় আরো গুরুতর। কথাটি এই।—

পূজার ন্যায় মায়ের প্রেমানন্দ লাভ করাও তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শনাপেক্ষ। মাকে স্বচক্ষে না দেখিলে, মায়ের প্রতি প্রেম উচ্ছ্বসিত হয় না। তদীয় আনন্দও ভোগ করা যায় না। প্রেম, আনন্দ, আর মায়েররূপাদিসন্দর্শন করা ইহারা পরস্পরে পরস্পরের অপেক্ষা করে। মেঘ এবং বায়ুর ন্যায় ইহারা ইতরেতরাশ্রিত পদার্থ। কিছুমাত্র প্রেম বা ভালবাসা না থাকিলে মাকে কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। আনন্দও হয় না। আবার,মাকে যদি কিছু মাত্র অনুভব না করা যায় তবে প্রেম হইতে পারে না। সুতরাং তদীয় আনন্দও হয় না। প্রেম ও আনন্দ বিকাশের দ্বারা মায়ের দর্শনানুভূতি ক্রমে সমুজ্জলভাব গ্রহণ করিবে। আবার দর্শনানুভূতির সুপরিস্ফুর্ত্তির দ্বারা প্রেমানন্দ প্রবর্দ্ধিত হইবে। মেঘের দ্বারা বায়ুর সহায়তা, বায়ুর দ্বারা মেঘের সহায়তা। যে পরিমাণে, যতটুক পরিষ্কার মতে, মাকে দেখিতে পাইবে, সেই পরিমাণেই প্রেমানন্দের পদোন্নতি হইবে। এইরূপ অন্বয়-ব্যতিরেকী নিয়মের কস্মিন্ কালে অন্যথা হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

এই প্রেমানন্দ ভোগ করিবার জন্যই কিন্তু মায়ের সেবার্চ্চনা করা। ইহারই নিমিত্ত এত ক্লেশ এত আয়াস মস্তকে লইয়া বহন করিতে হয়। কিন্তু মায়ের দর্শনাভাবে সেই প্রেমানন্দ লাভে বঞ্চিত হইতে হয়। মাকে না দেখিতে পাইলে তাহার বিকাশ হইবে না। প্রেমানন্দ না হইলে মায়ের পূজা করাও বিফল, করা উচিত বা বিহিতও নয়। অতএব মায়ের দর্শন নিতান্ত প্রয়োজন হইল। মায়ের স্বরূপ নির্ণয়-স্তম্ভে, আরও বিস্তাররূপে এ বিষয় দর্শিত হইয়াছে। এখানেও আর কিছু বলিতেছি। একটী সাধারণ প্রেম আর দর্শনের প্রতি পর্য্যবেক্ষণ করিলেই বোধ হয় এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইবে। অতএব একটু বিষয়ান্তরিত হওয়া আবশ্যক।

মনে কর, গর্ভধারিণী মা এবং তাঁহার প্রতি ভক্তিরূপ ভালবাসা বা প্রেম এতদুভয় সাধারণ বিষয়। প্রত্যেক জীবই ইহার অনুভব করিতে

পারে, করিয়া থাকে। তুমি এই স্থলেই একটু অভিনিবিষ্ট হইয়া প্রকৃত বিষয় নিশ্চয় করিয়া লও।

মায়ের গর্ভ হইতে তাঁহার দেহের অংশ লইয়া যখন জীব জন্মগ্রহণ করে তখনই মায়ের প্রতি ভালবাসা বীজ অঙ্কুরিত হয়। তৎপর তাঁহার দ্বারা যে উপকার রাশি প্রাপ্ত হয় তদ্দ্বারা মায়ের প্রতি একরূপ অন্বয় ব্যতিরেক ভাবের ন্যায় দাঁড়াইয়া যায়। তাঁহার অভাব মনে করিলে, কিম্বা বাস্তবিক হইলে, যেন নিজেরও অভাব হইয়া পড়ে, জীবন শূন্যময় হয়। চতুর্দ্দিক অভাবময়, অন্ধকারময় হয়। আবার তিনি বিদ্যমানা রহিয়াছেন বলিয়াই, যেন নিজে বাঁচিয়া আছি এইরূপ অনুভব হয়। ইহাও একরূপ প্রেমেরই বর্দ্ধিষ্ঠ অবস্থা বটে, ইহা একরূপ ভালবাসারই পরিপুষ্ট অবস্থার ফল বটে কিন্তু এই ভালবাসা বা প্রেম প্রকৃত ভালবাসা নহে ইহা ভিন্ন জাতীয় একরূপ প্রেম। ইহার দ্বারা কোন কার্য্য সিদ্ধি হয় না। এই ভালবাসা পুত্রের বিশ্বাস এবং বিবেচনা মূলক। পুত্র বিবেচনার দ্বারা মায়ের কৃত ক্রিয়া গুলিকে আপনার মহদুপকারক বলিয়া বিশ্বাস করে, তদনুসারে এইরূপ অবস্থা হয়। ইহা হইতে প্রকৃত প্রেমানন্দের আবির্ভাব হয় না। কিন্তু কৃতজ্ঞতা বৃত্তিটা সমুদ্দীপ্তা হয়। ইহার স্থায়িত্বের ভরসাও অতি কম। কারণ ইহা বিবেচনা এবং বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন। যদি কোন কারণে ঐ বিশ্বাস এবং বিবেক কোনরূপে পরিবর্ত্তিত হয়, তবে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই, তৎক্ষণাৎ, ঐ প্রেম ও ভালবাসারও অভাব হইয়া যায়। এই ভালবাসা ভ্রান্তি জ্ঞান হইতেও উৎপন্ন হয়, সত্যজ্ঞান হইতেও উৎপন্ন হয়। আবার ভ্রান্তি জ্ঞান হইতেও বিনষ্ট হয়, এবং সত্যজ্ঞান হইতেও বিনষ্ট হয়। কেহ যদি পুত্রকে এইরূপ বদ্ধমূল ভ্রম মূলক বাক্য বলে যে, "তোমার মাতা তোমার নিমিত্ত যাহা কিছু করিয়াছেন, যাহা তুমি উপকার বলিয়া বিশ্বাস করিতেছ, তাহা প্রকৃত উপকার নহে। তাহা কৃত্রিম উপকার। তাহা মাতার স্বার্থসিদ্ধি মূলক কার্য্য। বেতন ভোগী বা বেতন প্রয়াসী ভৃত্য কৃত কার্য্যের ন্যায় স্বার্থ মূলক কর্ত্তব্য কার্য্য মাত্র। উহা নিঃস্বার্থ উপকার নহে। তুমি জীবিত থাকিলে মাতার নানাবিধ ইষ্ট সিদ্ধি হইবে তৎ প্রত্যাশায়ই মাতা

তোমার লালন পালনাদি করিয়াছেন। মা যাহা করিয়াছেন অন্যের দ্বারাও ইহা অনায়াসে সম্পন্ন হইত। তোমার পিতা একটা ধাত্রী নিয়োগ করিলে তদ্বারাও তোমার জীবন যাত্রা হইত। অতএব মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতার কোন কারণ নাই, ভালবাসারও প্রয়োজন নাই।"

এইরূপ বলার দ্বারায় যদি তোমার তাদৃশ বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে পারে তবে কি তোমার এই প্রেম,ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতাদি কিছু থাকিবে? কখনই না,উহা সমূলে উৎপাটিত হইবে। তোমার এই ভ্রান্তিমূলক পরবর্ত্তী বিশ্বাসের দ্বারা পূর্ব্বেকার সত্য বিবেচনা মূলক বিশ্বাস একবারে তিরোহিত হইবে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহা হইতে সমুৎপন্ন পূর্ব্বেকার ভালবাসা প্রেমাদিও অন্তর্হিত হইবে।

অথবা কোন ব্যক্তি যদি কোন পুত্রকে এইরূপ মিথ্যা কথা সত্যরূপে বুঝাইয়া দিতে পারে যে তাহার মাতা তাহার কিছুই করেন নাই, তাহা হইলেওপ্রেম ও ভালবাসা উলটিয়া যাইবে। কিম্বা মা যদি হঠাৎ কোন পুত্রের কোন একটা গুরুতর অনিষ্ট সাধন করেন,তাহা হইলেও সমস্ত ভালবাসা বিনষ্ট হইতে পারে। এরূপ ঘটনা অজস্র ঘটিয়া ও থাকে। অতএব এইরূপ বিবেক ও বিশ্বাস জনিত ভালবাসা কোন ফল দায়ক হয় না।

মাতার সম্বন্ধে যদি তোমার এ কথা বিশ্বস্ত না হয় তবে,অন্য যে দিকে ইচ্ছা, লক্ষ্য করিয়া দেখ, সেই খানেই ইহার দৃষ্টান্ত পাইবে। কোন সাধারণ বন্ধু বান্ধব বা যে কোন ব্যক্তির প্রতি এইরূপ বিবেক, বিশ্বাস মূলক ভালবাসা দেখিবে, সেই খানেই উক্ত ঘটনার প্রমাণ পাইবে। সুতরাং এরূপ ভালবাসা বিশেষ কোন কার্য্যকারক নহে।

কিন্তু আর এক প্রকার ভালবাসা জন্মে। তাহা মাতার মুখ খানি এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভাবভঙ্গী ও অবস্থাদির সন্দর্শন করিলে। এইটিই বাস্তবিক ভালবাসা। ইহাতে জ্ঞান, বিবেক বা বিশ্বাসের কোনই অপেক্ষা নাই। শাস্ত্র, জ্ঞান, বিবেক, বিশ্বাস একত্রিত হইয়া সহস্র সহস্র আঘাত প্রদান করিলেও এই ভালবাসাকে বিনষ্ট বা ক্ষীণ করিতে পারে না। ইহা ক্রিয়ামূলক ভালবাসা। ইহা হইতে প্রেমানন্দের সমুচ্ছ্বাস হয়, হৃদয় উন্ম ত্তকয়। ইহা হইতে কৃতজ্ঞতাদি কোন বৃত্তি উদ্ভাসিত হয় না।

প্রসন্ন নয়নে, প্রসন্ন ভাবে, স্নেহময়ী জননী যখন সন্নিধানে দাঁড়াইয়া সন্তানের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, এবং সন্তান ও তাঁহাকে সাগ্রহে দৃষ্টি করে, তখন তাঁহার স্নেহাদির দ্বারা সন্তানের স্নেহাদি উদ্ভাসিত হয়। মাতার মুখমণ্ডল হইতে পাদতল পর্য্যন্ত সমস্ত অবয়ব হইতে সুধাময়,শান্তিময় স্নেহ কিরণ বিকীর্ণ হয়। তাহা সন্তানের দেহ নয়ন, মন, প্রাণ ও আত্মাকে সম্ভাবিত করে। মাতার অপার করুণা সিন্ধুর উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা বিসর্পিত হইয়া, সন্তানকে উদ্বেলিত করে। তখন কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত সন্তান তাহার উপলব্ধি করে। অনন্তর, সাধারণ ঘাত-প্রতিঘাত ক্রিয়ার ন্যায়, ক্রিয়া উপস্থিত হয়। তখন সন্তানের অকৃত্রিম স্নেহ বা ভালবাসা বা প্রেমাশয় তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে। ক্রমে বিসর্পিত হইয়া মাতার দেহ নয়ন, মন প্রাণকে প্রতিসেবিত করে। তখন মাতার স্নেহ করুণা আরও দ্বিগুণ বেগে উচ্ছ্বসিত হয় এবং দ্বিগুণ বেগে বিসর্পিত হইয়া পুরোবর্ত্তী সন্তানকে সমাপ্লুত করে। সন্তানেরও পুনর্ব্বার তাদৃশ ঘটনা হয়। এইরূপে, মাতা এবং সন্তানের পরস্পর স্নেহ করুণাদির দ্বারা পরস্পরের স্নেহ করুণাদি সমুর্চ্ছিত, সম্ভাবিত, ও সম্বর্দ্ধিত হয়। উভয়ে একত্রিত হইয়া সম্পিণ্ডিত হয়। পরস্পরের মধ্যে পরস্পরে ওত প্রোত ও অণুপ্রবিষ্ট হয়—গাঁথাগাঁথি হয়। অর্থাৎ "টানা পৈরাণের" সূত্ররাশি একত্রিত হইয়া যেমন অপূর্ব্ব একখানি বসন নির্ম্মাণ করে সেইরূপ উভয় স্নেহ মমতাদি সমস্ত একত্রিত হইয়া একটি মাত্র অপূর্ব্ব স্নেহ মমতাদির সমষ্টি-পরিণত করে। তখন উভয়ের পার্থক্য করা যায় না। এই সময়েই সন্তান প্রেমানন্দ অনুভব করিয়া থাকে। এইত হইল সন্দর্শন জনিত ভালবাসার মর্ম্ম।

অতঃপর যখন মাতা পুত্র উভয়ে বিপ্রকৃষ্ট হয়েন তখনকার অবস্থাটাও জানা আবশ্যক। মাতা পুত্রের বিপ্রকর্ষকালে ভালবাসার উচ্ছ্বাসাবস্থা থাকে না সত্য, কিন্তু সংস্কার অবস্থা থাকে। আর যখন মায়ের তাদৃশ অবস্থাটি হৃদয় মধ্যে উদ্ভাসিত হয় তখনই আবার পূর্ব্ববৎ উচ্ছ্বাস হয় হৃদয় প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে থাকে। কিন্তু মাকে সম্মুখে দর্শনকালে যে পরিমাণে প্রেমানন্দ উদ্বেলিত হয়, ঠিক ততটা হয় না।

মাতা ঐরূপ দৃষ্টিতে ঐরূপ ভাবে যতক্ষণ সন্নিধানে থাকিবেন, এবং

সন্তানও ঐরূপ অভিনিবেশে যতক্ষণ তাঁহাকে সন্দর্শন করিবে, ততক্ষণ, লক্ষ লক্ষ বাধা বিঘ্ন সমুপস্থিত হইলেও, যথোক্ত প্রেমানন্দের হানি করিতে পারিবে না। কিম্বা ঐ অবস্থা যতক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়ের স্মরণ পথে থাকিবে, ততক্ষণও প্রেমানন্দের বিঘ্ন হইবে না। তবে যখন উহা বিস্মৃত হইবে, তখন যদি কোন বিরোধী কারণ উপস্থিত হয় তবে অবশ্যই প্রেমানন্দ তিরোহিত হইবে। কিন্তু আবার যখনই উহার স্মরণ কিম্বা সন্দর্শন হইবে তখনই, সেই পুর্ব্ববৎ ভালবাসা বিকসিত হইবে।

সন্তানকে শতাপরাধে অভিযুক্ত জানিয়া মাতা, নিতান্ত বিরক্তা হইয়াছেন, সন্তানও জননীর শত শত দোষ অবগত হইয়া বিরক্ত হইয়াছে, কিন্তু আবার যখন ঐরূপে সন্দর্শন হইবে তখনই সমস্ত অপরাধ ও সমস্ত দোষ রাশির বিস্মৃতি হইবে। তখনই পূর্ব্ববৎ প্রেমানন্দ সমুচ্ছ্বসিত হইবে।

ইহার দৃষ্টান্ত স্থল আরও শত সহস্র আছে। দম্পতির পরস্পরের আকার প্রকার,ভাব ভঙ্গী,ও অবস্থাদির সন্দর্শনে পরস্পরের ভালবাসা সঞ্জাত হইলে, অনেক কারণে সময় সময় তীব্রতর বিরক্তি-ভাবও উত্তেজিত হয়। কিন্তু আবার যখন সেইরূপে সেইভাবে পরস্পরের সন্দর্শন হয় তখনই সমস্ত বিরক্তি-ভাব অন্তর্হিত হয়। তখনই পূর্ব্ববৎ ভালবাসা স্ফুর্ত্তি লাভ করে। অপরাস্ত্রী অপর পুরুষেওঅনেক সময়,পরস্পরের আকারপ্রকার কুভাবে সন্দর্শন করিয়াও পরস্পরে অনুরাগী হয়। কিন্তু পরে যদি সহস্র দোষে দুষিত জানিয়া পরস্পরকে একবারে পরিত্যাগ ও করে তথাপি, পুনর্ব্বার সেইরূপে সন্দর্শন হইলেই সমস্ত বিস্মৃত হইয়া পরস্পরে অনুরাগের উপলব্ধি করে। অধিক কি, কি মনুষ্য, কি গবাশ্বাদি পশু, অথবা বস্ত্রালঙ্কার গৃহ প্রভৃতি অচেতন দ্রব্য, যাহা কিছু সন্দর্শন করিয়া একবার অনুরাগ জন্মে,ঠিক সেইরূপ দর্শন থাকিলে, কদাচ তাহার অন্যথা হইতে পারে না। বিচার বিতর্কাদি দ্বারা তাহার শত সহস্র দোষ রাশি প্রত্যক্ষ করিয়া তীব্রতর বিরক্তিভাব জন্মিলেও, আবার যখন সেইরূপ সন্দর্শন হয়, কিম্বা সেইরূপে স্মরণোদয় হয় তখনই,অলক্ষিত ভাবে,আবার সেই ভালবাসা অনুরাগ আসিয়া উপস্থিত হয়।

শিষ্য। আপনি যাহা উপদেশ করিলেন তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু কোন কোন স্থলে এই নিয়মের ব্যত্যয় ও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অতএব কিছু সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। মাতা পিতা এবং স্বামী স্ত্রী প্রভৃতি অনেক স্থলেই ভালবাসার পরেও ভয়ানক বিদ্বেষভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। পরস্পরের সন্নিধি এবং সন্দর্শন সত্ত্বেও নিতান্ত বিরক্তি উপস্থিত হয়। পুত্র মাতাকে দেখিতে চাহেন না, মাতা ও সন্তানের মুখ দর্শনে বিরক্তা। এইরূপ পিতা-পুত্র ওপতি-ভার্য্যাদির মধ্যেও ঘটিয়া থাকে। অতএব দর্শন হইলেই ভালবাসা ও প্রেমানন্দ হয় একথার ব্যাঘাত হইল। বিচার বিতর্কের দ্বারা পরস্পরের দোষ জানিতে পাইলে যে এই ভালবাসার বাধা হয় না তাহাও স্থির থাকিল না। এবং বিচার বিবেক জনিত বিশ্বাস মূলক ভালবাসা হইতে যে এই সন্দর্শন-জনিত ভালবাসাকে ভিন্নজাতীয় বলা হইয়াছে তাহাও বিচলিত হইল।

আচার্য্য। কিছুই হয় নাই। আমি যাহা বলিয়াছি তাহাই স্থির আছে এবং থাকিবে। তোমার বুঝিবার ভুল হইয়াছে, তাই এইরূপ মনে করিতেছ। যে যে স্থানে তুমি ঐ সকল ব্যভিচার দেখিয়াছ তাহা প্রকৃত ব্যভিচার নহে। বাস্তবিক ঐ সকল স্থলে, তত্তৎ সময়ে, প্রকৃত সন্দর্শনই হয় না, সেইজন্য ভালবাসাও মনে আইসে না। যে স্থলে পুত্র, সত্য মিথ্যা নানারূপ বিচার বিতর্কের দ্বারা কুবিশ্বাসী হয়, তখনতদনুসারে অতি অপ্রসন্ন ও বিরুদ্ধ বিদ্বিষ্টভাবে কুটিল নয়নে মায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। মাতাও উহার বিবিধ অত্যাচারে উৎপীড়িতা হয়েন। তদনুসারে নিজের স্নেহ করুণাময়ীমূর্ত্তি লুকাইয়া উগ্ররূপে সন্দর্শন দেন। এরূপ স্থলে ভালবাসা এবং প্রেমানন্দ কোথা হইতে আসিবে। আমার নিয়মেরই বা কি কারণে ব্যভিচার হইবে! আমিত এমন কথা কুত্রাপি বলি নাই যে, পরস্পরের উগ্রদর্শন হইলেও প্রেমানন্দ হইবে। জননীর স্নেহ সুধাময়ী প্রতিমা যখন দৃষ্টিগোচর হইবে তখনই ভালবাসা প্রেমানন্দ আসিবে। ইহাই আমি প্রতিপন্ন করিয়াছি। অন্য বন্ধু বান্ধব সম্বন্ধেও এইরূপই নিয়ম। এই নিয়মের অন্যথা কুত্রাপি দেখিতে পাইবে না। অতএব তোমার সমস্ত আপত্তি মীমাংসিত হইল।

এখন দেখিতে পাইলেযে,সন্দর্শনের দ্বারাই প্রকৃত ভালবাসা ও প্রেমানন্দ প্রবর্দ্ধিত হয়। ঈদৃশ প্রেম ও প্রেমানন্দ কোন কারণেই ব্যাহত হইতে

পারে না ইহাও অসন্দিগ্ধ হইল। সন্দর্শন ব্যতীত অন্য কোন রূপেই প্রকৃত প্রেমানন্দ সমুদ্ভূত হইতে পারে না ইহাও নিশ্চিত হইল।

অতঃপর প্রকৃত স্থলে আগমন কর। প্রস্তাবিত জগন্মাতার প্রেমানন্দ সম্বন্ধেও উক্ত নিয়মের যোজনা করিয়া লও।

লৌকিক মাতা-পিত্রাদির ন্যায়ই জগদম্বার প্রেমানন্দ জানিবে। জগদম্বাকেও যখন প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে পাইবে তখনই প্রেম এবং প্রেমানন্দ স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে। আর যতদিন তাহা হইবে না ততদিন কোন মতেও তাঁহার প্রেমানন্দ লাভ করিতে পাইবে না।

জগন্মাতার অহেতুকী করুণা এবং অপার স্নেহ মমতার বিচিত্র কার্য্যাবলী সন্দর্শন করিয়া, সতত অনুধ্যান করিলেও এক প্রকার অনুরাগ বা ভালবাসা জন্মিতে পারে সত্য, কিন্তু তাহা কোন ফলদায়ক নহে। তাহাতে প্রেমানন্দের স্ফূর্ত্তি হইবে না; তাহা বিচার জনিত ভালবাসা। তাহার ভিত্তি অতি মৃদুলা এবং ভগ্ন-প্রবণা। একটু কিছু আঘাত লাগিলেই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। তোমা হইতে অধিক তর্কী, অধিক বিচার-ক্ষম একজন লোক আসিয়া বিরুদ্ধ চেষ্টা করিলেই উহা অন্তর্হিত হইবে। তিনি কুতর্কের প্রভাবে যখন তোমাকে বুঝাইয়া দিবেন যে, এ সংসারে জগদম্বা কাহারো কিছু করিতে পারেন না। অথবা করেন না। কিম্বা জগদম্বার অস্তিত্বেরই কোন প্রমাণাদি নাই। তখন তৎক্ষণাৎ তোমার সমস্ত বিশ্বাস ভক্তি সমূলে উৎপাটিত হইবে। সুতরাং ঈদৃশ ভালবাসা হওয়া না হওয়া সমান।

ধর, যদি বিচলিত নাই বা হও, কিন্তু তথাপি কোন ফল সিদ্ধি নাই। উহা প্রকৃত ভালবাসা পদের বাচ্যই নহে। দার্শনিকগণ যাহাকে ভালবাসা বা প্রেম বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন উহা সেই পদার্থই নহে। উহা মনের বিচার বৃত্তিরই রূপান্তর মাত্র। "জগদম্বা আমাকে রক্ষা করিতেছেন, তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন, আমার যাহা কিছু সমস্তই তাঁহা হইতে, অতএব তিনিই আমার একমাত্র গতি। তিনি আছেন বলিয়াই আমি আছি, তাঁহার অভাব হইলে আমারও অস্তিত্ব থাকে না।" মনের এইরূপ অবস্থা বা বৃত্তিটার নামই বিবেক জনিত ভালবাসা। এইরূপ অবস্থাটি মনের বিতর্ক

অবস্থা কিম্বা বিচার বৃত্তি হইতে কিছুমাত্র প্রভিন্ন নহে। সুতরাং "ভালবাসা" ইহার নামান্তর হইলেও, ইহা মনের সেই বিচারাবস্থা মাত্র। সুতরাং ইহা হইতে প্রেমানন্দ জন্মিতে পারে না।

যাহা প্রকৃত ভালবাসা তাহা কখনো বিচার বিতর্ক অপেক্ষা করে না। তাহা অন্তঃকরণের প্রবণতাবস্থা বিশেষ। তাহার স্বরূপই সুখ বা আনন্দ। সুতরাং তাহা হইতেই প্রেমানন্দ সমুত্থিত হয়। এই দ্বিতীয় ভালবাসাই জগন্মাতার সন্দর্শনের দ্বারা জন্মিয়া থাকে।

তবে কি ঐ বিচার জনিত ভালবাসা কিছুমাত্র প্রার্থনীয় নহে? তাহা বলিতেছি না। উহা নিজে প্রেমানন্দ জন্মাইতে পারে না তাহা সত্য, কিন্তু উহা দ্বিতীয় জাতীয় ভালবাসার বিশেষ সহায়তা করে। এমন কি অবস্থা বিশেষে, উহা না থাকিলে, দ্বিতীয় ভালবাসা জন্মিতেই পারে না। অতএব উহা মানবকে কৃতার্থ করিতে না পারিলেও, একান্ত প্রার্থনীয় বটে। এই জন্যই "ভবৌষধে" উহাকে ততটা আদর করা হইয়াছে। "ধর্ম্মব্যখ্যা" পাঠ করিলে এই উভয়বিধ ভালবাসার ভেদাভেদ অতি বিশদ রূপে বুঝিতে পাইবে। অতএব এ স্থলে আর বিস্তার করিলাম না।

শিষ্য। একটু সংশয় থাকিল। অনুগ্রহ পূর্ব্বক মীমাংসা করিয়া দিন। কোন কোন সময়ে কোন কোন উপাসককে, মায়ের করুণা স্নেহাদির অনুধ্যান ও আলপন করিয়া অশ্রুপাত করিতে দেখা গিয়া থাকে। উহা অবশ্যই আনন্দাশ্রু হইবে। ঐ সময়ে তিনি মাকে দর্শন করিতেছেন না। সুতরাং কেবল বিচার জনিত প্রেম হইতেই আনন্দের স্ফূর্ত্তি হওয়া সপ্রমাণ হইল। কিন্তু আপনি বলিয়াছেন যে, তাহা কদাচ হইতে পারে না।

আচার্য্য। আমি যাহা বলিয়াছি তাহাই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত জানিবে। উল্লিখিত স্থলে তোমারই ভ্রান্তি হইয়াছে। বাস্তবিক ঐ আনন্দও দর্শন জনিত প্রেমের আনন্দ। উহা বিচারজনিত নহে। ভক্ত ঐ সময়ে, মায়ের রূপ বাহ্যনয়নের দ্বারা না দেখিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার অন্তর্নয়নে নিশ্চয়ই মায়ের প্রতিমা প্রকাশিতা হয়। সেই জন্যই প্রেমানন্দের বিকাশ হইয়া থাকে। মনে মনে দর্শন আর নয়নের দর্শন উভয়ই সন্দর্শন বটে। অতএব তোমার সন্দেহ নিরাকৃত হইল।

এখন বড়ই কঠিন সমস্যা উপস্থিত। মাকে সন্দর্শন না করিলে প্রেম ও প্রেমানন্দ হইবে না, পূজা কার্য্যও সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। আবার মাকে দর্শন করাও ততোধিক অসম্ভব। মা যদিও সর্ব্ব-ব্যাপিনী, সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজ করিতেছেন, তথাপি তাঁহাকে দর্শন করা যায় না। তাঁহার দর্শনে গুরুতর অন্তরায় আছে। তহা নিতান্ত দুরুল্লঙ্ঘনীয়। সেই অন্তরায় দ্বিবিধ। একটি আন্তরিক, আর একটি বাহ্য। যেটি আন্তরিক বিঘ্ন, সেইটি আমাদের মন এবং নয়ন গত। আমাদের মন আর নয়নদ্বয় অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করে। আর বাহ্য অন্তরায়টি, বাহিরের দৃশ্য পদার্থের উপরে উপরে বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই উভয় অন্তরায়ের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে হইলে, ইহাদের মূল উপাদান অন্বেষণ করিতে হইবে। কি কারণ হইতে ইহারা আসিয়াছে তাহা জানিতে হইবে। তবেই ইহাদের স্বরূপের উপলব্ধি করা যায়। উক্ত দ্বিবিধ অন্তরায়েরই উপাদান কারণ অজ্ঞান বা অবিদ্যা। অবিদ্যারূপ মল, ঘনীভূত হইয়া, ঘোর অন্ধকারময় তমোগুণের দ্বারা আমাদের হৃদয় এবং নয়নকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং মা সন্নিধানে থাকিলেও, আমাদের নয়ন, মন তাঁহার সন্দর্শনে অপটু। সে নিতান্ত স্থূল ও জড়ীভূত হইয়া পড়িয়াছে। এ দিকে আবার বাহ্য পদার্থের উপরে উপরে একটা জড়তাময় স্তর বিস্তার করিয়া মাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। প্রগাঢ় মেঘমালার দ্বারা যেমন চন্দ্রপ্রভা সমাবৃতা হয়, এই জড়তা আস্তরের দ্বারা তেমন জগন্মাতা আবৃতা হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। একে নয়ন অপটু, তাতে আবার দৃশ্যের উপরে জড়তার প্রলেপ! সুতরাং কাহার সাধ্য মাকে দেখিতে পায়? নয়ন, মন যে দিকে অগ্রসর হয়, সেই দিকেই জড়তার আস্তর অবলোকন করে। যে দিকে তাকায়, সেই দিকেই জড়ের গুণ, জড়ের ধর্ম্ম, জড়ের ভাব, জড়ের ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করে। নয়নের নিকট, সমস্তই জড়তাময় মাত্র। ইহার মধ্যে যে জড়াতীতা আনন্দময়ী মা, সর্ব্বৈশ্বর্য্য, সর্ব্বগুণ, সর্ব্বাকার, সর্ব্বমহিমাদির সহিত বিরাজ করিতেছেন, নয়ন ও মন তাহার কিছুমাত্র লক্ষ্য করিতে পারে না।

যদিও, অতি কষ্টেশ্রেষ্টে,কোন সময়ে, কোন স্থানে,মায়ের এক আধটুকু

আভাস মাত্র দেখিতে পায়,তাহাও এত জটিল,এত অস্ফুট এবং সম্পিণ্ডিত যে,তদ্বারা কিছুমাত্র উপকার সাধন হয় না। তাহা দেখা না দেখা সমান। তাহা সূর্য্য মরীচিমালার ন্যায় সম্পৃক্ত ভাবে অনুভূত হয়। সূর্য্যের রশ্মিপুঞ্জ যেমন, নীল পীতাদি অসঙ্খ্য বর্ণে রঞ্জিত হইলেও,পরস্পরের সম্মূঢ়তা এবং ঘনরূপে, একত্র সমাবেশ নিবন্ধন, কোন তাহার বর্ণই পরিলক্ষিত হয় না। নীল,পীতাদি কোন বর্ণই,পৃথক্ বা পরিষ্কার রূপে,নয়নগোচর হয় না,কেবল মাত্র অস্ফুট একটা শুক্লভাস্কর রঙ্গের দৃষ্টি হইয়া থাকে। মায়ের দর্শন সম্বন্ধেও সেইরূপ ঘটনা হয়। দশদিকের যে দিকে দৃষ্টি করা যায়—সেই খানেই, মা সমস্ত মহিমাদি লইয়া বিরাজ করিতেছেন, সেই খানেই মায়ের চরণ, পাণি, কর, হৃদয়, উদর, মস্তক, মুখ, নাসিকা,নয়ন,শ্রবণাদি সমস্ত অবয়ব পরস্পরে অবিচ্ছিন্ন, ঘনীভূত ও একত্রিত রূপে আছে, সেই খানেই মায়ের স্নেহ, করুণা, মায়া, মমতা, ধৈর্য্য, ক্ষমাদি নিখিল গুণরাশি পিণ্ডীকৃতরূপে বিরাজ করিতেছে। সেই খানেই মায়ের সমস্ত ঐশ্বরী শক্তি এবং অনন্ত মহিমা একত্রিত ভাবে পরিপূরিত আছে। মায়ের কোন অবয়ব বা কোন গুণাদি,অন্য অবয়বাদি ও অন্য গুণাদি হইতে বিচ্ছিন্নভাবে, কোন স্থানেই থাকে না। এই ব্রহ্মাণ্ডে, এমন একটি পরমাণু ও নাই, যেখানে মায়ের সমস্ত অবয়ব ও সমস্ত গুণাদি নাই,কিম্বা মায়ের কতক কতক গুণাদি আছে আর কতকগুলি গুণাদি নাই। তাহা হইলে তাহার ক্ষুদ্রতা ও পরিচ্ছিন্নতা দোষ উপস্থিত হয়। মা যেমন সর্ব্ব পরিপূরিতা,পূর্ণা, সর্ব্বব্যাপিনী; তাঁহার ঐশ্বর্য্য, মহিমা,অবয়বাদিও তেমন সর্ব্বত্র পরিপূরিত,পূর্ণ এবং সর্ব্বব্যাপক। অতএব তাহার একটিরও কোনখানে অভাব থাকিতে পারে না। সুতরাং সকলগুলিই সর্ব্বত্র অবিচ্ছেদ্যভাবে অবস্থিতি করিতেছে। এই জন্য কোনটিরই দেখা পাওয়া যায় না। মায়ের হস্ত কোথা তাহাও স্থির করা যায় না,পদও দেখা যায় না,শ্রীমুখমণ্ডলাদিও কিছুই নির্দ্ধারণ করা যায় না; এবং কোন্‌টুকু স্নেহ, কোন্‌টুকু করুণা, কোন্‌টুকু মায়া, কোনটুকু সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব, কোন্ টুকু পালয়িতৃত্ব, কোন্ টুকু সংহর্ত্তৃত্ব, কোনটুকু বিবেক, কোনটুকুইবা জ্ঞান,ইত্যাদি কোন কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং কোনটার রসাস্বাদও হয় না, আনন্দও হয় না। কেবল মাত্র সকল

অবয়ব এবং সকল গুণাদির একটা সম্পিণ্ডিত আভাস, কাহারো কাহারো, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দৃষ্টিগোচর হয়। সুতরাংপূজা ও প্রেমানন্দ অসম্ভাব্য হইল।

এই সমস্ত অভাব দূরীকরার নিমিত্তই মায়ের প্রতিমূর্ত্তির প্রয়োজন হয়। প্রতিমা সন্নিধানে করিয়া বসিলে আর কোনরূপ অভাব বা অনুপপত্তি থাকিতে পারে না। প্রতিমা হইতে মায়ের সমস্ত অবয়ব, সমস্তগুণ, ও ঐশ্বর্য্য, শক্তি, মহিমাদি অতি পরিস্ফুটরূপে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রতিমায় মায়ের প্রকৃত সন্দর্শন হয়। তখন প্রকৃত প্রেম ও প্রেমানন্দ বিকসিত হয়। তখন মায়ের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি প্রত্যক্ষ করিয়া তদনুসারে পাদ্য, অর্ঘ, আচ মনীয়াদি উপহারগুলি অর্পণ করিয়া, ভক্ত, মায়ের সেবারূপ প্রকৃত পূজা করিতে পারে। পূজার-ফললাভও হয়।

সূর্য্যরশ্মি সম্বন্ধে কাচখণ্ডের ন্যায়, এই প্রতিমা, মায়ের রূপাদি সন্দর্শনের সহায়তা করে। সূর্য্যের মরীচিমালা-প্রদীপ্ত দেশে, একটি কাচদণ্ড দণ্ডায়মান রাখিলে যেমন তাহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ,কোলে-কোলে,অতি মনোহর দৃশ্য প্রকাশিত হয়—যেমন অতি সমুজ্জল নীল,পীত,রক্ত,হরিতাদিবর্ণমালা অতি পরিস্ফুট এবং পরস্পরে বিবিক্ত ও বিচ্ছিন্নভাবে দৃষ্টিগোচর হয়,এই প্রতিমার দ্বারাও ঠিক সেইরূপ ঘটনা সংসাধিত হয়। প্রতিমাও, মায়ের সমস্ত অবয়ব, গুণ, মহিমা,ও ঐশ্বর্য্যাদিশক্তিগুলিকে সুপরিস্ফুটরূপে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দেখায়। প্রতিমার এক এক অঙ্গের আড়ালে-আড়ালে, কোলে-কোলে, মায়ের এক এক অঙ্গ এবং গুণাদি বিভক্তরূপে দৃষ্টিগোচর হয়।

প্রতিমার চরণ যুগলের দ্বারা মায়ের চরণ কমল সুবিভক্ত হইয়া তাহার কোলে-কোলে, দৃষ্টিগোচর হয়। প্রতিমার মধ্য দেশের দ্বারা মায়ের মধ্যদেশ প্রবিভক্ত হইয়া, তাহার আড়ালে-আড়ালে,প্রকাশিত হয়। প্রতিমার কর চতুষ্টয়ের দ্বারা সুবিভক্ত হইয়া মায়ের কর চতুষ্টয় নয়ন গোচর হয়। প্রতিমার মুখমণ্ডলের দ্বারা মায়ের শ্রীমুখ মণ্ডল প্রবিভক্ত হইয়া, তাহার কোলে-কোলে, প্রকাশিত হয়। এইরূপ এক এক পৌত্তলিক অঙ্গের দ্বারা, মায়ের এক এক অঙ্গ প্রবিভক্ত ও প্রকাশিত হয়।

তৎপর, প্রতিমার নয়নের কোণে মায়ের টল-টল নয়ন ত্রিতয় প্রকাশিত হইয়া অপার স্নেহধারা বর্ষণ করিতে থাকে। প্রতিমার গণ্ড যুগল হইতে মায়ের মমতার প্রভাব প্রবিভক্ত হইয়া অনুভূত হয়। ঐ দেখ,ঐ শ্যামা প্রতিমার দিকে একবার লক্ষ্য করিয়া দেখ। ঐ দেখ উহার ললাট মণ্ডল হইতে মায়ের সুস্নিগ্ধ করুণামৃত জ্যোতি এবং বিবেক, বৈরাগ্য, ঔদাসীন্যের আভা প্রকাশ পাইতেছে। ঐ দেখ আবার! লোল রসনার করাল দশনের কটারে-কটারে, মায়ের সর্ব্ব সংহারক কালরূপের লক্ষণ! আর ঐ দেখ, ঈষদ্ধাস্য-ললিত মুখ মণ্ডল হইতে, মায়ের নির্লিপ্ততা এবং আনন্দ ভাব স্ফুটিত হইয়াছে। ঐ দেখ,আলুলায়িত,বিমুক্ত কেশ-পাশ হইতে, মায়ের বৈরাগ্য বিবেকাদিগুণের আভাস আসিতেছে। ঐ দেখ, খড়্গমুণ্ডধারী বাম ভুজ দ্বয় হইতে, মায়ের সর্ব্বশাসন কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ পাইতেছে। আবার দক্ষিণ ভুজদ্বয়ে বর অভয় প্রদত্ত হইয়া,মায়ের ভক্তবৎসলতা,ধার্ম্মিক প্রাণতা এবং অবিমুগ্ধতা ন্যায়পরতাদি কতগুণের বিকাশ করিতেছে। ঐ দেখ, প্রতিমার মুণ্ডমালায়, সর্ব্ববর্ণ প্রবর্ত্তিকা মায়ের এক পঞ্চাশত্ বর্ণমালা। ঐ দেখ, ঐ ঘন পীন পয়োধর হইতে যেন স্নেহমাখা দুগ্ধ ধারা ক্ষরিত হইতেছে। ঐ দেখ,উহার অনাবৃত বেশে,মায়ের নিস্কুটিল বিশুদ্ধ সরলভাব বিকাশ পাইতেছে, আর জগজ্জননীত্ব খ্যাপিত হইতেছে। ব্রহ্মা বিষ্ণু হইতে তৃণ কীট-পতঙ্গ পর্য্যন্ত সমস্তই মায়ের গর্ভজাত সন্তান সন্ততি মাত্র। ত্রিভুবনের মধ্যে মায়ের সন্তান ব্যতীত আর কেহই নাই। বিশুদ্ধ জ্ঞানবতী মা, সন্তানের নিকট কখনই লজ্জানুভব করিতে পারেন না। তাহাতে আবার অবোধ শিশু সন্তান। আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেই মায়ের নিকট অবোধ শিশু। সুতরাং লজ্জাবোধের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। তাই মায়ের অনাবৃত বেশ। দ্বিতীয়তঃ, মা লজ্জা, ভয়, ঘৃণাদি অষ্ট পাশের অতীতা, তাহাতেও মা'র অনাবৃত বেশ। এই সকল তথ্য রহস্য এই প্রতিমা হইতে প্রকাশ পাইতেছে। এই রূপে প্রতিমার এক এক অঙ্গ ও অবস্থা হইতে মায়ের এক এক শক্তি এক এক গুণ সুবিভক্ত হইয়া পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

তুমি বোধ হয় এখনও ইহার প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হও নাই। কিন্তু

যাহারা ভক্ত তাঁহারা এইরূপে মায়ের গুণরাশি নয়নগোচর করিয়া পরমানন্দ সমুদ্রে মগ্ন হইয়া যান, প্রেমে পুলকিত হয়েন।

দৃশ্যের জড়তা প্রলেপ এবং নয়নের অপটুতাদি দোষও এই প্রতিমার দ্বারাই অপনোদিত হয়। দৃশ্যবস্তু আর নয়নের মধ্যভাগে থাকিয়া উপনয়ন (চশমা) যেমন নয়নের অপটুতা এবং দৃশ্যের জড়ত্ব বিদূরিত করে, এই প্রতিমাও তেমন নয়ন আর জগন্মাতার মধ্যভাগে অবস্থিতি করিয়া নয়ন দ্বয়কে পটুত্তর করে, এবং মায়ের রূপাদি প্রকাশ করিয়া দেয়।

উপ-নয়নের দ্বারা কোন বস্তুর সন্দর্শন কালে, যেমন আমাদের দৃষ্টি, উপ-নয়নের প্রতি নিবদ্ধা থাকিলেও তাহার অনুভব হয় না; কিন্তু অনুভব হয় দৃষ্ট বস্তুটি মাত্রের। প্রতিমার দ্বারা জগন্মাতার দর্শনেও সেইরূপ ঘটনা হয়। তখন সাধকের নয়নদ্বয়, যদিও প্রতিমূর্ত্তির প্রতিই সন্নিবদ্ধ থাকে, কিন্তু তাহার অনুভব হয় না—অনুভব হয় জগন্মাতার রূপ গুণ মহিমাদির।

অথবা, জলের দৃষ্টান্তেও ইহা বুঝিতে পার। জল যেমন নয়নের অপাটব দোষ এবং দৃশ্য বস্তুর দুর্দর্শতা অপনোদন করে, এই প্রতিমাও তেমন আমাদের নয়নের দোষ এবং মায়ের দুর্দ্দর্শতা বিদূরিত করে। একটি উদাহরণ লও, তবেই বিষয়টা বিশদ হইয়া যাইবে। তুমি গ্রহণাদি সময়ে, জলের মধ্যে কখনও সূর্য্যমণ্ডল দেখিয়াছ কি?

শিষ্য। আজ্ঞা হঁ্যা, তাহা অনেকবার। জল না হইলে তো সূর্য্য বিম্বের দর্শন হওয়াই দুঃসাধ্য!

আচার্য্য। কিরূপে দেখিতে হয় বল দেখি?

শিষ্য। কোন কৃষ্ণবর্ণ পাত্রে জল রাখিতে হয়। তৎপরে কেবল জলের প্রতিই দৃষ্টিপাত করিতে হয়। তখন প্রথমে কেবল জল মাত্রই নয়ন গোচর হয়। তৎপর, সূর্য্য মণ্ডল দেখিব বলিয়া একটু আগ্রহ সহকারে বিশেষ একটু লক্ষ্য করিতে হয়। তখন ঐ জলের উপরে যেন সূর্য্যেররশ্মি-পুঞ্জ ভাসিয়া বেড়াইতেছে এইরূপ বিবেচনা হয়। আর জলের সঙ্গে সঙ্গে মাখাইয়া রশ্মিমালা দৃষ্টি গোচর হয়। অর্থাৎ জল ওরশ্মি, উভয়েরই দৃষ্টি হইয়া থাকে। তৎপর, আরও অভিনিবিষ্ট হইতে হয়। তখন ঐ জলের মধ্যে, রশ্মি জালে পরিমণ্ডিত সূর্য্যমণ্ডলের আভাসটি কতক কতক দৃষ্ট হইতে থাকে।

জলও যে,একবারেই নয়ন গোচর হয় না তাহা নহে,কিন্তু অতি সামান্য-রূপ। তখন মুখ্যরূপে তাদৃশ সূর্য্যমণ্ডলই পরিদৃষ্ট হয়,কিন্তু জল তাহার সঙ্গের সঙ্গী হইয়া গৌণভাবে ঈষদীষৎ পরিস্ফুরিত হয়। তৎপর আরও অবহিত হইয়া কেবল সূর্য্যমণ্ডল দেখিবার নিমিত্ত অভিনিবেশ করিতে হয়। তখন জল একবারেই দৃষ্ট হয় না, কিরণ প্রভাদিও বড় একটা দেখা যায় না। তখন নির্ম্মল সূর্য্যবিম্বটি মাত্রই দৃষ্টি গোচর হয়। এইরূপে জলের সহায়তায় সূর্য্যবিম্বদর্শন করিয়া থাকে।

আচার্য্য। যাহারা অত বিলম্ব,অত কষ্ট না করিয়া প্রথমাবস্থায়ই বিনিবৃত্ত হয়, অথবা সূর্য্যমণ্ডল দর্শনেরঐরূপ প্রণালী না জানে তাহারাএবিষয়ে কি বলে?

শিষ্য। তা তো এমন কাহাকেও জিজ্ঞাসা করি নাই। জিজ্ঞাসিলে, ঐরূপে সূর্য্যবিম্বের সংদর্শন হয় না, অথবা হইতে পারে না এইরূপই একটা কিছু বলিবে, না হয় ঐরূপ করিতে দেখিয়া কেহ বিদ্রূপ করিতেও পারে। ইহাই ত বিবেচনা হয়।

আচার্য্য। এই কথাগুলি স্মরণ রাখিয়া এখন আমার বক্তব্য শ্রবণ কর। জল ক্ষেত্রে যেমন সূর্য্যমণ্ডল দৃষ্টিগোচর হয়, ঠিক সেই রূপেই, প্রতিমূর্ত্তির মধ্যে মায়ের সন্দর্শন হয়। সাধক,মাকে দেখিবেন বলিয়া,প্রথমে পুত্তলের প্রতিই দৃষ্টিপাত করেন। পুত্তলের বিম্বই প্রথমে নয়ন গোলকে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু মায়ের রূপমাধুরী পিপাসু নয়ন তাহাতে তৃপ্ত হইবে কেন? সে সাতিশয় নৈপুণ্য সহকারে মায়ের রূপ দর্শনের নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে থাকে। তখন,সেই জলের কোলের কিরণের ন্যায়, ঐ প্রার্থিব রূপের কোলে-কোলে, আড়ালে-আড়ালে, মায়ের নিজতনুর রূপের ছটা আভাসিত হয়। মায়ের সেই হৃদয়ভরা, নয়নভরা রূপ আসিয়া প্রতিমার দেহটিকে অধিকৃত করে। তখন ঐ পুত্তলের কর্কশ রূপের সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুপম অলৌকিকরূপ লাবণ্যের সম্মূচ্ছনা হয়। ইহার অচেতনতার মধ্যে যেন সচেতনতার আভাস প্রস্ফুটিত হয়। অষ্টমী নিশার অন্ধকার ক্ষেত্রে, চন্দ্রোদয় প্রারম্ভে যেমন, আঁধারে-আলোকে, প্রসাদে-বিষাদে, মিশিয়া গিয়া একরূপ অপূর্ব্বরূপ আবির্ভূত হয়, মায়ের রূপ আর পুত্তলের রূপ মিলিয়াও ঠিক সেইমত এক অপূর্ব্ব দৃশ্য হইয়া উঠে।

সাধক তখন আনন্দে পুলকিত হয়েন। মায়ের অলৌকিক রূপের ঈষ-দাস্বাদ গ্রহণ করিতে পারিয়া আরও পিপাসু হয়েন। সুতরাং প্রবলতর ভক্তি, আগ্রহ সহকারে, মাকে দেখিবার নিমিত্ত আরও প্রচুরতর অভি-নিবেশ করেন। তখন সেই জলান্তরালে সকিরণ সূর্য্যবিম্বের ন্যায়, নিজরূপ লাবণ্যের সহিত মায়ের অধিকতর প্রকাশ হইতে থাকে। তখন দৃষ্টি সেই পুত্তলের প্রতি সমাবদ্ধা হইলেও পুত্তল যেন দেখিয়াও দেখিতে পাওয়া যায় না। তখন উহার কঠিনতা ঘুচিয়া গিয়া যেন কোমলতা হয়,অচেতনতা নষ্টা হইয়া যেন চেতনতা হয়। তখন পুত্তলের ভাব, পুত্তলের রূপ অদৃশ্য প্রায় হইয়া পড়ে। উহার নিষ্ক্রিয়তা ঘুচিয়া যেন সক্রিয়তার আবির্ভাব হয়। উহার তৃণ,মৃত্তিকা,দার্ব্বাদি উপাদানাবলী দূরিত প্রায়া হয়। তখন প্রতিমার আকার প্রকার প্রায় অন্তর্হিত হইয়া যেন মায়ের আকারই প্রকাশিত হয়।

সাধক তখন আরও উৎফুল্লতাও পরমানন্দে বিহ্বল হইয়া পড়েন। তখন ভক্তিভরে, বিবেক ভরে, মায়ের প্রতি মন ঢালিয়া দেন, নয়ন এড়িয়াদেন। তখনও কিন্তু অন্য লোকের দর্শনে, তাঁহার দৃষ্টি সেই পুত্তলের প্রতিই নিহিতা বলিয়া বিবেচিত হইবে, অথচ বাস্তবিক তাহা নহে। তিনি তখন আর পুত্তলের কিছুই দেখিতেছেন না। তখন সেই জলের মধ্যে সূর্য্যবিম্বের ন্যায় সুপরি স্ফুট মায়ের আকৃতি মাত্রই সাক্ষাৎ করিতে পান। তখন আর কিছুই নাই। তখন তৃণ নাই, পাষাণ নাই, কাষ্ঠও নাই। তখন আর সেই নীলও নাই, খড়ি নাই, অচেতনও নাই, কঠিনতা ও নাই। তখন পুত্তলের কিছুই দৃষ্ট হয় না। তখন কেবলই সেই আনন্দময়ী মা, কেবলই সেই নয়ন ভরা হৃদয় পোরা মা, কেবলই সেই স্নেহময়ী, দয়াময়ী, সুধাময়ী মা। তখন মায়ের সমস্ত গুণ, সমস্ত শক্তি, সমস্ত প্রভাব, এবং সমস্ত মহিমাদি সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইবে। সেই কাচোপাহৃত সূর্য্য কিরণের ন্যায়, প্রতিমার এক এক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে, মায়ের এক এক গুণ, এক এক ভাব, এক এক শক্তি দৃষ্টিগোচর হইবে। তখনই ভক্তের মাতৃদর্শন হইল, মনের আশা মিটিল। তখন তিনি আনন্দ সাগরে ভাসিতে-ভাসিতে, প্রেমের তরঙ্গে ডুবিতে-ডুবিতে, শান্তির অতলজলে মগ্ন হইয়া যান। তখন আর চঞ্চলতাও থাকেনা, ব্যাকুলতাও

থাকে মা। তখন তিনি, আনন্দময়ী, ত্রিতাপহারিণী, দীন তারিণী দীনের মণি মাকে, ব্রহ্মা বিষ্ণুর গর্ভধারিণী মাকে, ত্রিজগতের প্রসবিনী অবতারিণী মাকে, ব্রহ্মাণ্ডের রাজরাজেশ্বরী মাকে সম্মুখে পাইয়া মনের কথা বলিতে থাকেন। সাষ্টাঙ্গে ভূমি লুণ্ঠিত হইয়া হৃদয়ের উচ্ছ্বাস নিবেদন করিতে থাকেন। তখন গদগদকণ্ঠে তিনি এই বলিয়া উঠেন "ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবিতং মম। অগতাসি যতোদূর্গে! মাহেশ্বরি! মদাশ্রমং॥" মাগো! ওমা! তুই কি এই হতভাগ্যের আশ্রমেও এলি! এই জঘন্য নরক কীটের অতিতুচ্ছ অতি ঘৃণিত কুটীরালয়েও এলি! মা! তুই তো ব্রহ্ম বিষ্ণ্বাদির ঈশ্বর মহেশ্বরের মনোরমা মাহেশ্বরী! মা! তুই না সেই যোগি-ঋষিগণের কঠোর তপস্যা এবং তত্ত্বজ্ঞানের দুর্গম্যা "দুর্গা!" তবে যে এই দুর্ভাগ্যের নিকট এলি! মাগো! তুই তো কাঙ্গালের ধন, কাঙ্গালের প্রাণ, কাঙ্গালের জীবন! মা! আজ আমি ত্রিভুবনের সমারাধ্য ধন পাইয়া "ধন্য" হইলাম, সমস্ত প্রার্থনা, সমস্ত কামনা, সমস্ত বাসনা, এবং সমস্ত ক্রিয়ানুষ্ঠানের কেন্দ্রস্বরূপা তোকে পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। আজ সমস্ত চিত্ত-প্রবাহের বারিধিস্বরূপা; জৈবনিক স্রোতের সমুদ্র স্বরূপা তোকে পাইয়া আমার জীবন সফল হইল। জীবন স্রোত যাহার নিমিত্ত এতদিন বহিয়াছিল তাহা পাইল, প্রবাহের বল মিলিল, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল!" ইত্যাদি নানাবিধ আনন্দাবেদন করিয়া মনের সাধে সেই পূর্ব্বমতে মায়ের শুশ্রূষা করিতে থাকেন। তখন মাকে যে যে উপহার দেওয়ার আছে তৎসমস্ত এই প্রতিমার সঙ্গেই সমর্পণ করেন। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টিতে প্রতিমার অঙ্গ নহে, দৃষ্টি গোচর তাহার মায়ের অঙ্গ, সুতরাং তিনি প্রতিমার কোনই ধার ধারেন না। তৎপর নিজের সুখ দুঃখের কথা-বার্ত্তা বলিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন। পরে একটি পুষ্পের দ্বারা মাকে এই পুত্তল হইতে উঠাইয়া নীয়া নিশ্বাসের দ্বারা সহস্রারে প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই তোমার তৃতীয় প্রশ্নের মীমাংসা। কেমন এখন সন্তুষ্ট হইলে তো?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, আমি চরিতার্থ হইয়াছি, আপনার কৃপায় আমার জীবন ধন্য হইয়াছে।

সুখ ও দুঃখ।

১। প্রাণীমাত্রেই সুখ লাভ ও দুঃখ নাশের আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা করিয়া থাকে। বুদ্ধিজীবী প্রাণী অর্থাৎ মনুষ্য, পশু পক্ষী প্রভৃতির কথাই নাই, এমন কি বৃক্ষ লতাদিতেও পূর্ব্বোক্ত আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টার ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৃক্ষ হইতে চার পাঁচ হাত ব্যবধানে একটী লতা রোপণ করুন, দেখিবেন, লতা বৃক্ষটীকে বেষ্টন করিবার অভিপ্রায়ে নিজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা ও প্রশাখাগুলি ঐ বৃক্ষের দিকে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। তড়াগ পার্শ্বস্থ বৃক্ষ তড়াগাভিমুখে নিজ নিজ মূলগুলিকে পরিচালিত করিয়া থাকে। ফলতঃ সুখলাভ ও দুঃখনাশ জীবন রক্ষার মুখ্য ও প্রকৃষ্ট উপায়। সুখের সময় অর্থাৎ হর্ষকালে শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রফুল্লিত ও মানসিক প্রবৃত্তি বিকশিত হয় এবং দুঃখের সময় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঙ্কুচিত ও মানসিক প্রবৃত্তি সমস্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে, ইহার দ্বারাই স্পষ্টই বুঝা যায় যে সুখ আমাদের জীবন রক্ষার সহায় এবং দুঃখ আমাদের জীবন ধারণের অন্তরায়। এই জন্য বিশ্ব বিধাতা সৃষ্টি রক্ষার উদ্দেশ্যে সুখ লাভ ও দুঃখ নাশের আকাঙ্ক্ষাকে আমাদের নৈসর্গিক প্রবৃত্তি করিয়া দিয়াছেন। সুখায় দুঃখক্ষয়ায় সংকল্প ইহ কর্ম্মিণ। মনুষ্যের সকল উদ্দেশ্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সুখ লাভ ও দুঃখ নাশ। কেহই ধনের জন্য ধন কিম্বা যশের জন্য যশের আকাঙ্ক্ষা করেন না। ধন যশ ধর্ম্ম, যোগ, সন্ন্যাস সকলেরই চরম উদ্দেশ্য সুখ। সংস্কৃত দর্শনে অক্ষুণ্ণ সুখ, আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিকেই মনুষ্য জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া পরিকল্পিত করা হই-য়াছে। একজন ইংরাজি পণ্ডিত বলিয়াছেন, **without happyness wisdom is buta shaddow and virtue is but a name**; অর্থাৎ যে জ্ঞানে বা যে ধর্ম্মে সুখ উৎপন্ন না হয় সে জ্ঞান ও সে ধর্ম্ম ছায়ার ন্যায় অসার ও অলীক।

২। কোন ব্যক্তি সুখী কি না এ প্রশ্নের উত্তর কেবল তিনিই দিতে সমর্থ। সম্পদ, সৌন্দর্য্য, বল প্রতিভা প্রভৃতির চিহ্ন বাহ্যে প্রকটিত হয়। কিন্তু সুখের উপলব্ধি স্থান হৃদয়ের অভ্যন্তর মাত্র। আমি লক্ষপতি, দাস-

দাসী পুত্র পরিজন রাজ্য ঐশ্বর্য্য প্রভৃতিতে আমি পরিবৃত, কিন্তু আমি সুখী কিনা ইহার প্রকৃত উত্তর আমিই দিতে পারি। আমি যদি বলি আমি সুখী তবেই আমি সুখী নতুবা নয়। No man is happy until he thinks himself so. এখন যদি ব্যক্তি মাত্রকেই জিজ্ঞাসা করা যায় যে তাঁহারা সুখী কিনা? তাহা হইলে সকলেই নিঃসঙ্কোচে বলিবেন যে তাঁহারা সুখী নহেন। রাজা, প্রজা, পণ্ডিত মূর্খ, সংসারী, বিরাগী সকলেই এক বাক্যে বলিবেন যে তাঁহারা সুখী নহেন। কেহই স্বীকার করেন না যে তাঁহারা কুৎসিৎ মূর্খ অথবা নির্ব্বোধ কিন্তু সকলেই নিজ দুঃখ বাহুল্য প্রচারে শত মুখ, অতএব ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে যে মনুষ্যমাত্রেই সুখলাভে বঞ্চিত। জগৎ ঘোর দুঃখ তমসাচ্ছন্ন। সকলেরই মনে প্রতি মুহূর্ত্তেই আর্ত্তনাদ ও হাহাকার প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

কিন্তু ইহার কারণ কি? সকলেই সুখাকাঙ্ক্ষা ও সুখ চেষ্টা করে। অথচ কেহই সুখী নহে। পৃথিবীতে কি তবে সুখ নাই? সুখ কি শশবিষাণ ও আকাশ কুসুমের ন্যায় অলীক? না তাহা নহে। এ জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা সুখময় এবং সৃষ্টিও সুখময়, কিন্তু আমরা অজ্ঞানে বিমোহিত হইয়া প্রকৃত সুখকে দূরীভূত করিয়া দুঃখকে আলিঙ্গন করি, পুষ্পমালা ভ্রমে বিষধর সর্পকে কণ্ঠদেশে আশ্রয় প্রদান করি এবং পরে যখন বিষয়ের জ্বালায় জর্জ্জরীভূত হই তখন বলি এ পৃথিবীতে সুখ নাই, সমস্তই দুঃখ। যদি সুখ দুঃখের প্রকৃত লক্ষণ অবগত হওয়া যায়, সুখ লাভ ও দুঃখ নাশের প্রকৃত উপায় অবলম্বন করা যায় তাহা হইলে আমরা সুখাস্বাদে যে অধিকারী হইতে পারি ইহা প্রদর্শন করাই আমার অদ্যকার বক্তব্য বিষয়ের উদ্দেশ্য। সুখ কি? সুখের কয়েকটি দৃষ্টান্ত আলোচনা করিলে সুখের লক্ষণ অবধারণ করা যাইবে।

১। শিশু যখন মাতৃ স্তন পান করে তখন তাহার সুখ পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয় তৎকালে তাহার অন্য কোন বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি আকাঙ্ক্ষা বা অনুরাগ থাকে না, তাহার প্রসন্ন বদন তাহার শিশুর স্বভাব সুলভ চাঞ্চল্যের অভাব, তাহার ক্রীড়ার বস্তুর প্রতি উপেক্ষা, প্রভৃতি তাহার সুখের পরিচয় প্রদান করে।

২। এইরূপে প্রণয়ী যুগলের পরস্পর সন্দর্শন বা মিলনে সুখের সমস্ত লক্ষণ প্রকটিত হয়।

৩। এইরূপে কবি যখন স্বভাবের সৌন্দর্য্য অবলোকন করেন তখন তাঁহার শরীরে আকৃতিপ্রকৃতিতে সুখের সমস্ত চিহ্নইউপলক্ষিত হয়। সঙ্গীত প্রিয় সঙ্গীত রসাস্বাদ যোগীর আত্মদর্শন প্রভৃতিতেও বিমল ও পূর্ণানন্দের লক্ষণ পাওয়া যায়। এই সমস্ত সুখের অবস্থা হইতে আমরা সুখের কয়েকটি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে পারি।

যথা,—তন্ময়ত্ব, অন্য আকাঙ্ক্ষা রাহিত্ব, অচাঞ্চল্য এবং আত্ম-প্রসাদ। যে অবস্থায় মনের এই সমস্ত ভাব সম্পূর্ণ ও চিরস্থায়ী হয় তাহাই পূর্ণ সুখ। অন্য সকল অবস্থা দুঃখের অবস্থা। শান্তি ও আত্মপ্রসাদ সুখের প্রধান ব্যঞ্জক, চাঞ্চল্য ও আত্মগ্লানি দুঃখের অনুচর।

অবস্থা ও প্রকৃতি ভেদে সুখের নানা প্রকার তারতম্য হইয়া থাকে। শিশুর সুখ, যুবার সুখ, বৃদ্ধের সুখ, বৃক্ষ লতাদির সুখ, বুদ্ধিজীবির সুখ, মনুষ্যদিগের সুখ, অসভ্যের সুখ, অর্দ্ধ সভ্যের সুখ, সুসভ্যের সুখ প্রভৃতি কোটী কোটী প্রকার সুখের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু এই সমস্ত সুখকে স্থূলতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে যথা ; উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও অধম।

যে সমস্ত সুখ তৈল ধারার ন্যায় চিরকালই অথবা দীর্ঘকালই আত্ম-প্রসাদময় ও চাঞ্চল্য রহিত তাহাই উৎকৃষ্ট সুখ। ধূমাচ্ছন্ন অগ্নিশিখার ন্যায় যাহা কখনও চাঞ্চল্যময় ও কখনও প্রসাদ ময় তাহা মধ্যম সুখ। এবং যাহা সর্ব্বদাই অথবা দীর্ঘকালই চাঞ্চল্য পরিপূর্ণ তাহা অধম অথবা নিকৃষ্ট সুখ। আত্মধ্যান পরায়ণ যোগীর যে সুখ তাহা উৎকৃষ্ট সুখের মধ্যে গণ্য, কেন না তাহা সর্ব্বদাই নির্ব্বাত ও নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় স্থির, নির্ম্মল ও অচঞ্চল। বণিকের সুখ মধ্যম সুখ, কেন না উহাতে অধিকাংশ সময়ই দুশ্চিন্তা মনস্তাপ অধৈর্য্য প্রভৃতি অশান্তির কারণ বিদ্যমান থাকে। অলসের সুখ নিকৃষ্ট সুখ কেন না যদিও অলসব্যক্তি শরীর সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট কিন্তু তাহার মন সর্ব্বদাই চিন্তাজ্বরে ক্লিষ্ট ও জর্জ্জরিত থাকে। গীতাতেও এই তিন প্রকার সুখের কথা উল্লিখিত আছে। যথা

অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি।
(১) যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমং।
তৎসুখং সাত্বিকং প্রোক্তং আত্মবুদ্ধি প্রসাদজং॥

অর্থাৎ যাহা প্রথমে বিষের ন্যায় ও পরে অমৃতের ন্যায় প্রতীয়মান হয়,যাহা অভ্যাসের বলে ক্রমে ক্রমে আমাদের মনোরম হয়, এবং যাহাতে চিত্তের নির্ম্মলতা প্রবলরূপে উপলব্ধ হয়, তাহাই সাত্বিক সুখ।

(২) বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগাৎ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমং।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতং॥

অর্থাৎ যাহাতে বিষয় সুখ ভোগ হয়, এবং যাহা প্রথমে অমৃতের ন্যায় হইলেও পরিণামে কেবল দুঃখের কারণ হয় তাহাকে রাজস সুখ বলে।

(৩) যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্য প্রমাদোত্থং তত্তামস মুদাহৃতং॥

অর্থাৎ যাহা আদ্যন্ত মোহময় অর্থাৎ যাহাতে কিছুমাত্র সুখ না থাকিলেও কেবল সুখের ভাণমাত্র থাকে এবং যাহা নিদ্রা, আলস্য ও অনবধানতা প্রভৃতি হইতে উদ্ভূত হয়,তাহাকে তামস সুখ বলে। দুঃখের অবস্থা হইতেও এই তত্ত্বেই উপনীত হওয়া যায়। দুঃখ তিন প্রকার যথা আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক। আধিভৌতিক দুঃখের অর্থ এই যে আমাদের শরীরে বাত,পিত্ত কফনামক যে তিনপদার্থ আছে তাহাদের বৈষম্য অবস্থা অর্থাৎ যতক্ষণ এই তিন পদার্থের সাম্য অবস্থা থাকে; ততক্ষণ শরীরে স্থৈর্য্য ও অচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয় এবং ততক্ষণ আমরা শারীরিক সুখভোগ করি। কিন্তু কোন কারণে ইহাদের একটি প্রাবল্য হইলে বৈষম্য অবস্থা উপস্থিত হয় এবং তজ্জন্য শারীরিক চাঞ্চল্য ও দুঃখ অনুভূত হইতে থাকে। আধ্যাত্মিক অবস্থাতে ও মানসিক প্রবৃত্তি সমস্তের মধ্যে বৈষম্য উপস্থিত হয়। এবং তজ্জন্য চিত্ত চাঞ্চল্য ও দুঃখ অনুভূত হইতে থাকে এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইব যে শান্তি ও চিত্তপ্রসাদ সুখের সহচর এবং চাঞ্চল্য ও তজ্জনিত আত্মগ্লানি দুঃখের পরিচায়ক। ধন, যশ, ও ইন্দ্রিয়সুখ আদ্যন্ত চাঞ্চল্য পরিপূর্ণ, সুতরাং উঁহাতে সুখ অপেক্ষা দুঃখের অংশ অনেক পরিমাণে

অধিক। পরোপকার ও ব্রহ্মানন্দ, চিত্ত প্রসাদ ও শান্তির আদর্শ সুতরাং ইহাতে দুঃখ অপেক্ষা সুখের অংশ অনেক পরিমাণে প্রবল। অতএব যাহারা প্রকৃত সুখের আকাঙ্খা করেন তাঁহাদের উচিত যে পরোপকার ও ব্রহ্মানন্দে চিত্ত নিয়োজিত করেন।

মনুষ্য সাত্বিক, রাজসিক, ও তামসিক এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। স্বাভাবিক নিয়ম বলে তামসিক ব্যক্তি তামসিক সুখের, রাজসিক রাজসিক সুখের ও সাত্বিক সাত্বিক সুখের প্রতি আকৃষ্ট হন। যাঁহারা সমাজের শাসন কর্ত্তা তাঁহাদের উচিত যে এই তিন প্রকার লোককে স্ব স্ব প্রকৃতি অনুযায়ী সুখে অভ্যস্ত করা এবং উত্তরোত্তর তাঁহাদিগকে উৎকৃষ্টতর সুখের উপযোগী করুন। সদ্‌গুরু প্রথমে শিষ্যের চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া তাহাকে প্রথমতঃ তদনুযায়ী সুখ প্রদান করেন এবং পরে যাহাতে তিনি উৎকৃষ্টতর সুখে উন্নীত হইতে পারেন তদ্বিষয়ে যত্ন করিবেন। শিষ্য যৎকালে গুরু গৃহে বাস করেন তৎকালে তাঁহার এই সুখের সোপানবলি প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সদগুরুও নাই এবং গুরুগৃহও নাই। শিষ্যেরা স্বেচ্ছাচারী হইয়া ক্ষণিক আন্দোলনের পরতন্ত্র হওত নিজ নিজ বাসনা অনুসারে সুখ নির্ব্বাচন করিয়া থাকে অর্থাৎ তামসিক ব্যক্তি রাজসিক,রাজসিক তামসিক ও সাত্বিক সুখের অন্বেষণ করেন এবং সাত্বিক, রাজস্বিক ও তামসিক সুখ লাভেরই চেষ্টা করেন, কর্ণাধারাভাবে তরণী যেমন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয় বর্ত্তমান সময়েও আমাদের কর্ত্তব্যের ও সুখের বিপর্য্যয় সংঘটিত হইতেছে। যদি কখন পুর্ব্বের ন্যায় গুরু করণের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় এবং যদি কখন শিষ্যেরা অভিমান পরিত্যাগ করিয়া গুরুপদেশ অনুসারে স্ব স্ব জীবন নিয়মিত করিতে শিক্ষা করেন তবেই এই বিপর্য্যয় প্রশমিত হইবে, নতুবা এক্ষণে যেমন হইতেছে যে বালক বৃদ্ধের ও বৃদ্ধ বালকের সুখাকাঙ্খা করিয়া কেবল আপন আপন দুঃখের পথ প্রসারিত করিবেন মাত্র।

সমালোচনা।

চণ্ডী। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবী মাহাত্ম্য। শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত প্রণীত। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র। পদ্যে রচিত। উত্তম কাগজে সুন্দর ছাপা,—বাঁধাইও মন্দ নহে। রাজকৃষ্ণ বাবু ধনীর পুত্র। ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিত পালিত। কলিকাতা হাটখোলার আদি নিবাসী প্রসিদ্ধ দত্ত বংশে তাঁহার জন্ম। এহেন অবস্থায় পড়িয়াও রাজকৃষ্ণ বাবু সুকবি—ভক্ত। এরূপ ভাগ্যলাভ কেবল পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি ফলে ঘটে। দেবী মাহাত্ম্য কীর্ত্তণে যাঁহার হৃদয় নাচিয়া উঠে, তাঁহার ভাগ্যের অবধি নাই। আমরা তাঁহার দেবী মাহাত্ম্য বর্ণন পাঠে অনেক স্থানে সে উন্মত্ততার লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছি। ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল। এ পুস্তক খানি হিন্দু বালক বালিকার পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত।

আদর্শ। ঢাকা—সামন্তক যন্ত্রে মুদ্রিত। আমরা পুস্তক খানি পাঠ করিয়া তত সুখী হইতে পারিলাম না। তবে লেখকের উদ্দেশ্য যে সাধু তাহা বলিতে আমরা বাধ্য। বিষয়টী সুন্দর হইলেও রচনা কৌশলের অভাবে ফুটিতে পারে নাই। গ্রন্থকার বালক বলিয়া আমাদের প্রতীয়মান হইল। সুতরাং বয়োবৃদ্ধির সহিত চেষ্টা করিলে সুলেখকও হইতে পারেন।

আঁখি জল। ভগ্নতরী লেখনী প্রসূত। মূল্য ছয় আনা। ভগ্নতরী ও আঁখি জল উভয় পুস্তকই যথাসময়ে আমরা পাইয়াছি এবং দুই খানিই সাগ্রহে পাঠ করিয়াছি। পাঠ করিবার সময় তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। আর আমাদের আশা হইয়াছে লেখক কালে চেষ্টায় সুকবি হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়ে সকলেই কবি হইবার প্রয়াসী। কল্পনা করিয়া শেষ অক্ষরে কোন প্রকারে মিল রাখিয়া দুই ছত্র লিখিলেই লেখক নিজেও উদ্ধার হন এবং পাঠক কুলও উদ্ধার করেন। আজ কাল এইরূপ কবিরই ছড়াছড়ী। ভাবময়ী প্রকৃতির ভাব সমুদ্রে না ডুবিতে জানিলে কবিত্ব রসের আস্বাদ প্রত্যাশা করা দুরাশা ও ধৃষ্টতা মাত্র। আগে নিজে ডুবিতে শিখ তবে পরকে ডুবাইতে চেষ্টা করিও। কিন্তু সে দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। আমরা আঁখিজল লেখককে অনুরোধ করি যেন তিনি কেবল কবিতার খাতিরে প্রকৃত কবির লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হন।

আমাদের জাতীয় ভাব। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। আলবার্ট হলে পঠিত। রজনীবাবু প্রসিদ্ধ লেখক। সুতরাং তাঁহার রচনার নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া বা সুখ্যাতি করা নিস্প্রয়োজন। আর যখন আমাদের দ্বারা উৎসাহিত হইয়াই তিনি এই সুন্দর প্রবন্ধটী রচনা করিয়া আলবার্ট হলে পাঠ করিয়াছেন তখন এ পুস্তক সম্বন্ধে নূতন করিয়া ভাল মন্দ বিচার করা অনাবশ্যক। আমাদের অনুরোধ পাশ্চত্য ভাবে বিভোর ও শিক্ষিতাভিমানীগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক পুস্তকখানি একবার যেন পাঠ করেন।

The Scoble Act Tragedy—বেদব্যাসে প্রকাশিত সম্মতি আইনের ভাবিফল প্রবন্ধের ইংরাজি অনুবাদ। অনুবাদক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র, বিএ। যখন বেদব্যাসে উক্ত প্রবন্ধটী প্রকাশিত হয় তখন আমরা একবারও ভাবি নাই যে সাধারণে উক্ত প্রবন্ধ এতদূর সমাদরের সহিত পাঠ করিবেন। যাহা হউক আমরা ধন্য।

স্বামী ভক্তি। ভবকিঙ্করী মায়িজীর উপদেশ। মূল্য এক আনা। ভবকিঙ্করী মায়িজী সতী। সুতরাং তাঁহার স্বামী ভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ যে মধুর ও হিন্দু স্ত্রীর অনুকরণীয় হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

সাজি ও ভাবের কথা। শ্রীমান ভবকিঙ্কর বাবাজী ও ভবকিঙ্করী মায়িজীর রচিত। বিনা মূল্যে বিতরিত। ইহাতে অনেক সুন্দর সুন্দর ভাবের কথা আছে। পাঠে ভক্তের প্রাণে আনন্দের উচ্ছ্বাস হয়। আমরাও অনেক আনন্দ পাইয়াছি।

গোপালপুর হরিসভার কার্য্য বিবরণ। গোপালপুর সভার কার্য্য বিবরণ পাঠে অনেক হরিসভার জ্ঞান লাভ ও উৎসাহ বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব।

হিন্দু সৎকর্ম্ম মালা। পঞ্চম ভাগ। বরাহ নগর পোষ্ট, পালপাড়া চতুষ্পাঠী হইতে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ স্মৃতিরত্ন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত মথুরা নাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি অধ্যাপকগণ দ্বারা সংশোধিত। ইহাতে বিবাহ সম্বন্ধীয় শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা, মন্ত্রানুবাদ সহ সম্প্রদান বিধি, দ্রব্যশুদ্ধি, দানবিধি, রাস দোল, ও সূর্য্য কবচাদি আছে

ইহার স্থানে স্থানে নানাবিধ সামাজিক কথার ও প্রযুক্তি-যুক্ত আলোচনা করা হইয়াছে। ইহার ১ম ভাগে স্নান, তর্পণ ত্রিবেদী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যা পূজাদি আছে। ২য় ভাগে, সানুবাদ স্তব, শতনাম, শিবরাত্রি জন্মাষ্টমী ও স্বস্ত্যয়নাদি আছে। ৩য় ভাগে ব্যবস্থা ও মন্ত্রানুবাদ সহ সাম ও যজুর্বেদী শ্রাদ্ধ কাণ্ড ও ব্রত প্রতিষ্ঠাদির কর্ম্মাদি এবং ৪র্থ ভাগে, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া দশপিণ্ড দান ও অশৌচের ব্যবস্থা প্রভৃতি লেখা আছে।

আত্মীয়তা।

বনের পশু ধরিয়া আনিয়া যদি কিছুকাল তাহার সহবাস করা যায় তাহা হইলে তাহারও সহিত কতকটা আত্মীয়তা বৃদ্ধি হয়। শত্রুও বহুদিনের সংশ্রবে মিত্র হইয়া পড়ে। এই সব দেখিয়া এক ব্যক্তি অনেক আশায় অন্যের সঙ্গ করিয়া থাকে। আশা আত্মীয়তা বৃদ্ধি হইবে, আত্মীয়তা বৃদ্ধি পাইলে অবশ্যই পরস্পরে সহানুভূতিরও বৃদ্ধি পাইবে। ইহাই ঈশ্বরের নিয়ম। সুতরাং আমরাও সেই আশায় সর্ব্বদা আশান্বিত। ৫।৬ বৎসর ধরিয়া বেদব্যাসের গ্রাহকগণের সহিত আমাদের সম্বন্ধ। আমরা যথা সাধ্য তাঁহাদের সেবা করিয়া আসিতেছি। আশা তাঁহাদের কৃপায় বল পাইয়া আমরা সোৎসাহে তাঁহাদেরই সেবা করিব। কিন্তু দুঃখ আমাদের যে অদৃষ্ট দোষে অধিকাংশ গ্রাহকগণ ঈশ্বরের সে সুন্দর নিয়ম পালনে প্রবৃত্ত নহেন। এতদিনের সহবাসে যদি আমাদের প্রতি তাঁহাদের কোনরূপ মমতা জন্মিত তবে এতদিন বেদব্যাসের দশ সহস্র গ্রাহক বৃদ্ধি হইত। আর প্রাপ্য টাকা না চাহিতেই পাইতাম। অধিক আর কি বলিব? গ্রাহকগণ! একবার আমাদের অনুযোগ শুনুন। নিজ কর্ত্তব্য পালন করুন। সত্বর বেদব্যাসের দক্ষিণা পাঠাইয়া দিউন। কিমধিকমিতি।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

বেদব্যাস।

১২৯৮ সাল। ষষ্ঠ বর্ষ। আষাঢ়।

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

লেখকগণ।

Printed by Udoya Churan Pal, At the New Balmick Press,
159, Manicktolla Street, Calcutta.

ষষ্ঠ বর্ষ।

ষষ্ঠ ভাগ। আষাঢ় সন ১২৯৮ সাল। ৩য় খণ্ড।

দেবি! প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতে, র্নিত্যং যথা সুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানিসর্ব্বজগতাঞ্চশমং নয়াশু, উৎপাত পাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্॥

স্ত্রী-শিক্ষা।

বন্ধ্যা—(STERILITY.)

বন্ধ্যা হওয়ার কারণ—যে সকল কারণে সচরাচর শরীর দুর্ব্বল হয় তাহাতে বন্ধ্যা হইতে পারে। এভিন্ন মেদাধিক্য জন্য কোন পুরাতন ব্যাধি থাকিলে, অনভ্যস্ত কার্য্যাদিতে রত থাকায়, কোন বিশেষ কার্য্যে সর্ব্বদা মন সংযোগ অথবা অত্যাধিক মস্তিষ্ক পরিচালন করাতে মস্তিষ্কের অন্যান্য স্নায়ুর শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। সর্ব্বদা সুখে সচ্ছন্দতায় থাকা, সুখাভিলাষ, অত্যাধিক আহার ও সর্ব্বদা আহারের ইচ্ছা, মদ্যপান ইত্যাদি বন্ধ্যা

হওয়ার কারণ মধ্যে গণ্য। মিঃ সেড্‌লার বলেন উচ্চশ্রেণীর বিলাসিনীদিগের সন্তান উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হয়, দরিদ্রশ্রেণীস্থ স্ত্রীলোকদের উৎপাদিকা শক্তি অধিক।

মস্তিষ্ক পরিচালনায় কিরূপে বন্ধ্যা হয়, ডাঃ বড্‌ক সবিস্তার তাহা লিখিয়াছেন। আমরা তাঁহার মত উদ্ধৃত করিলাম। যাঁহারা ইংরাজী জানেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক মনযোগের সহিত পাঠ করিয়া দেখিবেন। *

---

* Sterility——Constitutional causes—"The constitutional causes include in which the general physical powers are exhausted; as the consequence of acute or chronic disease, obesity, unaccustomed exertion, *too close application to business or excessive exertion of the Brain*, thus absorbing an undue amount of nervous power which otherwise would be more equally deffused for the efficient discharge of the general functions of the Body. In this way the generative system may be empaired by the divergence of the nervous influence which its healthy fanctions demand."

"Indolent and luxurious habits, excessive iudulgence in the pleasures of the table, and especially the free use of wine are frequent causes of Sterility. The indnstrious and frugal portions of the community are, it is well known, for more prolific than the higher ranks of society. In his work on the law of population, Mr. Sadler incontrovertibly proves that the fecundity of the human race is diminished by the indolent and laxurious mode of life prevalent among the rich". (See Lady's Manual by Dr. Raddock page 118.)

টেটেনি।

এই পীড়ায় পুষ্ট-মজ্জার ক্রিয়ার বিশেষ পরিবর্ত্তন হেতু ও স্থানিক উত্তেজনার জন্য হস্ত বা পদের পেশীতে স্থায়ী আক্ষেপ দেখা যায়, যাহা পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হয়।

বিখ্যাত ডাক্তার রবার্টস সাহেব বলেন "অনৈচ্ছুক অনুকরণ হেতু বালিকা বিদ্যালয়ে ইহা বিস্তৃতরূপে প্রকাশ পায়। *

এই প্রবন্ধের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে রমণী কখন পুরুষের সমান অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারেন না। কারণ তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র, তাঁহাদের শরীরের গঠন শক্তি প্রভৃতি প্রায় সমস্তই পুরুষ অপেক্ষা বিভিন্ন। এরূপ স্থলে তাঁহাদিগকে পুরুষের সমান ক্ষমতা প্রদান করিলেই সেই ক্ষমতার অপব্যবহার হইবে সন্দেহ নাই। ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যে সকল রমণী জ্ঞানে ও প্রতিভায় পুরুষকেও অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেরই জীবন চরিত পাঠ করিলে স্পষ্ট দেখা যায় যে, তাঁহারা যে মহৎ উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হইয়াছেন, তাহার সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি সুচারুরূপে পালন করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ভগবান যাহাকে যেরূপ শক্তি, স্বভাব ও প্রকৃতি দিয়াছেন, তাহার সেইরূপ ভাবেই সম্পাদন করা কর্ত্তব্য।

আমরা আর্য্যরমণীদিগকে পুরুষের ন্যায় উচ্চ শিক্ষা দিতে প্রস্তুত নহি। তবে আর্য্যরমণীগণ প্রাচীনকালে যে প্রণালীর শিক্ষা লাভ করিয়া জগতে সতীত্বের আদর্শ ও বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন, আমরা বর্ত্তমান সময়েও রমণীগণকে সেই প্রকার প্রণালীর শিক্ষা প্রদান করিতে দেশের সকলকেই অনুরোধ করিতেছি। অতএব প্রাচীনকালের আর্য্য রমণীগণের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

---

* "It may be also produced by involantary imitation having iu this way spread extensively in a girl's school. See Robert's Practice of medicine P. 879.)

প্রাচীনকালের আর্য্যরমণীদিগের সামাজিক অবস্থা।

প্রাচীনকালের আর্য্যরমণীদের সামাজিক অবস্থা অর্থাৎ তাঁহাদের স্বাধীনতা, কর্ত্তব্য কর্ম্ম, শিক্ষা ইত্যাদি সম্বন্ধে আর্য্যগণ যে সকল ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন তাহা হইতে কএকটী নিম্নে সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল। পাঠক মহোদয়ের সুবিধার জন্য আমরা নিম্ন লিখিত কএকটীভাগে আলোচনা করিব, যথাঃ—

১। স্বাধীনতা।

২। কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

৩। শিক্ষা।

৪। সাধ্বী স্ত্রীর ব্যবহার।

৫। সাধ্বী স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে আর্য্যদিগের মত।

৬। রমণীর প্রতি উপদেশ।

৭। পুরুষের প্রতি উপদেশ।

১। স্বাধীনতা।

রমণীদের স্বাধীনতা সম্বন্ধে ভগবান মনুর মত ইতি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ও ভগবান মনুর মতেই মত দিয়াছেন। বিষ্ণু বলেন—"পতি বিদেশে গমন করিলে স্ত্রী পরের নিকট গমনাগমন ও শরীর সুসজ্জিত করিবে না। গৃহের দ্বারদেশে বা গবাক্ষ ইত্যাদি স্থানে দণ্ডায়মান থাকা অকর্ত্তব্য। কোন কার্য্যই রমণী স্বাধীন ভাবে নির্ব্বাহ করিতে পারিবে না।"

নারদ বলিয়াছেন—"যদি পতিকুলে কেহ না থাকে তবে স্ত্রীর পিতৃ-কুলে বাস করা কর্ত্তব্য, তদাভাবে রাজার অধীনে আসিবে।" ব্যাসদেব বলেন—স্ত্রীজাতি কখনই উচ্চস্বরে বাক্যালাপ করিবে না। স্ত্রীর সমস্ত কার্য্যেই পতির সহিত সমাধা করিতে হইবে। পতি ভিন্ন যে কোন কার্য্য করিবে তাহা নিষ্ফল।" গৌতম বলিয়াছেনঃ—"ধর্ম্ম কার্য্যেও

স্ত্রীজাতি স্বাধীনা নহে"। বশিষ্ঠ দেবও এই কথাই বলিয়াছেন। সাংখ্য বলেন—"স্ত্রীর কোথাও যাওয়ায় আবশ্যক হইলে গৃহের অন্য কাহাকেও না বলিয়া যাইবে না, পরপুরুষের সহিত আলাপ করিবে না অনাবৃত গাত্রে থাকিবে না, দ্রুতপদে গমন করিবে না ইত্যাদি।"

২। কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

ভগবান মনু বলিয়াছেন—"স্ত্রীলোক সর্ব্বদা প্রসন্ন চিত্তে থাকিবেন এবং সুচারুরূপে গৃহ কর্ম্ম সম্পাদন, মনযোগের সহিত গৃহস্থিত দ্রব্যের তত্ত্বাবধান, পরিমিতরূপে ব্যয় করিবেন।" এই সম্বন্ধে সকলেরই প্রায় এক মত। বহ্নি পুরাণে স্ত্রীলোকের গৃহকর্ম্ম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যথাঃ—

"সা শুদ্ধা প্রাত-রুত্থায় নমস্কৃত্য পতিং স্বরং।
প্রাঙ্গনে মণ্ডনং দদ্যাৎ গোময়েন জলেনবা॥
গৃহকৃত্যং চ কৃত্বাচ স্নাত্বাগত্বা গৃহং সতী।
সুরং বিপ্রংপতিং নত্বা পূজয়েদ্গৃহ দেবতাং॥
গৃহকৃত্যং সুনির্ব্বর্ত্ত্য ভোজয়িত্বা পতিং সতী।
অতিথীন্ পূজয়িত্বাচ স্বয়ং ভুঙ ক্তে সুখং সতী॥

ইহার ভবার্থ, রমণী শুদ্ধা হইয়া প্রাতে শয্যা হইতে পতিকে প্রণাম করিয়া উঠিবেন, তৎপরে জল ও গোময় দ্বারা প্রাঙ্গনে মণ্ডন করিবেন, গৃহ কার্য্য সমাধা করিয়া স্নান করিবেন, পরে দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পতিকে প্রণাম করিয়া গৃহ দেবতার পূজা করিবেন, তৎপরে রন্ধন ইত্যাদি গৃহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া স্বামীকে ভোজন করাইবেন, এবং অতিথিকে যত্নের সহিত আহার করাইয়া তৎপরে নিজে ভোজন করিবেন।

এ সমস্ত কার্য্য ভিন্ন রমণীদের আরও অনেক কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল। রমণীরা সর্ব্ব বিষয়ে পাপশূন্যা হইবেন, পিতা মাতা শ্বশুর শাশুড়ী ইত্যাদি গুরুজনের সেবা, দেবাদির প্রতিপালন, দেবতা, দ্বিজ অতিথি, ভৃত্য এমন কি গৃহ পালিত বিড়াল কুকুরটীর পর্য্যন্ত রিতিমত তত্ত্বাবধান করিবেন। প্রাচীনা রমণীদের প্রধান শিক্ষনীয় ও কর্ত্তব্য বিষয় ছিল

পতি সেবা, দ্বিতীয়তঃ গৃহ কার্য্য, সন্তান পালন ইত্যাদি। এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু নীলকণ্ঠ মজুমদার মহোদয় বিষ্ণু পুরাণ হইতে সুন্দর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা সংগ্রহ করিয়াছেন। * যথাঃ—

"অথ স্ত্রীণাং ধর্ম্মাঃ—

ক। ভর্ত্তুঃসমানব্রতচারিত্বং—স্বামী যে ব্রত বা নিয়ম, অবলম্বন করিবেন স্ত্রীও তাহাই করিবেন। এইরূপ কার্য্য করিলে পতিপত্নী ধর্ম্ম শৃঙ্খলে সংবদ্ধ হইবেন। পাঠক এই স্থলে রঘুবংশের দিলীপ ও সুদক্ষিণার কথা স্মরণ করিবেন।

খ। শ্বশ্রু শ্বশুর গুরু দেবতাতিথি পূজনঃ।—অর্থাৎ গুরুজনের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়াও দেবদ্বিজে ভক্তি করা।

গ। সুসংস্কৃতোপস্করতা।—পবিত্র উপকরণ সংগ্রহ করিয়া স্বামীর ও পরিবারের পূজার আয়োজন বা সাহায্য করিবেন।

ঘ। অমুক্তহস্ততা।—সাবধান হইয়া ব্যয়াদি করিবেন।

চ। সুগুপ্তভাণ্ডতা।—ধন সম্পৎ অতি গোপনে রক্ষা করিবেন।

ছ। মূল ক্রিয়াস্বমভিরতিঃ।—অর্থাৎ স্বামীকে বশ করিবার জন্য কদাপি কোন প্রকার যাদু মন্ত্র বা ঔষধ (মূলাদি) ব্যবহার করিবে না।

জ। মঙ্গলাচার তৎপরতা।—সর্ব্ব প্রকার মাঙ্গলিক আচারে যত্নবান হইবেন। অর্থাৎ সর্ব্বদা পরিবারের মঙ্গল চিন্তায় কালযাপন করিবেন এবং মঙ্গলোদ্দেশ্যে নানাবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন।

ঝ। ভর্ত্তরিপ্রবাসিতেহপ্রতিকর্ম্ম ক্রিয়া।—ভর্ত্তা প্রবাসে গমন করিলে নিজ শরীর শোভা বৃদ্ধি বিষয়ে উদাসীন হইবেন।

ট। পরগৃহেস্বনভিগমনং
ঠ। দ্বারদেশ গবাক্ষকেস্বনবস্থানং
} সাধ্বী স্ত্রীর পক্ষেবাড়ী বাড়ী ভ্রমণ করা অথবা দ্বার দেশে গবাক্ষ প্রভৃতি স্থানে দণ্ডায়মান নিষেধ।

ড। সর্ব্ব কর্ম্ম অস্বতন্ত্রতা।—বাল্যে পিতার যৌবনে পতির ও বার্দ্ধক্যে পুত্রের বশবর্ত্তিনী থাকা উচিত।

* (বেদব্যাস, বৈশাখ ১২৯৬)

ট। মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা।—স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর হয় ব্রহ্মচর্য্য নয় সহগমন করা উচিত।

ণ। নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক যজ্ঞো ন ব্রতো নাপ্যুপোষিতং পতিং শুশ্রূষতে যস্তু তেন স্বর্গে মহীয়তে। স্ত্রীদিগের পক্ষে স্বতন্ত্র যজ্ঞ, ব্রত, বা উপবাস নিষিদ্ধ। কেবল পতি শুশ্রূষা দ্বারাই তাঁহারা অক্ষয় স্বর্গের অধিকারিণী হন।

অর্থাৎ নারীগণ বিনয়, বশ্যতা, সারল্য, স্নেহ, দয়া, সহিষ্ণুতা, কোমলতা প্রভৃতি সদ্গুণে বিভূষিতা হইয়া অনন্যমনে পতি সেবা করিবেন, সর্ব্বদা গার্হস্থ্য কর্ম্মে মনোনিবেশ করিবেন এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ অতিথি প্রভৃতির যথোচিত সমাদর করিবেন। বিদ্যা-শিক্ষা, একজামিন দেওয়া অথবা চাকুরী করা স্ত্রীগণের পক্ষে নিষিদ্ধ। কেন না ঐ সমস্ত কার্য্য দ্বারা তাঁহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বিনষ্ট হইতে পারে। সংসারের ভীষণ সংগ্রামে প্রবিষ্ট হইলে নারীর স্বাভাবিক সদ্গুণ সমস্ত বিনষ্ট হইয়া যায়। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ নারীজীবনের যে উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়াছেন তাহাই যে সর্ব্বাংশে শ্রেয়স্কর তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। নারীগণ কখনই পুরুষোচিত গুণ সমস্ত লাভ করিতে পারিবে না। তাঁহাদের শরীরের গঠন, মস্তিস্কের আয়তন, মাংস পেশীর কোমলতা প্রভৃতি এ বিষয়ে তাহাদের প্রধান অন্তরায় হইবে।”

৩। শিক্ষা।

স্ত্রীলোকদের বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আর্য্যগণ রমণীদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্বন্ধে শিক্ষার বিশেষ আবশ্যক মানে করিতেন। ফলতঃ যদি স্ত্রীদিগের পুরুষের ন্যায় উচ্চশিক্ষার আবশ্যক আর্য্যেরা মনে করিতেন তবে সে সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা বিশেষ ভাবে (যেমন পুরুষের জন্য আছে) থাকিত। আজ কাল অনেকেই বেদ পুরাণ হইতে স্ত্রী শিক্ষার ২।১টি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছেন। আমরা এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

৪। সাধ্বী স্ত্রীর ব্যবহার।

এ সম্বন্ধে মহাভারত হইতে ২টি স্থান উদ্ধৃত করা হইল।

"যুধিষ্ঠির কহিলেন পিতামহ! সাধ্বী স্ত্রীগণের ব্যবহার জ্ঞাত হইতে আমার অভিলাষ হইতেছে; অতএব আপনি আমার নিকট সবিস্তার কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! সর্ব্ব তত্ত্বজ্ঞা পতিপরায়ণা শাণ্ডিলী সুর লোকে আরোহণ করিলে, দেবলোকবাসিনী সুমনা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, দেবী! তুমি কি প্রকার সুশীলতা ও সদাচার দ্বারা সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত লাভ করিয়া অগ্নিশিখা ও চন্দ্র প্রভার ন্যায় সমুজ্জল কলেবরে এই দেব লোকে আগমন করিলে? তোমাকে দিব্য বসন পরিধান পূর্ব্বক সচ্ছন্দে বিমানোপরি অসাধারণ তেজঃ প্রকাশ করিতে দেখিয়া, বোধ হইতেছে, তুমি সমধিক তপস্যা দান বা নিয়ম দ্বারা এই লোক প্রাপ্ত হইয়াছ। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি আমার নিকট স্বীয় সৎকার্য্য কীর্ত্তন করিয়া আমার চিত্তকে পরিতৃপ্ত কর।

সুমনা এই প্রকার মধুর বাক্য প্রয়োগ করিলে, চারুহাসিনী সাণ্ডিলী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। দেবী! আমি শিরো মুণ্ডন, জটা ধারণ অথবা কষায় বস্ত্র বা বল্কল পরিধান করিয়া এই লোক প্রাপ্ত হইয়াছি, এরূপ বিবেচনা করিবেন না। আমি কদাচ পতির প্রতি অহিতকর বা পরুষ বাক্য প্রয়োগ করি নাই। সতত অপ্রমত্ত ও যতব্রত হইয়া দেবতা, পিতৃলোক ও ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা এবং শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সেবা করিতাম, আমার মনে কখনই কুটিল ভাবের উদয় হয় নাই; আমি কখনই বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান বা কোন ব্যক্তির সহিত অধিকক্ষণ কথোপকথন করিতাম না, কি প্রকাশ্যে কি অপ্রকাশ্যে কোন হাস্যজনক ও অহিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে কখনই আমার প্রবৃত্তি জন্মে নাই; আমার ভর্ত্তা স্থানান্তর হইতে গৃহাগমন করিলে আমি সমাহিত চিত্তে তাঁহাকে আসন প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত সৎকার করিতাম; যে সমস্ত ভক্ষ্যবস্তু তাঁহার অপরিজ্ঞাত ও অনাভিমত হইত, আমি কোন ক্রমেই তৎসমুদয়

শুশ্রূষা করিতাম না। পুত্র কন্যা প্রভৃতি পরিজনবর্গের নিমিত্ত যে সমুদয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, আমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্বয়ং ও অন্যদ্বারা সেই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতাম। আমার ভর্ত্তা কোন কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গমন করিলে, আমি কেশ সংস্কার এবং গন্ধমাল্য, অঞ্জন ও গোরোচনা দ্বারা শরীরের সৌন্দর্য্যসাধন না করিয়া সতত সংযতচিত্তে নানাবিধ শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতাম। যখন তিনি নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেন, তখন বিশেষ কার্য্য থাকিলেও আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতাম না; পরিজনের প্রতিপালনার্থ সতত পরিশ্রম করিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহার বিরাগভাজন হইতাম না। গোপনীয় বিষয় কোন ক্রমে প্রকাশ করিতাম না এবং সতত গৃহ সকল পরিষ্কার করিয়া রাখিতাম। (মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব।)

ভূতভাবন মহাদেব ও ভগবতী পার্ব্বতীর
কথোপকথন।

পার্ব্বতী কহিলেন, আমি স্ত্রীধর্ম্মের যতদূর অবগত আছি, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, সকলে অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। পিতা মাতা প্রভৃতি বন্ধুগণের অনুমতি অনুসারে অগ্নিসমক্ষে উপযুক্ত পাত্রের সহিত পরিণীত হওয়া কামিনীগণের প্রধান ধর্ম্ম। যে স্ত্রী সচ্চরিত্রা, প্রিয়বাদিনী, সদ্ব্যবহারনিরতা ও প্রিয়দর্শনা হন এবং স্বামী মুখ দর্শনে পুত্র মুখ দর্শন জনিত আনন্দের ন্যায় আনন্দ অনুভব করেন, তিনি যথার্থ ধর্ম্মচারিণী ও সাধ্বী। যিনি দাম্পত্য ধর্ম্ম পালনে অনুরাগিনী, ভর্তৃতুল্য ব্রতচারিণী ও ধর্ম্মানুরক্তা হন এবং স্বীয় স্বামীর বশীভূত হইয়া ব্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, যাঁহার মন স্বামী চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হয়, স্বামী দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ বা ক্রোধ নেত্রে দৃষ্টিপাত করিলেও যিনি তাঁহার নিকট প্রসন্ন চিত্তে অবস্থিতি করেন; অন্য পুরুষের কথা দূরে থাকুক যিনি চন্দ্র, সূর্য্য বা বৃক্ষকেও অবলোকন করেন না, স্বামী দরিদ্র, ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত, কাতরভাবাপন্ন বা পথশ্রান্ত হইলে, যিনি তাঁহার প্রতি অকপটভাবে সমাদর প্রকাশ করেন; যিনি কার্য্যদক্ষা, প্রজ্ঞা, পতিপরায়ণা ও পুত্রবতী; যিনি অবিকৃত চিত্তে স্বামীর সেবা করেন, যাঁহার মন

স্বামীর প্রতি সতত্তই প্রসন্নই থাকে; যিনি প্রতি নিয়ত অন্ন প্রদান দ্বারা কুটুম্বগণের ভরণপোষণ করেন, যিনি বিষয়ের অভিলাষ ঐশ্বর্য্য ম্ন সুখে বিশেষ যত্ন না করিয়া কেবল স্বামীর প্রতি যত্ন করেন, যিনি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গৃহমার্জ্জন, গৃহে গোময় লেপন, স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া হোমানুষ্ঠান, বলি প্রদান এবং দেবতা অতিথি ও ভৃত্যগণকে আহার প্রদান করিয়া থাকেন, পরিজনবর্গ ভোজন করিলে পরে যিনি ভোজনে প্রবৃত্ত হন; যাঁহার দ্বারা লোক সকল সন্তুষ্ট ও পরিতুষ্ট হয় এবং যিনি শ্বশুর ও শ্বাশুড়ির সন্তোষ সাধন, পিতা মাতার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করেন, তিনি উৎকৃষ্ট ধনলাভে সমর্থ হন। যিনি ব্রাহ্মণ, দরিদ্র, অনাথ ও অন্ধ প্রভৃতি কৃপাপাত্রদিগকে অন্ন প্রদান করেন এবং স্বামীর প্রতি একান্ত আসক্ত ও তাঁহার প্রতি হিত সাধনে অনুরক্তা হন, তাঁহার পাতি-ব্রত্য ধর্ম্মের ফল লাভ হইয়া থাকে। পতিভক্তিই স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম, তপস্যা ও সনাতন স্বর্গ স্বরূপ। পতিই স্ত্রীলোকের পরম দেবতা পরম বন্ধু ও পরম গতি। অবলাগণের পক্ষে পতি প্রসন্নতা স্বর্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। হে নাথ! আপনি অপ্রীত থাকিলে আমার কথনই স্বর্গলাভের কামনা হয় না। পতি দরিদ্র, ব্যাধিত, বিপন্ন, রিপুবশবর্ত্তী বা ব্রহ্ম-শাপগ্রস্ত হইয়া যদি প্রাণ বিয়োগ কর অকার্য্য বা অধর্ম্মাচরণ করিতে অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে অবিচারিত চিত্তে তাহা সমাধা করা কর্ত্তব্য। হে দেবাদি দেব!" এই আমি আপনার নিকট স্ত্রী ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। (মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব।

৫। সাধ্বী রমণীদের সম্বন্ধে প্রাচীন আর্য্যদিগের মত।

এসম্বন্ধে কাশীখণ্ডে লিখিত আছে যে "যেখানে সাধ্বী রমণীর" পদ-স্পর্শ হয়, ধরণী সে স্থানকে পবিত্র মনে করেন। দক্ষ বলিয়াছেন—স্ত্রী যদি স্বামীর মনমত কার্য্য করেন ও তাঁহার অনুগতা থাকেন, তাহা হইলে গৃহস্থাশ্রমের তুল্য আশ্রম আর নাই। কাত্যায়ণ বলিয়াছেন—"সাধ্বী রমণীর" মুখ প্রাতেঃ দেখিলে সেদিন নিশ্চয় মঙ্গল হইবে। বিষ্ণুসংহিতার

শেষভাগে নারায়ণ লক্ষ্মীকে প্রশ্ন করিতেছেন। হে লক্ষ্মী! তুমি কি প্রকার স্ত্রীর নিকট বাস কর। তাহাতে লক্ষ্মী উত্তর করিলেনঃ—

"নারীষু নিত্যং সুবিভূষিতাসু পতিব্রতাসু প্রিয়বাদিনীসু, অমুক্তা। হস্তাসু সুতান্বিতাসু সুগুপ্তভাণ্ডাসু বলিপ্রিয়াসু। সম্মৃষ্টবেশ্মাসু জিতে-ন্দ্রিয়াসু কলিব্যাপেতাসু পথিস্থিতাসু, ধর্ম্ম ব্যাপেক্ষিতাসু দয়ান্বিতাসু স্থিতা সদাহং মধুসূদনেতু।

উত্তমরূপে বিভূষিতা, পতিব্রতা, প্রিয়বাদিনী, ব্যয়কুণ্ঠিতা, পুত্রান্বিতা, অর্থ সঞ্চয়ে যত্নবতী, দেবতা দিগেরপূজাপ্রিয়া, গৃহ মার্জ্জন তৎপরা, জিতেন্দ্রিয়া, কলহবিরতা, দয়ান্বিতা রমণীতে আমি সর্ব্বদা বাস করি।

৬। রমণীদের প্রতি উপদেশ।

ভগবান মনু বলেন—

সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া।
সুসংস্কৃতোপস্করয়া ব্যয়ে যামুক্তোহস্তয়া।।

৫ম অধ্যায়। ১৫০।।

স্বামী রুষ্ট হইলেও স্ত্রীলোক সর্ব্বদাহৃষ্ট থাকিবে, গৃহ কর্ম্মে দক্ষ হইবে গৃহ সামগ্রী সকল পরিস্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখিবে এবং ব্যয় বিষয়ে অমুক্ত হস্ত হইবে ।। ১৫০।।

সদাচার বিহীন;অন্য স্ত্রীতে অনুরক্তা বা বিদ্যাদিহীন হইলেও সাধ্বী স্ত্রী সর্ব্বদা দেব সেবার ন্যায় পতির সেবা করিবে ।। ঐ ।। ১৫০।।

যে স্ত্রী পতির সহিত উপার্জ্জিত পূণ্য দ্বারা স্বর্গ ইচ্ছা করে সে সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর জীবদ্দশায় উহার কোন অনিষ্টাচরণ করিবেন না ও মৃত পতির ব্যাভিচার দ্বারা ও উর্দ্ধদেহিক শ্রাদ্ধাদ্যকরণ দ্বারাও কোন অনিষ্ট বাসনা করিবে না ।। ঐ ।। ১৫৬

পতি মৃত হইলে স্ত্রী পবিত্র পুষ্প ফল মূলাদি অল্পাহার দ্বারা দেহ ক্ষীণ করিবে; কিন্তু ব্যাভিচার বুদ্ধিতে পর পুরুষের নাম গ্রহণও করিবে না ।। ঐ ।। ১৫৭।।

একমাত্র পতিপরায়না স্ত্রীদিগের আচরিত শ্রেষ্ঠধর্ম্মাভিলাষিণী ক্ষমাগুণ শালিনী নিয়মচারিণী সাধ্বী স্ত্রী মধুমাংশ, মৈথুন পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া দেহ ত্যাগ পর্য্যন্ত অবস্থান করিবেন ॥ ঐ ॥ ১৫৮ ॥

সন্তান না থাকিলেই যে স্বর্গে যায় না এমত নহে, বালখিল্যাদি অনেক সহস্র ব্রহ্মচারীরাও সন্তান উৎপাদন না করিয়াই ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা স্বর্গ গত হইয়াছেন, সেইরূপ সাধ্বী স্ত্রীর সন্তান না থাকিলেও স্বর্গ প্রাপ্তি হয় ॥ ঐ ॥ ১৫৯ ॥

স্ত্রীলোক ব্যভিচার দোষে স্বামীকে দূষিত করিলে লোক নিন্দনীয় হয়, শৃগাল যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং কুষ্ঠাদি মহারোগে আক্রান্ত হইয়া অতিশয় পীড়া পায় ॥ ঐ ॥ ১৬৪ ॥

যিনি পতির সর্ব্ব প্রকারে বশীভূত থাকেন, তিনি স্বর্গে স্বামীর গৃহ প্রাপ্ত হন এবং এ জগতে সাধ্বী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন ॥ ঐ ॥ ১৬৫ ॥

৭। পুরুষের প্রতি উপদেশ।

বর্ত্তমান সময়ে কেহ কেহ রমণীদের প্রতি উপযুক্তরূপ সৎব্যবহার করেন না। প্রাচীন আর্য্যগণ পবিত্রা রমণীগণকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহারা পবিত্রা রমণীকে "দেবী" ইত্যাদি বাক্যে সম্বোধন করিতেন। আর্য্যগণ রমণীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে তাহাও বিশদরূপে লিখিয়া গিয়াছেন। আমরা সংক্ষেপে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

ভগবান মনু বলিয়াছেনঃ—

পতি শুক্র রূপে ভার্য্যায় প্রবিষ্ঠ হইয়া ভার্য্যাতে পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন, জায়ার জায়ত্ব এই যে, জায়াতে পুনর্জন্ম হয়, এজন্য উহাকে জায়া বলা যায়, সেই হেতু জায়াকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবে ॥ ৯ম অধ্যায় ॥ ৮ ॥

পুরুষ, অতি সূক্ষ্ম দুঃসঙ্গ হইতে বিশেষ যত্নে স্ত্রীলোককে রক্ষা করিবে, যেহেতু রক্ষণে উপেক্ষা করিলে দুঃশীলতায় পিতৃ ভর্ত্তৃকুলের সন্তাপ জন্মিয়া দেয় ॥ ঐ ॥ ৫ ॥

স্ত্রীরক্ষণ রূপ ধর্ম্ম সকল ধর্ম্ম হইতে উৎকৃষ্ট, ইহা জানিয়া ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের, অন্ধ, পঙ্গু প্রভৃতি দুর্ব্বল ভর্ত্তারও আপন আপন স্ত্রীকে রক্ষা করিবার যত্ন করিবে ॥ ঐ ॥ ৬ ॥

স্ত্রীকে পুরুষ বলপূর্ব্বক বা সংরোধ বা তাড়নাদি দ্বারা কখনও সৎপথে রক্ষা করিতে সমর্থ হন না। তবে বক্ষ্যমান শ্লোকোক্ত উপায় দ্বারা রক্ষা করিবেন। ॥ ঐ ॥ ১০ ॥

রক্ষণ প্রকার বর্ণন করিতেছেন ভর্ত্তা অর্থের সংগ্রহ, ব্যয়, দ্রব্য সামগ্রীর শুদ্ধি ও আত্ম শরীর শুদ্ধি, স্থাপিত অগ্নির শুশ্রূষাদি কার্য্য এবং গৃহের উপকরণ অর্থাৎ শয্যা কুণ্ড কটাহাদি দ্রব্যাদি সংরক্ষণ, এই সকল বিষয়ে স্ত্রীর উপর ভারার্পণ করিবেন। যে কুলে স্ত্রীলোকেরা অলঙ্কারাদি দ্বারা পূজিতা হন, তথায় দেবতারা প্রসন্ন থাকেন।• আর যে কুলে স্ত্রীদের অনাদর হয়,সে বংশে সকল ক্রিয়া নিষ্ফল হইয়া যায় ॥ঐ॥ ৩য় অধ্যায় ॥৫৬॥

যে কুলে ভগিনী ও গৃহস্থের সপিণ্ডস্ত্রী, পত্নী, কন্যা, পুত্রবধূ প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা ভূষণাচ্ছাদনাভাবে ক্লেশ পায়, সেই কুল শীঘ্র ধ্বংশ ও নির্ধন হইয়া যায়, দৈব ও রাজাদি দ্বারা পীড়িত হন। সৌভাগ্য কামনা করিলে বিবাহিতা কন্যাকে তাহার পিতা, ভ্রাতা, স্বামী দেবর সকলেরই মান্যকরা ও অলঙ্কার প্রদান করা কর্ত্তব্য। যদি স্ত্রী উত্তমরূপে ভূষিতা না হন, তাহা হইলে সে রমণী স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখিবে না এবং তাহাতে পুত্র উৎপাদনের ব্যাঘাত জন্মে। যে কুলে স্বামী স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট ও স্ত্রী স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট সে কুলে কল্যাণ চিরস্থায়ী। ভাগ্যবান ব্যক্তিরা উৎসবে ও সৎকার্য্যে তাহাদিগকে অশন, বসন ও ভূষণ দিয়া পূজা করিবে। ভগবান মনু একস্থলে বলিয়াছেন "মাতা" পিতা অপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক পূজনীয়া, আর স্ত্রী আপনার দেহাপক্ষা।

ভগবান মনু আরও বলিয়াছেনঃ—

"যদি পতি কোন কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গমন করেন, তবে তিনি তাঁহার স্ত্রীকে উপযুক্ত খাদ্য ইত্যাদি প্রদান করিয়া যাইবেন নতুবা পবিত্রা স্ত্রীও আহারাভাবে প্রলোভনের বশীভূত হইতে পারেন।

হিন্দু আচার ব্যবহারের শ্রেষ্ঠতা।

ভূতলে যত জাতীয় লোক বর্ত্তমান আছেন, তন্মধ্যে আর্য্যবংশীয় হিন্দুগণ জাতীয় গৌরবে, ধর্ম্ম গৌরবে, বিশুদ্ধাচারণে এবং বিবিধ সদ্ব্যবহার বলে, সর্ব্বপ্রধান।

যদিও বর্ত্তমান বিবিধ জাতীয় কৃতবিদ্যসভ্যগণ, ইদানীন্তন পূর্ব্ব কথিত কারণাধীন হিন্দুদিগকে সর্ব্ব প্রধান জাতীয় বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে সম্মত না হউন, যদিও বা স্ব স্ব জাতীয় বিষয়ক পক্ষপাত দূষিত নেত্র দ্বারা হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারের ও রীতি নীতির বিশুদ্ধিতা বিলোকনে অসমর্থ হইয়া স্বীয় জাতীয় গৌরবে উন্মত্ত থাকুন, এবং যদিও বা হিন্দুদিগকে কাফের, বিধর্ম্মী, ও পৌত্তলিক প্রভৃতি আরোপিত দোষে দূষিত জ্ঞান করিয়া স্বজাতীয় ব্যক্তিগণকে ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ও সদাচারী বলিয়া মনে করুন, তথাপিও বিজাতীয় সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতগণ তত্ত্বনির্ণয় সময়ে হিন্দুদিগের প্রাধান্য সংস্থাপন করিতে সঙ্কোচিত হইয়া লেখনীকে দূষিত করেন নাই, বরং স্পষ্টাক্ষরে স্থানে স্থানে হিন্দুদিগের সর্ব্বোৎকর্ষত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা পণ্ডিতবর এলফিনিষ্টন্ সাহেব অনেক তন্ন তন্ন বিবেচনার পরে, রাজ্য শাসন ও সমাজবন্ধন প্রসঙ্গে গ্রীক জাতি অপেক্ষা হিন্দুদিগের প্রাধান্য দেখাইয়া গিয়াছেন। ১

(কালের কুটীল গতি নিবন্ধন হিন্দুদিগের প্রাধান্যের প্রমাণ বিজাতীয়-দিগের কথার দ্বারা করিতে হইল। কারণ বর্ত্তমান কালে তাঁহাদের কথা বেদ হইতেও প্রমাণ!)

১। তিনি বলেন মনুর প্রায় সমসাময়িক সুবিখ্যাত কবি হোমার গ্রীক জাতিদিগের বিষয় চিত্রিত করিয়াছেন, তাহার সহিত সহজেই হিন্দুদিগের তুলনা করা যাইতে পারে। ইহারা হিন্দুদিগের অপেক্ষায় তেজস্বী বলবান এবং যুদ্ধাদি সম্বন্ধে সমধিক সাহসী হইলেও ব্যবহারশাস্ত্র, শাসন প্রণালী, সাংসারিক রীতি নীতি, এবং শাস্ত্রের আনুগত্য বিষয়ে হিন্দুরাই অগ্রসর ছিলেন। হিন্দুরা শত্রুদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন্। তাঁহাদিগের বিদ্যা বুদ্ধিও অনেক বেশী ছিল। তাঁহারা ঈশ্বরের সত্ত্বা ও প্রকৃতি এত অধিক অবগত ছিলেন যে আথেন্স নগরের তৎকালিক সুবিখ্যাত জ্ঞানীগণও তাহা অনুভব করিতে সমর্থ ছিলেন্ না। ইত্যাদি বহু বিষয় তৎপ্রণীত গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

যাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্রে আর্য্য নামে প্রসিদ্ধি রহিয়াছেন তাঁহারাই হিন্দুনামে খ্যাত। কেহ বলেন সিন্ধুনদ হইতেই সকার উচ্চারণে অশক্তিকতা নিবন্ধন হিন্দু নাম হইয়াছে। কেহ২ বলেন হীন হিংসক দূষোষক হীন জাতীয়দিগকে দূষিত বিবেচনা করে বলিয়াই হিন্দু সংজ্ঞা। শব্দ কল্পদ্রুম ও এই মতের পোষক। হিমালয় পর্ব্বত ও সিন্ধু সরোবরের মধ্যস্থ ব্যক্তিগণ আদ্যন্ত বর্ণদ্বয় দ্বারা হিন্দুনাম লাভ করিয়াছেন। ইহাতে পুরাণ সহায়তা করেন।

আর্য্যবংশধরগণ এই প্রাধান্য স্বীয় বিশুদ্ধ ধর্ম্ম বলে এবং পবিত্র আচার ব্যবহারের জোরেই লাভ করিয়াছেন। শাস্ত্রানুসারে আর্য্যদিগের লক্ষণ ও ম্লেচ্ছদিগের লক্ষণ বিবেচনা করিলে ও ইহা অসংশয়রূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

"আর্য্যঃ সৎকুলোদ্ভবঃ" ইত্যমরঃ।

"আর্য্যঃশ্রেষ্টঃ পূজ্যঃ" ইতিশব্দ রত্নাবলী।

অমর সিংহ বলেন প্রশস্ত কুলসম্ভব মানবগণ আর্য্যশব্দে কথিত। রত্নাবলী অভিধানে কথিত হইয়াছে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ ও পূজনীয় তাঁহারাই আচার্য্য। ইহা দ্বারা হিন্দুবংশেই আর্য্য পর্য্যায় প্রবেশ করিতেছে।

সংস্কৃত কলেজের পূর্ব্বতন প্রসিদ্ধ অধ্যাপকপণ্ডিতবর শ্রীযুক্ততারানাথ বাচস্পতি মহাশয় স্ব প্রণীত বাচস্পত্যাভিধানে প্রমাণ করিয়াছেন।

"কর্ত্তব্য মাচরন্‌কামমকর্ত্তব্যমনাচরন"

তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে যঃ স আর্য্যইতিস্মৃতঃ

বশিষ্টস্মৃতি।

অর্থ। যিনি বিধিবোধিত কর্ত্তব্য কর্ম্মানুষ্ঠানকারী, এবং অবৈধ গর্হিত কার্য্য সকলের অননুষ্ঠাতা, অথচ প্রকৃতাচারে স্বধর্ম্মানুগত আচারে অবস্থিত, তিনিই আর্য্য বলিয়া কথিত। এই আর্য্যের লক্ষণ বার্ত্তমানিক সভ্য সমাজাগ্রগণ্য। কেল তিল ও দৈতলিক, জর্ম্মণীক ও সন্তাতনিক রোমক ও গ্রীক প্রভৃতি সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতেছে না। কেবল হিন্দুতেই এ লক্ষণের সমন্বয় হইতেছে। অন্যান্ত সম্প্রদায়ে ম্লেচ্ছের লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করিতেছে। যথা—

গোমাংস খাদকো যস্তু বিরুদ্ধং বহুভাষতে।
সর্ব্বাচার বিহীনশ্চ ম্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে। তিথিতত্ত্বধৃত স্মৃতি বচনং।

অর্থ। যাঁহারা গোমাংশ ভক্ষণকারী, যাহারা বেদ বিরুদ্ধ বহু বাক্য বলেন এবং যাঁহারা বৈদিক সর্ব্বাচার বিহীন, তাঁহারাই ম্লেচ্ছ রূপে খ্যাত। সদ্যুক্তি মূলক হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন প্রসঙ্গে এই যে প্রবন্ধ মধ্যস্থ করা হইল, তাহার তাৎপর্য্য এই, হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার শ্রেষ্ঠ বলিয়াই হিন্দুরা শ্রেষ্ঠ জাতীয় মধ্যে গণনীয়। আচার বিহীন ব্যক্তিগণই ম্লেচ্ছরূপে সর্ব্বত্র পরিচিত। সুতরাং হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারের শ্রেষ্ঠতা ইহা দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে। এই অবিনা ভাব সম্বন্ধে ও কোন দেশীয় পণ্ডিতগণও অতিক্রম করিতে সক্ষম হইবেন না।* বরং ক্ষেত্রতত্ত্বের (জিয়মিটিরীর) সতসিদ্ধের ন্যায় এই শ্রেষ্ঠতা স্বতঃসিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই। হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারের শ্রেষ্ঠতা সর্ব্ববাদী সম্মত কিনা? এই ক্ষণ তদ্বিষয়ে প্রগাঢ় বিচার করিয়া দেখা উচিত। পৃথিবীতে যত প্রকার সম্প্রদায় প্রচলিত আছে প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই এই অভিমান অন্তঃকরণে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। স্ব স্ব অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম, প্রচলিত সমুদয় ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ ও ঈশ্বরানুমোদিত এবং অভ্রান্ত।

জগতে এমন কোন ধর্ম্ম বা আচার ব্যবহার কিম্বা রমণীয় কোন পদার্থও দৃষ্টিগোচর হইতেছে না যাহাতে অবিসংবাদিতরূপে সকলের ঐকমত্য সংস্থাপিত হইতে পারে। অধিক কি শর্করাও মিষ্ট রসাস্পদ বলিয়া সর্ব্ববাদি সম্মত হইতে পারে নাই। কারণ পিত্ত দূষিত রসনাযুক্ত ব্যক্তির

---

* তেন বিনা তস্যাঃ সত্বায়াঃ অভাবোঽবিনাভাবঃ ইতিলক্ষণম। আচার ব্যবহারের শ্রেষ্ঠতা ব্যতীত হিন্দুদিগের শ্রেষ্ঠতার অনুপ পত্তি হয়। হিন্দুদিগের শ্রেষ্ঠতা সর্ব্ববাদি সম্মত হইলে হিন্দুর আচার ব্যবহার শ্রেষ্ঠ বলিয়া সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে। এবং যতপ্রকার বিগর্হিত আচার ব্যবহার হউক, না কেন, স্ব স্ব আচার ব্যবহার পরম পবিত্র ঈশ্বরের প্রীতিকর। এমন কি কদর্য্য দেশবাসী হইলেও স্ব স্ব দেশ অন্যান্য দেশাপেক্ষায় উৎকৃষ্ট বলিয়া জ্ঞান হওয়া মানবদিগের অন্তঃকরণ নিহিত সাভাবিক ভাব।

শর্করা (চিনি) তিক্ত রসানুভাবক হয়। (৫) এবং অদ্যাপি তিক্ত মিষ্টাদি ষড়রস দ্রব্যের গুণ, কি রসনার গুণ, ইহা নিরূপণ করিতেও ধীশক্তি-সম্পন্ন তার্কিকগণের রাম রাবণের যুদ্ধতরঙ্গের ন্যায় বিচার তরঙ্গ উত্থিত হয়। সুতরাং সদ্‌যুক্তি দ্বারা প্রশস্তচেতা মানবদিগের নিকটে হিন্দু আচার ব্যবহারের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতে পারিলেই তাহা সর্ব্ববাদি সম্মত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ নাস্তিক বা গোঁড়া ভিন্ন-সম্প্রদায়ের নিকটে যুক্তিধারা বর্ষণ করিলেও সেই মরুহৃদয় আর্দ্র হইবে না। কিংবা আর্দ্র হইলেও মৌখিক তাহা প্রকাশ পাইবে না। বিচারে বিরত হইলেও মৃদুস্বরে বলিবে তোমাদিগের যুক্তি তোমরাই বুঝ। আমাদের বুঝিবার আবশ্যক নাই।

অযৌক্তিক প্রকৃত কথা বলিলেও সভার সাধারণ ব্যক্তি বুঝিলেন কথাটা বুঝি কিছুই হয় নাই। বক্তার যুক্তি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। অতএব সদ্‌যুক্তি মূলক হিন্দু আচার ব্যবহারের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন স্ব জাতীয় বহু বিজ্ঞ সম্মত হইলেই তদ্বিষয়ে উত্তর লেখক সিদ্ধকাম হইলেন বলিতে হইবে।

কুল্লুক ভট্টধৃত যমস্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে।

> "একোদ্বৌবাত্রয়োবাপি বদক্রুর্দ্ধর্ম্মপাঠকাঃ।
> সদ্ধর্ম্ম ইতি বিজ্ঞেয়ো নেতরেষাং সহস্রশঃ,,।

অর্থ। এক বা দুই কিংবা তিন জন ধর্ম্মবিষয়ক বিশেষ পর্য্যালোচক সুধীরগণ যাঁহাকে ধর্ম্ম বলিয়া নির্ণয় করেন তাঁহাই ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। ইতর (অর্থাৎ ধর্ম্মবিষয়ের অপর্য্যালোচক) সহস্র ব্যক্তির নির্ণীত ধর্ম্মও ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত নহে। এই বচনের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য এই, যাঁহারা, রীতি মত ধর্ম্মবিষয়ে অধ্যয়নাদি দ্বারা বিশেষ পর্য্যালোচনা এবং প্রতিকুল ও অনুকূল তর্ক দ্বারা ইহাই ধর্ম্ম এইরূপে নিশ্চয় করিয়াছেন, তাঁহাদের কথিত ধর্ম্মই ধর্ম্ম জানিবে। অনভিজ্ঞ সহস্র ব্যক্তির মতও এ বিষয়ে

(৫) পিত্তেন দূনেরসনে সিতাপিতিক্তায়তে। হংসকুলাবতংস। নৈষধচরিত।

গ্রাহ্য নহে। আমারও এই বচনের অবলম্বনাধীন বক্তব্য এই যে ধর্ম্ম শাস্ত্রকারদিগের শাস্ত্রানুগত সদ্‌যুক্তিমূলক হিন্দু আচার ব্যবহারের শ্রেষ্ঠতাই প্রকৃত শ্রেষ্ঠতা। শাস্ত্রবিরুদ্ধ বহু যুক্তিও এ বিষয়ের প্রমাণক বলিয়া আমাদের স্বীকার্য্য নহে। কারণ যুক্তিতে অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বিবিধ ব্যভিচারই দৃষ্ট হয়। *

১ম। যুক্তিধারাবর্ষী চার্ব্বাক মতে পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু, এই ভূত চতুষ্টয়ের (১) একত্র সমাবেশ হইলেই ভূতগণ চৈতন্য প্রাপ্ত হয়। এই যুক্তি তাঁহারা অখণ্ড্য ও অকাট্য বলেন। কুলাল নির্ম্মিত প্রতিমাতেও ঐ ভূত চতুষ্টয়ের সমাবেশ দেখা যাইতেছে। কিন্তু চৈতন্য কত দৃষ্ট হয় না? (২) এই মতে আত্মা বলিয়া অতিরিক্ত পদার্থ নাই।

২য়। টেলীগ্রাম প্রভৃতির আভ্যন্তরিক ক্রিয়া প্রণালী আমরা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিনা। অথচ ত্বড়িৎগতি প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। সুতরাং আমাদের হইতে ধীশক্তি সম্পন্ন ও সূক্ষ্মদর্শীদিগের উদ্ভাবিত যুক্তি সকল আমরা সম্পূর্ণরূপে না বুঝিতে পারিলেও হিন্দু আচার ব্যবহারের অনুৎকর্ষতা বলিতে পারিতেছি না। যতগুলিন সৎযুক্তি দ্বারা হিন্দু আচার ব্যবহারের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন আমাদের দ্বারা সম্ভব পর তদ্বিষয়ে বিরত হইতেছি না।

ইত্যুপক্রমণিকা অধ্যায়ঃ।

---

* কারণ থাকিতে কার্য্য হওয়াকে অন্বয়, কারণ না থাকিতে কার্য্য হওয়াকে ব্যতিরেক বলে। কারণ থাকিতে কার্য্য না হওয়াকে অন্বয় ব্যভিচার, এবং কারণ না থাকিতে কার্য্য হওয়া ব্যতিরেক ব্যভিচার বলে।

১। পৃথিব্যপ্‌তেজো বায়বশ্চত্বারি ভূতানিভূতান্যেবচেতয়ন্তি। চার্ব্বাক দর্শন।

২। যদিবা বিজাতীয় সংযোগ বলেন তবে ঘুণাক্ষরের ন্যায় কদাচিৎ চৈতন্য হইতে পারে।

ধর্ম্ম-মণ্ডলী।

সংস্কৃত ভাষার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আলোচনা হওয়ায় হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম লোকে অধিকতররূপে বুঝিতে সক্ষম হইতেছেন এবং তদনুসারে ধর্ম্মের গৌরবও কিয়ৎ পরিমাণে বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক লোকেই সংস্কৃত ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন এবং দেশের বহুসংখ্যক লোক বিদেশীয় শিক্ষার প্রাদুর্ভাবে অভিভূত সুতরাং হিন্দু ধর্ম্মের যেরূপ আদর ও গৌরব হওয়া উচিত, তাহা এক্ষণে হইতেছে না। ফলতঃ হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত এতদ্দেশের যথাযোগ্য আচার ব্যবহার কি এবং প্রকৃত প্রস্তাবেই যে ঐ সকলের অনুসরণ করিলে আমাদের দেহ, মন, আত্মা, পরিবার ও সমাজের অনির্ব্বচনীয় মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, তাহা অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম নহেন। এই অজ্ঞতানিবন্ধন ও বিদেশীয় শিক্ষার ভয়ঙ্কর প্রভাবে আমাদের শারীরিক ও মানসিক নানাপ্রকার কষ্ট হইতেছে। এই সকল অভাব দূরীকরণ জন্য এবং আপদ কালে হিন্দু ধর্ম্মের রক্ষা উদ্দেশ্যে একটী সভা সংস্থাপিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। সভার উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী অপরাপর কার্য্যের মধ্যে নিম্ন লিখিত কয়েকটী কার্য্যের বিশেষ উল্লেখ এই স্থলে প্রয়োজন।

(১) হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বালকদিগের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা।

(২) হিন্দু শাস্ত্রের মর্ম্ম ও হিন্দুর প্রকৃত আচার ব্যবহার কি, তাহা সর্ব্ব সাধারণকে বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য পুস্তকাদি প্রচার ও স্থানে স্থানেধর্ম্মব্যাখ্যার ব্যবস্থা।

(৩) সংস্কৃত বিদ্যার যাহাতে বিশেষ অনুশীলন হয় তাহার ব্যবস্থা।

(৪) সংস্কৃত অধ্যাপকদিগকে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান। এদেশের সংস্কৃত শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত অধ্যাপকগণ সংস্কৃত ভাষার সম্যক্ অনুশীলন করিতে সমর্থ হন না, এবং তাঁহারা অনেক সময়ে আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক, এই উভয়বিধ বিষয়ে স্বাধীন ভাবে উপদেশ ও আদেশ করিতে

পারেন না। আজ কালিকার ভীষণ জীবনসংগ্রামে, অন্ন চিন্তায় ও অর্থের অভাবে সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয় বলিয়াই, তাঁহাদের অধ্যয়ন অধ্যাপনা ও স্বাবলম্বন সকলেরই বিঘ্ন হইতেছে। তাঁহাদিগের আর্থিক আনুকূল্য করিতে পারিলেই তাঁহারা রীতিমত অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও স্বাধীনভাবে,ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিতে ও ধর্ম্ম প্রচারে যত্নবান হইতে পারিবেন।

(৫) সকলে একত্রে সমবেত হইয়া ধর্ম্ম মণ্ডলীর অধিবেশন ও শাস্ত্র বিচার ইত্যাদির জন্য কলিকাতা রাজধানিতে একটী দেবালয় স্থাপনা।

(৬) প্রস্তাবিত দেবালয় গৃহে হিন্দু ধর্ম্মের যে যে পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে এবং হস্তলিখিত পুঁথি যতদূর সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তাহার সমাবেশ করনের ব্যবস্থা।

(৭) উপরি উক্ত প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহ।

(৮) প্রস্তাবিত ধর্ম্মমণ্ডলীর কার্য্য বিশুদ্ধ হিন্দু নিয়ম প্রণালী মতে হইবে।

(ক) সভার সমুদায় কার্য্য ও অর্থব্যয় ধর্ম্মমণ্ডলীর আচার্য্য মহাশয়ের অভিপ্রায় ও আদেশানুসারে হইবে।

(খ) কার্য্যকারক সমিতির যে পাঁচ জন ব্যক্তি সদস্য থাকিবেন,তাঁহারা প্রয়োজনানুসারে বৎসরে বৎসরে নূতন আচার্য্য মনোনীত করিবেন।

(গ) সভ্য শ্রেণী হইতে ৫০ জন সদস্য লইয়া এক এক বৎসরের জন্য এক একটী মন্ত্রণা সভা গঠিত হইবে। ইহারা আবশ্যক মত যখন যে বিষয়ের প্রয়োজন হইবে, সেই বিষয়ে আচার্য্যকে পরামর্শ দিবেন।

(ঘ) এই মণ্ডলী সংক্রান্ত যাবতীয় সম্পত্তি ও অর্থ দেবোত্তর সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে।

(ঙ) মণ্ডলী আইন অনুসারে রেজেষ্টরী হইবে।

(৯) আচার্য্যের আদেশ ব্যতীত কার্য্যকারক সমিতির সদস্যগণ নিজে কেহ একাএক বা একত্রে কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না, বা কোন বিষয়ে তাঁহাদের কোন মতামত চলিবে না।

(ক) আচার্য্য মহাশয়ের আদেশানুসরে কার্য্যকারক সমিতির পাঁচ জন ব্যক্তি সমিতির সকল কার্য্য সম্পাদন করিবেন। কার্য্যকারক সমিতির অধীনে একজন সম্পাদক থাকিবেন, তিনি ধর্ম্ম-মণ্ডলী সম্বন্ধীয় যাবতীয়

কার্য্যভার বহন করিবেন এবং আচার্য্য ও সমিতির অনুমত্যানুসারে যথানিয়মে কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

(১০) হিন্দু মাত্রেই বৎসরে ন্যূনকল্পে ১ টাকা চাঁদা দিলে সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন :

(ক) সভ্য মহাশয়েরা ইচ্ছা করিলে আপন অভিপ্রায় আচার্য্য মহাশয়, মন্ত্রণাসমিতি বা কার্য্যকারক সমিতিকে জানাইতে পারিবেন। কিন্তু আচার্য্য মহাশয়ের সিদ্ধান্ত ও আদেশানুসারে তাঁহাদিগকে চলিতে হইবে।

যাঁহারা উপরি উক্তরূপ ধর্ম্মমণ্ডলীর স্থাপন জন্য অর্থ সাহায্য করিতে ও সভ্য হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আপাততঃ উত্তরপাড়া নিবাসী রাজা শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের নিকট তাঁহাদের এককালীন দাতব্যের টাকা এবং বার্ষিক দাতব্যের টাকা, নিজ নিজ নাম ধাম সহ, লিখিয়া পাঠাইয়া দিবেন। এবং পত্রাদি ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় ৪৭ নং পাথুরীয়াঘাটা ষ্ট্রীট কলিকাতা, ধর্ম্ম-মণ্ডলী কার্য্যালয়ে, মণ্ডলীর বর্ত্তমান কার্য্যকারী সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট লিখিবেন ও জানিবেন। মণ্ডলীর কার্য্য নির্ব্বাহের নিয়মাবলী আচার্য্য মহাশয় মন্ত্রণা সমিতির পরামর্শ লইয়া প্রণয়ণ করিবেন।

ধর্ম্মমণ্ডলী-কার্য্যালয়।
৪৭নং পাথুরীয়া ঘাট,ষ্ট্রীট কলিকাতা।
তারিখ ১২ই আষাঢ়। শক ১৮১৩

শ্রীপ্যারীমোহন শর্ম্মা
শ্রীশশীশেখরেশ্বর শর্ম্মা।

প্রতিমূর্ত্তি পূজা রহস্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আচার্য্য।—গতবারে তৃতীয় প্রশ্ন মীমাংসিত হইয়াছে। এবার চতুর্থ অবশিষ্ট। অর্চ্চনা কালে, প্রতিমাকেই পুষ্পপত্রে সজ্জিত করা হয়,

অথচ উহা প্রতিমা পূজা নহে, একথা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়। এই না তোমার চতুর্থ প্রশ্ন? এ বিষয় বলিবার আর প্রয়োজন আছে কি?

শিষ্য।—আজ্ঞে না, আমার আর সে সন্দেহ নাই। তৃতীয় প্রশ্নের মীমাংসাই উহা মীমাংসিত হইয়াছে। সাধক যদি প্রতিমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ না দেখিতে পান, প্রতিমার প্রতি অঙ্গে মায়ের অঙ্গ, মায়ের ভাব অনুভব করেন, মাকেই সন্দর্শন করেন এবং তদনুসারে পুষ্পপত্র সমর্পন করেন, তবে তাহা মায়েরই পূজা করা হইবে। তাহা অন্যের দৃষ্টিতে প্রতিমার পূজা হইলেও বাস্তবিক তাহা নহে। এ বিষয় বিলক্ষণ বুঝা গিয়াছে। অতএব আর বলার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমার আর দুইটি সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, আজ্ঞা করিলে প্রকাশ করিতে পারি।

আচার্য্য।—তাহা স্বচ্ছন্দে বলিবে। আমার জ্ঞান গোচর হইলে অবশ্যই বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

শিষ্য। আপনি উপদেশ করিয়াছেন যে, মনের মধ্যে মায়ের মূর্ত্তি সন্দর্শন করিলেও ভক্তি হইতে পারে। যদি তাহাই হয়, তবে প্রতিমা নির্ম্মাণের আবশ্যক কি?

আচার্য্য।—প্রতিমা নির্ম্মাণের অন্যান্য কারণও বহুতর দর্শিত হইয়াছে, অতএব এই একটী কারণ বাদ গেলেও প্রতিমার আবশ্যকতা নষ্ট হয় না। তবে আমার কথার সত্যতা প্রমাণের বিশেষ প্রয়োজন আছে, সেই জন্যই তোমাকে এ বিষয় বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইলাম।

মানসিক দর্শনে যে ভক্তি হয় বা হইতে পারে, তাহা সত্য, তাই বলিয়া নয়নের প্রতিমা দর্শন অনাবশ্যক নহে। তাহারও নিতান্তই প্রয়োজন হয়। মানস দর্শন করিতেই তাহার আবশ্যকতা আছে। মনে মনের চিন্তাও বাহিরের প্রতিমূর্ত্তি ব্যতীত হইতে পারে না। বাহিরে যদি কেহ কখনো প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ না করে তাহা হইলে কি দেখিয়া কেমন করিয়া মনে মনে মায়ের আকার চিন্তা করিবে? বাহিরে কোন আকার না দেখিতে পাইলে মনে মনে তাহার চিন্তা করা যায় না। জন্মান্ধ কখনই মনে মনে কোনরূপ আকারের কল্পনা করিতে পারে না।

অবশ্যই, আনুপূর্ব্বীকরূপে বর্ণনা শ্রবণ করিলেও মনে মনে একটা আকার কল্পনা করা যায় সত্য, কিন্তু তাহাও বাহিরের দর্শন সাপেক্ষ। যখন কোনরূপ বর্ণনা শ্রবণ করা যায়, তখন ঠিক তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সদৃশ একটি পূর্ব্ব দৃষ্ট আকার মনের মধ্যে উদিত হয়। এবং ঐ বর্ণনা দ্বারা তাহাকেই রঞ্জিত করা হয়। তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুলি এবং রূপলাবণ্যাদি ঐ বর্ণনার অনুরূপ করিয়া গঠন করা হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি বহির্নয়নে কোন আকৃতি সন্দর্শন করে নাই সে সহস্র বর্ণনা শুনিলেও মনে মনে কোন আকারের কল্পনা করিতে পারে না।

কুম্ভকারগণও এইরূপেই, প্রথমে, মায়ের আকার নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তাহারা পূর্ব্বে মায়ের কোন গঠিত প্রতিমা দর্শন করে নাই সত্য, কিন্তু পণ্ডিতগণের নিকট যখন মায়ের আকারের বর্ণনা শ্রবণ করিয়াছিল তখন পূর্ব্বদৃষ্ট অতি সুন্দরী অতি মনোহরা কোন একটি অবলার আকৃতি তাহাদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, পরে সেই আকৃতিটিকে সে ঐ বর্ণনার দ্বারা রঞ্জিত করিয়া হৃদয়ের মধ্যে সংস্থাপিত করে। তৎপর বাহিরে তদনুরূপ আকৃতির নির্ম্মাণ করে। সুতরাং ইহাও সেই বাহিরে মূর্ত্তি দর্শন সাপেক্ষ হইল। বাহিরে কিছু না দেখিলে কেহ কখনও হৃদয়ের মধ্যে কিছু কল্পনা করিতে পারেনা।

এখন ভাবিয়া দেখ প্রতিমা নির্ম্মাণ করা আর না করাতে তোমার কিরূপ লাভালাভ হইল। প্রতিমা নির্ম্মাণ না করিয়া মায়ের আকার চিন্তা করিতে বসিলে পূর্ব্বদৃষ্ট প্রতিমার আকার স্মরণ হইয়া হৃদয়ে মায়ের আকার উদিত হয়। আর যদি কোন মৃণ্ময়ী প্রতিমা না দেখিয়া থাক তবে কেবল বর্ণনাদি শ্রবণের দ্বারা কোন একটি স্ত্রীলোকের আকার হইতে মায়ের আকার মনে মনে গঠন করিতে হইবে। এই দুইএর একতর ব্যতীত কোন মতেও তাঁহাকে মনে করিতে পারিবে না। এই যদি স্থির হইল তবে সাক্ষাতে মায়ের প্রতিমা রাখিতে দোষ হইল কি?

বাস্তবিক, সেই পূর্ব্বদৃষ্ট মৃণ্ময়ী প্রতিমা বা মানুষী প্রতিমা হইতে মায়ের আকার কল্পনা করা অপেক্ষায় সন্নিহিত প্রতিমায় মায়ের সন্দর্শন

করা নিতান্ত সহজ, নিতান্ত পরিস্ফুট, সুতরাং প্রতিমার বিশেষ আবশ্যক হইল। তবে যখন প্রতিমা না পাওয়া যায়, এবং পুষ্প, মন্ত্র, ঘা জলাদিতে পূজা করিতে হয়, তখন অগত্যাই সেই পূর্ব্বদৃষ্ট মৃণ্ময়ী বা মানুষী প্রতিমাদি হইতে হৃদয় মধ্যে মায়ের আকার গড়িয়া লইতে হয়, তদ্বারাই যথা সম্ভব ভালবাসা এবং ভাবোচ্ছাস হয়। পরে ঐ যন্ত্রাদিতে ঐ রূপের কল্পনা করিয়া লইয়া অর্চ্চনা করিতে হয়। কিন্তু উহা সন্নিহিত প্রতিমার সমান ফলদায়ক নহে। এখন তোমার দ্বিতীয় জিজ্ঞাস্য উপস্থিত কর।

শিষ্য।—দ্বিতীয় সন্দেহ এই যে, আপনি এই প্রতিমা পূজা সম্বন্ধে যেরূপ ব্যাখ্যা করিলেন ইহা কি কোন শাস্ত্রের অনুমোদিত, অথবা আপনারই পরিকল্পিত? বাস্তবিক, ইহা যদি শাস্ত্রের অনুমোদিত হয় তবেই আমরা সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিতে পারি।

আচার্য্য।—আমি যখন যে কোন কথা বলি, তৎসমস্তই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের অনুবাদ মাত্র। শাস্ত্রে যাহা নাই, তাহা কখনো বলি না। এই প্রতিমূর্ত্তি পূজার বিষয়ও শাস্ত্রেই এইরূপ আছে। একটি পূজার কথকটা প্রণালী তোমাকে দেখাইয়া দেই তবেই ইহা প্রত্যয় করিতে পারিবে। আমাদের প্রচলিত দুর্গা পূজা সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলিতেছেন, দেখ,—

সাধক পূজা করিতে বসিয়া বিবিধ প্রক্রিয়ার দ্বারা মায়ের উপলব্ধি করিয়া লইবেন, তৎপর মায়ের স্নান করান আরম্ভ করিবেন। তাহার মন্ত্র,-

ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ, সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সভূমীং সর্ব্বতঃ স্পৃষ্টা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং॥

ভাবার্থ।—যিনি অনন্তশীর্ষ, অনন্ত নয়ন, অনন্ত পাদ, যিনি অনন্ত জীবের হৃদয়ক্ষেত্রে বাস করিতেছেন, এবং ভুভুর্বঃ স্বঃ এই ত্রিলোক ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, অথচ কণ্ঠাবলি হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত দশাঙ্গুলী পরিমিত স্থানেই যাঁহার সুস্পষ্ট অনুভব হয়, সেই পরম বস্তুই ত তুমি। মাগো! এই ক্ষুদ্রঘট পূর্ণ জল কি তোমার স্নানের পরিতোষ জনক হইবে?

এইরূপে মহোচ্চার্থ প্রকাশক ঋগ্‌বেদীয় ও যজুর্ব্বেদীয় ২১টী মন্ত্র

পাঠ করিয়া ৩৩ বার জলাভিষেক করিতে হয়। ইহা পুত্তুলের বার বলিয়া তোমার মনে হয় কি ?

তৎপর মায়ের দুর্গা, জগদম্বা, গৌরী, অম্বিকা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম ও বীজের উল্লেখ করিয়া শঙ্খোদক, পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, তৈল হরিদ্রা, ইক্ষুরস পঞ্চকষায়োদক, তৈল, চন্দনোদক, উষ্ণোদক, সুবর্ণোদক, শর্করোদক এবং গঙ্গোদকাদির দ্বারা স্নান করাইতে হয়। ইহার প্রত্যেকের সঙ্গে সঙ্গেই মায়ের মহিমা ও গুণাদি প্রকাশক এক একটী মন্ত্রও আছে।

অনন্তর, গুজ্জরীরাগিণী, মানসী রাগিণী, ভৈরবী রাগিণী, কড়াকড়রাগ ভৈরব রাগ এবং মালব রাগ ও বেণুবাদ্যাদির দ্বারা মায়ের গুণ মহিমাদি প্রকাশক এক একটী মন্ত্র গান করিয়া গঙ্গা মৃত্তিকাদির দ্বারা স্নান করাইতে হয়। তৎপর, নানাবিধ অভাব, অনুনয় ও প্রার্থনা সূচক কতকগুলি মন্ত্র পাঠ করিয়া শীতলোদক, গন্ধোদক, অগরূদক ও নারিকেলোদকাদির দ্বারা স্নান করাইতে হয়। ঐ সকল মন্ত্রের মধ্যে কতকগুলি তোমাকে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি, তবেই শাস্ত্র প্রতিমা পূজার উপদেশ করেন, কি প্রতিমাতে মায়ের পূজার অবতারণা করেন, তাহা বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।—

“তৈলং যত্রুক্ষদোষঘ্নং তিলং বর্চ্চাদ্রকং ভবেৎ। তেন ত্বাং স্নাপয়াম্যহং বরদে! শুম্ভসূদনী॥ যোঽসৌ মলয়জোবৃক্ষঃ শ্রেষ্ঠোগন্ধালয়ঃ সদা। তজ্জল স্নানমাত্রেন বরদাভব শোভনে!॥ পৃথিব্যাং স্বর্ণরূপেণ দেবা তিষ্ঠন্তি সর্ব্বদা। অরিষ্ট দোষ শান্ত্যর্থং স্নাপয়ামি মহেশ্বরীং॥ সর্ব্বদা সর্ব্বদোষঘ্না অরিষ্ঠানাং বিঘাতকাঃ। স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং সর্ব্বানন্দকারীং শিবাং॥ ধৃক্ষেশঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং গন্ধাঢ্যো ভুবিতিষ্ঠতি। তদ্বৃক্ষসারতোয়েন পার্ব্বতীং স্নাপয়াম্যহং॥ ক্রামন্তি সর্ব্বগন্ধাশ্চ পূতিগন্ধ বিঘাতকাঃ। স্নাপয়ামি পরাং দেবীং বরদে! শুম্ভসূদনি!”॥

ভাবার্থ,—সাধক মায়ের ঐশ্বর্য্য মহিমাদি সমস্ত বিস্মৃত হইয়া পূর্ব্বোক্তরূপে পূর্ণ প্রেমে বিহ্বল হইয়া এই সকল কথা বলিতেছেন।— মা, শুম্ভসূদণি! বরদে! শুম্ভাদি অসুরগণের সহিত ঘোর সংগ্রাম করিয়া তোর সুস্নিগ্ধ চিকণ লাবণ্যযুক্ত তনু যষ্টি যেন রুক্ষ, রুক্ষ, দুষ্ট

হইতেছে। অতএব এই তিল চূর্ণ আর তৈলের দ্বারা অভ্যঞ্জন করিয়া দিতেছি। ইহাতে শরীরের রুক্ষতা দোষ বিনষ্ট হয় এবং অভ্যন্তর সুস্নিগ্ধ হয়। আর এই সুগন্ধ চন্দনোদকের দ্বারা স্নান কর, ইহাতে স্নান মাত্রেই শরীর আর মনের প্রসন্নতা হইবে। মাগো! পিতা মহেশ্বর সর্ব্বদাই তোকে লইয়া ভূত প্রেত সমাকূল শ্মশানভূমিতে বিচরণ করেন, অসুরগণও সর্ব্বদা তোর অমঙ্গল কামনা করে, অতএব এই স্বর্ণো-দকের দ্বারা তোকে স্নান করাইয়া দিই। ইহাতে সমস্ত অরিষ্ট দোষের শান্তি হইয়া থাকে। কারণ দেবগণ সর্ব্বদা সুবর্ণের অধিষ্ঠাতৃরূপে অবস্থিতি করেন। আর এই অগুরূদক, ইহা ও সর্ব্বদোষঘ্ন, এবং অরিষ্ট বিনাশক, অতএব ইহার দ্বারাও অভিষেক করিতেছি। মাগো! তুই হিমালয় পর্ব্বতের দুহিতা, হিমালয়ে মলয় পর্ব্বতের অতি সুগন্ধি বৃক্ষাদি নাই, সুতরাং তদ্দ্বারা তুই স্নান করিতে পারিস না ও অতএব সেই মনোহর গন্ধাঢ্য বৃক্ষ নির্য্যাস মিশ্রিত জলের দ্বারা স্নান করাইয়া দিই। আর এই নারিকেলোদক ইহাও শরীরের সকল প্রকার অশুভাবহ গন্ধাদি বিদূরিত করে; অতএব ইহা দ্বারা স্নান করাইয়া দিই।" এইরূপ দৃষ্ট গর্ভধারিণীর ন্যায় পার্থিব মাতৃস্নেহ প্রকাশক নানাবিধ মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে সাধকের চৈতন্য হইল, ভ্রান্তি বিদূরিতা হইল। গর্ভধারিণীর ন্যায় জগদম্বার লৌকিক সুখ দুঃখের বিশ্বাস অপনোদিত হইল! জগন্মাতার প্রকৃতা-বস্থার অভিজ্ঞান হইল। তখন মায়ের ঐশ্বর্য্য গুণ মহিমাদি স্মরণপথে আসিল, মা যে সামান্যা নহেন, এ যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের গর্ভধারিণী, এ যে তাঁহাদের সহস্রার বিলাসিনীল মা, এ যে ঋষি, যোগী, দেবগণের দুরারাধ্যা মা, এ যে সর্ব্ব পাবন পাবনা মা ইত্যাদি তত্ত্ব সকল সমুদিত হইল। তখন তিনি এই সকল মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে কুম্ভে কুম্ভে জল লইয়া মাকে স্নান করাইতে লাগিলেন!

মন্ত্র,—ওঁ সুরাস্তামভিষিঞ্চন্তু গন্ধর্ব্বাপ্সরসাংগণাঃ। গ্রহাশ্চক্ষাস্তথাঃ যোগাঃ করণাস্তিক্রমস্তথা। ঋষয়ো দেবপুত্রাশ্চ যে চান্যে দেবযোনয়ঃ সর্ব্বে ভুবনলোভুষ্টা ভুব। রৈঃস্নাপয়ন্তে॥ ১॥ আত্রেয়ী ভারতী গঙ্গা যমুনাচ সরস্বতী। সরযূর্গণ্ডকী পুন্যা শ্বেত গঙ্গাচ কৌশিকী। ভোগবতীচ

পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা। এতাঃ সুমনসোভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তুতাঃ॥ ২॥ সিন্ধু ভৈরব শোণাদ্যা যে হ্রদাভুবিসংস্থিতাঃ। সর্ব্বে সুমনসোভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তুতে॥ ৩॥ তক্ষকাদ্যাশ্চ যে নাগাঃ পাতাল তলবাসীনঃ। সর্ব্বে সুমনসোভূত্বা ভৃঙ্গরৈঃ স্নাপয়ন্তুতে। ৪॥ দুর্গা চণ্ডেশ্বরী চণ্ডী বারাহী কার্ত্তিকী তথা। হরসিদ্ধাতথা কালী ইন্দ্রানী বৈষ্ণবী তথা। ভদ্রকালী বিশালাক্ষী ভৈরবী সর্ব্বরূপিনী। এতাঃ সুমনসোভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপায়-ন্তুতাঃ॥ ৫॥ অনন্তাদিমহানাগা নিত্যং পাতালবাসিনঃ। সর্ব্বে সুমন-সোভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তুতে॥ ৬॥ সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদানদাঃ। সর্ব্বে সুমনসোভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপায়ন্তুতে॥ ৭॥ সুরাস্ত্বা-মভিষিঞ্চন্তু ভক্তিমন্তঃ সুরেশ্বরীং। মেঘতোয়াদি পূর্ণেন দ্বিতীয় কাল-সেনতু॥২॥ সারস্বতেন তোয়েন সম্পূর্ণেন সুরোত্তমাৎ। বিদ্যাধরাভিষিঞ্চন্তু তৃতীয় কলসেনতু॥ ৩॥ মরুতশ্চাভিষিঞ্চন্তু লোক পালাঃ সমাগতাঃ। সাগরোদক পূর্ণেন চতুর্থকলসেনতু॥ ৪॥ বারিণা পরিপূর্ণেন পদ্মরেণু সুগন্ধিনা। পঞ্চমেনাভিষিঞ্চন্তু নাগাশ্চ কলসেনতু॥ ৪॥ হিমবদ্ধেমকূটাদ্যা অভিষিঞ্চতু পর্ব্বতাঃ। নির্ঝরৌদক পূর্ণেন ষষ্ঠেন কলসেনতু॥ ৫॥ সর্ব্বতীর্থাম্বু পূর্ণেন সপ্তমেন সুরেশ্বরীং। শক্রাদ্যাশ্চাভিষিঞ্চন্তু ঋষয়ঃ সপ্তখেচরাঃ॥ ৭॥ বসবশ্চাভিষিঞ্চন্তু কলসেনাষ্টমেনতু। অষ্টমঙ্গলসংযুক্তে দুর্গে! দেবি! নমস্ততে॥ ৮॥ নানা সুগন্ধি তোয়েনঘটেন নবমেনতু। অপ্সরসোহভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বসৌভাগ্য সংযুতাঃ॥ ৯॥ দেবাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ। বাসুদেব জগন্নাথ স্তথা সঙ্কর্ষণঃ প্রভূঃ। প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায়তে॥ ১০॥ আখণ্ডলোহগ্নির্ভগবান্ যমোবৈ নির্ঋতিস্তথা! বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষঃ তথা শিবঃ। ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষো দিক্‌পালাঃ পান্তুতে সদা। কীর্ত্তিলক্ষ্মী ধৃতি মেধা তুষ্টি শ্রদ্ধা ক্ষমা মতিঃ। বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ কান্তিঃ শান্তিঃ পুষ্টিশ্চ মাতরঃ। এতাস্ত্বা মাভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মপত্ন্যঃ সমাগতাঃ।

ভাঃ, অঃ—মাগো! ওমা! আমি কিরূপ জ্ঞানে তোমাকে কি বলিতে ছিলাম! কিসের দ্বারা তোমাকে স্নান করাইতেছিলাম। কোন্ হস্তে কোন্ হৃদয়ে তোমার সেবা করিতেছিলাম! মা! তুমিতো দেব, ঋষি,

যোগীগণের দুরারাধ্যা দুর্গা। তুমিতো ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের সহস্রারের আদরিণী! তুমিতো পরম পবিত্র ধাম বিলাসিনী! এই হতভাগ্য নরকের কৃমি কি তোমাকে পূজা করিতে পারে? এই কলুষিতকর সুমলিন হৃদয় কি তোমার সপর্য্যার উপযুক্ত? এই সামান্য জল কি তোমার পরম পাবন অঙ্গের সঙ্গী হইতে পারে? তাহা কদাচ নহে। মাগো! তুমি মা হইলেও তোমার ঐশ্বর্য্য মহিমাদি মনে পড়িয়া আমার আর সাহস ভরসা হইতেছে না, আমার হস্ত অগ্রসর হইতেছে না, মন প্রবল হইতেছেনা মাগো! আমি বাহক হইয়া এই জলপূর্ণ ভৃঙ্গার তোমার মস্তকের উপরিভাগে ধরিলাম, এখন তোমার উপযুক্ত সেবক সেই দেবগণ আসিয়া এই জল নিগলন করুন। মা! তুমি হিমালয় নগরে আবির্ভাব কালে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদিগের সেবা, অতি সমাদরে গ্রহণ করিতে, অতএব তাঁহারাও আসুন। আর সূর্য্য, চন্দ্র, প্রভৃতি গ্রহগণ, অশ্বিন্যাদি তারাগণ, বিষ্কুম্ভাদি যোগগণ, ববপ্রভৃতি করণগণ, প্রতিপদাদি তিথিগণ, বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ, বেতালাদি দেবপুত্রগণ, এবং আর যেখানে যে দেবযোনি থাকেন, সকলেই আসুন সকলেই একত্রিত হইয়া একমনে এক তানে এই ভৃঙ্গারোদক তোমার শ্রী অঙ্গে পরিশেচন করুন।

পুণ্য প্রবাহিনীগণ! তোমরা তো ধন্য হইলে না! তোমাদের আশা তো মিটিলনা! আজ কেবল আমি এবং দেবঋষি প্রভৃতিই চরিতার্থ হইলাম। স্রোতস্বিনীগণ! তোমরা যাঁহার নিমিত্ত কত কষ্ট কত যাতনা সহ্য করিয়া সুদুরারোহ হিমালয় কৈলাসাদি গিরিশিখরে আরোহণ করিয়াছিলে, কত লতা, পাতা, কণ্টকাদি পরিকীর্ণ কন্দরে ভ্রমণ করিয়া যাঁহাকে অন্বেষণ করিয়াছিলে, যাঁহাকে না পাইয়া হতাশা হইয়া পুনর্ব্বার বারিধি পতির নিকট ফিরিয়া যাইতেছ, সেই মা, সেই যোগীঋষির দুরাধর্ষা দুর্গা, এই দরিদ্রের পূর্ণ কুটীরে শুভাগমণ করিয়াছেন। অতএব এইবার আইস। এইবার তোমাদের চিরসম্ভূত আশা পরিপূর্ণা কর। যে কামনায় তোমরা দেবরূপিনী হইয়াও দ্রবরূপিনী হইয়াছ, তাহা সফল কর। মায়ের পরম পাবন শ্রী অঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া ধন্যা হও, পবিত্রা হও, পাপিগণের পাপনাশিনী হও। আত্রেয়ী, ভারতী, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী,

সরযূ, সুপন্যা, গণ্ডকী, শ্বেতগঙ্গা, কৌষিকী, পাতালের ভোগবতী, স্বর্গের মন্দাকিনী সকলেই এই ভৃঙ্গারোদকে সমাবিষ্টা হইয়া এক তানে এক মনে অতি সাবধানে আমার মাকে স্নান করাইয়া দেন আমার এই সামান্য সলিল মায়ের স্নানের উপযুক্ত হইতেছে না। সিন্ধু, ভৈরব, শোণ প্রভৃতি যে সকল পুণ্য প্রবাহ পৃথিবীতে আছেন, সকলেই এই ভৃঙ্গারোদকে সমাবিষ্ট হইয়া এক তানে সাবধানে মায়ের অঙ্গ অভিষিক্ত করুন।

তক্ষকাদি যে সকল নাগগণ পাতাল তলে বাস করিতেছেন, তাঁহারা আমার সাদরাহ্বান শ্রবণ করুন। তাঁহারা আগমন করিয়া এক তানে এক মনে আমার মাকে এই ভৃঙ্গারোদকে অভিষিক্তা করুন।

মাগো! বোধ হয় ইহাতেও তোমার উপযুক্ত হইল না; হয়ত ইহাঁরাও তোমার পরম পাবন শ্রী অঙ্গ সংস্পর্শনের অধিকারী নহেন। তাহা হইলে তুমি নিজেই তোমার নিজকে পরিষিক্তা কর। মা তোমার অন্যান্য যে সকল শ্রী রূপ আছে, সেইরূপে আবির্ভূতা হইয়া এই ভৃঙ্গারোদক তোমার অঙ্গে নিগলিত কর। জগদ্ধাত্রী, চণ্ডেশ্বরী, চণ্ডা, বারাহী, কার্ত্তিকী, হরসিদ্ধা, শিবদূতী, ইন্দ্রানী, বৈষ্ণবী, ভদ্রকালী, বিশালাক্ষী, ভৈরবী, শিবাণী প্রভৃতি অন্যান্য শ্রী মূর্ত্তিগণ আসিয়া সানন্দহৃদয়ে তোমাকে অভিষিক্তা করুন।

মাগো! এই প্রথম কুম্ভে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর ব্যোমগঙ্গার সলিল পূর্ণ করিয়া তোমাকে স্নাপিতা করুন। দ্বিতীয় কলসে, মরুদগণ, মেঘসলিল পূর্ণ করিয়া তোমাকে স্নাপিতা করুন। তৃতীয় কলসে, সারস্বতাদিতোয় পরিপূরিত করিয়া বিদ্যাধরগণ অভিষেক করুন। চতুর্থ কলসে চতুঃসাগরোদক পরিপূর্ণ করিয়া লোকপাল, দেবগণ তোমায় অভিষেক করুন। পঞ্চম কলসে, পদ্মরেণু সুগন্ধিজল পরিপূর্ণ করিয়া নাগগণ তোমার অভিষেক করুন। মাগো হিমালয়ে অধিষ্ঠান কালে নির্ঝর সলিলে তো তুমি কত লীলা করিয়াছিলে। অতএব হিমবান্, হেমকূট প্রভৃতি গিরিগণ নির্ঝরোদক পরিপূর্ণ করিয়া ষষ্ঠ কলসে তোমার অভিষেক করুন। সপ্তম কুম্ভে সর্ব্ব তীর্থাম্বু পরিপূরিত করিয়া

ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং সপ্তর্ষিগণ তোমার অভিষেক করুন। বসুগণ অষ্টম কুম্ভে তোমায় অভিষিক্ত করুন। এবং সর্ব্বসৌভাগ্য সংযুক্ত অপ্সরাগণ নানা সুগন্ধি পরিপুরিত নবম কুম্ভের জলের দ্বারা তোমার অভিষেক করুন।"

মাগো! ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর তোমাকে স্নান করান, আর কৃষ্ণ, জগন্নাথ, বলরাম, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ ইহাঁরা তোমার আজ্ঞাবাহী হইয়া সশস্ত্রে দণ্ডায়মান থাকুন। ইন্দ্র, অগ্নি যম, নিঋতি, বরুণ, পবন, কুবের, ঈশান, ব্রহ্মা এবং অনন্ত এই দশদিক্‌পতি দশজন তোমার দশদিকে প্রহরী নিযুক্ত থাকুন। + + + + + + + +" ইত্যাদি আরও অনেক বাহুল্য এবং অনেক মন্ত্র তন্ত্র আছে। এই স্নান প্রকরণেই, বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণে অতি বৃহৎ প্রণালী প্রদর্শিতা হইয়াছে। এখন বলদেখি এইরূপ মন্ত্রাদির দ্বারা, শাস্ত্র, কি পুতুলের স্নান করাইতেছেন, অথবা সেই ত্রিতাপ হারিণী মাকেই অভিষেক করিতেছেন?

এইত হইল স্নান, অতঃপর, পূজা, উপহার এবং পূজা মন্ত্রাদিরও প্রত্যেক অক্ষরে ২ কেবল ত্রিভুবন জননী মাকেই দেখিতে পাইবে। পুতুলের সহিত তাহার কিছুমাত্র সংশ্লেষ হইতে পারে না। বিস্তার ভয়ে তাহা দেখাইলাম না। এখন পূজা সমাপ্তির পর কি বলিয়া মাকে বিসর্জ্জন করিতে হয় তাহার কিঞ্চিৎ বলিয়াই উপসংহার করিব।

"দুর্গাং শিবাং শান্তিকরীং ব্রহ্মাণীং ব্রহ্মণঃ প্রিয়াং।
সর্ব্বলোক প্রণেত্রীঞ্চ প্রণমামি সদাশিবাং ॥১॥
মঙ্গলাং শোভনাং শুদ্ধাং নিষ্কলাং পরমাং কলাং।
বিশ্বেশ্বরীং বিশ্বমাতাঞ্চ চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহং ॥২॥
সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং সর্ব্বরোগভয়াপহাম্।
ব্রহ্মেশ বিষ্ণু নমিতাং প্রণমামি সদা উমাং ॥৩॥
বিন্ধ্যস্থাং বিন্ধ্যনিলয়াং দিব্যস্থান নিবাসিনীং।
যোগিনীং যোগমাতাঞ্চৈব—চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহং ॥৪॥
ঈশান মাতরং দেবীং ঈশ্বরী মীশ্বর প্রিয়াং।
প্রণতোঽস্মি সদা দুর্গাং সংসারার্ণব তারিণীং ॥৫॥

+ + + + +

জন্মান্তর সহস্রেষু তির্য্যগযোনি গতেষুচ
পাপং ত্বং হরমেদেবি! জ্ঞানতোঽজ্ঞানতঃ কৃতং ॥
মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং মহেশ্বরী চ।
যৎপূজিতং ময়া দেবি! পরিপূর্ণং তদস্তুমে ॥
চন্দনেন সদালিপ্তে! কুঙ্কুমেন বিলেপিতে।
বিল্বপত্র কৃতাপীড়ে! রক্ষমাং শরণাগতম্ ॥
অনেক বিদ্বিষাং মধ্যে পতিতং পরমেশ্বরি।
ত্রাহিমাং বিজয়ে দুর্গে, দুর্গে! রক্ষ নমহস্তুতে ॥
শরণমসি সুরানাং সিদ্ধবিদ্যা ধরাণাং
মুনি মনুজ পশুনাং ব্যাধিভি পীড়িতানাম্।
নৃপতি গৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং
ত্বমসি শরণ মেকা দেবি! দুর্গে প্রসীদ ॥
দুর্গাশান্তিকরী নিত্যা গৌরী ত্রৈলোক্য মোহিনী।
বিশ্বস্থা বিশ্বরূপাচ রাক্ষসী রুধির প্রিয়া ॥
ভারতীচ মহাভাগা দেব রূপাচ পার্ব্বতী।
তেজঃ প্রভা সুরাণাঞ্চ অসুর ক্ষয় কারিণী ॥
পাসরী বিমলা সূক্ষ্মা ছায়া হিংসা ক্ষমা বলা।
কামেশ্বরী মহাদুর্গা খড়্গা হস্তা তপস্বিনী ॥

+ + + + +

রাজ্যং তস্য প্রতিষ্ঠাচ লক্ষ্মীস্তস্য সদাস্থিরা।
প্রভুত্বং তস্য সামর্থ্যং যস্যত্বং মস্তকোপরি ॥
কায়েন মনসা বাচা ত্বত্তোনান্যা গতির্ম্মম।
অন্তশ্চরসি ভূতানাং বিরিত্বং পরমেশ্বরী ॥

+ + + + +

নির্ব্বাচ্যো নির্গুণো বাপি সত্ত্বেন পরিবর্জ্জিতঃ।
পরং পৌরুষ মাপ্নোতি যাবত্বং মস্তকোপরি ॥

+ + + ×

অন্যযোনি সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং।
তেষুতেষচ্যুতা ভক্তিরচলাস্তু সদাত্বয়ি ॥

আবাহনং নজানামি নজানামি বিসর্জ্জনম্ ।
পূজাভাগং নজানামি ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরি ॥

\+ \+ \+ \+ \+ \+ \+

ভাঃ অঃ—মাগো ! তোর কৃপা কটাক্ষে আজ আমি কৃতার্থ হইলাম । আজ আমি ত্রিভুবনের ধন্য পাত্র হইলাম । মা ! আয়, একবার মনের মত তোকে প্রণাম করিয়া জন্ম সফল করি। তোরশ্রীপদ সরোরুহে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া দেহ চরিতার্থ করি। মাগো ! এই দুঃখিত সন্তানের প্রণাম গ্রহণ কর। অহোবত ! এ সংসারে আমিই ভাগ্যবান্ পুরুষ ! আজ আমি ব্রহ্মা বিষ্ণ্বাদির দুরারাধ্যা দুর্গাকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়া, সাক্ষাতে প্রণাম করিতেছি। আজ সাক্ষাৎ মঙ্গল রূপিনী শান্তিরূপিনী, ব্রহ্ম রূপিনী বেদগতি এবং সর্ব্বলোকের নিয়ন্ত্রী বা অন্তর্য্যামিনী সদা শিবাকে প্রণাম করিতেছি। আজ সেই সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যা, শুদ্ধ প্রকাশ রূপিনী, অখণ্ডা, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতিলয়ের অধিষ্ঠান স্বরূপা, বিশ্বের ঈশ্বরী, বিশ্বজননী চণ্ডিকাকে প্রণাম করিতেছি। আজ সর্ব্ব দেব দেবীময়ী, ত্রিতাপ ভয়হারিণী, সতত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের আরাধিতা উমাকে প্রণাম করিতেছি ! আজ সমস্ত জড় লোকের অতীত পরম ধাম নিবাসিনী, সেই বিন্ধ্যাচল প্রকাশিতা, আত্মারামা যোগমাতা চণ্ডিকাকে প্রণাম করিতেছি ! আজ সেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের প্রসবিত্রী, স্বপ্রকাশ রূপা, সর্ব্বৈশ্বর্য্য সমন্বিতা, বিরিঞ্চ্যাদি ঈশ্বরগণের ভক্তি সেবিতা ঘোরতর সংসার বারিধির নিস্তারিণী সর্ব্বদা সর্ব্বদুর্গতি বিনাশিনী মাকে সাক্ষাতে প্রণাম করিতেছি ! অতএব মাদৃশ ভাগ্যশালী পুরুষ ধরামণ্ডলে কে আছে ! মাগো ! ওমা ! এ নরাধম তোর নিতান্তই পাপময় সন্তান। অবিরল ধারা বাহী ক্রমে দারুণ পাপানুষ্ঠানের দ্বারা আমার দেহ, ইন্দ্রিয়, মন এবং আত্মাদি সমস্তই ভস্মীভূত হইতেছে ! আর তিষ্ঠীতে পারি না, নিদারুণ যাতনা আর সহ্য হয় না, আর প্রাণ রাখিতে পারি না ! নানা যোনিতে সহস্র সহস্র জন্মের জ্ঞানাজ্ঞানকৃত পাপাগ্নি পর্ব্বতায়মান হইয়া আমাকে দগ্ধ করিল। মাগো ! এইবার রক্ষা কর, তোর করুন দৃষ্টিরূপ সুধাবিন্দু বর্ষণ করিয়া পাপানল নির্ব্বাপিত কর।

ক্রমশঃ

১২৯৮ সাল। ষষ্ঠ বর্ষ। শ্রাবণ

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

লেখকগণ।

বিষয়।	নাম।		পৃষ্ঠা।
প্রতিমূর্ত্তিপূজা রহস্য।	শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি	...	১০১
কর্ত্তব্য।	শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র নাথ বিদ্যাবাগিশ স্মৃতি তীর্থ	...	১০৬
উপনিষদ্।	শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন শাস্ত্রী সরস্বতী	...	১১১
বিবাহ।	শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১১৮
হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারের শ্রেষ্ঠতা।	শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু তর্কবাগিশ		১২৬

Printed by Udoya Churan Pal, At the New Balmick Press,
159, Manicktolla Street, Calcutta.

ওয়েষ্ট এণ্ড ওয়াচ কোম্পানির চাবিশূন্য লেভার ঘড়িই সর্ব্বদা ব্যবহারের পক্ষেই উৎকৃষ্ট।

যদি কারুগিরিতে অথবা উপাদানে কোনরূপ দোষ লক্ষিত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া হয় অথবা বিনা ব্যয়ে মেরামত করিয়া দেওয়া হয়। তজ্জন্য সম্পূর্ণরূপে গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়।

১। যে হেতু আমাদের নির্ম্মিত ঘড়ি প্রত্যেক বৎসর মেরামত করিবার আবশ্যক হয় না।

২। যদি প্রকৃত যত্নের সহিত ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে এই একটী ঘড়িতে জীবন কাটিয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত প্রকারে ঘড়ি সকল ভারতবর্ষের সকল ঘড়ি বিক্রেতার নিকট অথবা ওয়েষ্ট এণ্ড কোম্পানির এজেণ্ট গণের নিকট পাওয়া যায়।

ওয়েষ্ট এণ্ড কোম্পানির চাবিশূন্য ক্যাম্পের) অর্থাৎ মাঝারি সাইজ), সিভিল (অর্থাৎ ছোট সাইজ) ঘড়ি যাহার জন্য তিন বৎসরও গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়।

ওপেন্ ফেস (অর্থাৎ আবরণ বিহীন) নিকল রৌপ্যকেস ১৮৷৷৹ খাঁটিরূপারকেস্ ৩০৷৷ হণ্টি (আবরণ সহিত) ২০৲ " ৩৩৹৷৷ হাপহণ্টি (অর্দ্ধ আবরণ সহিত) " ২১৷৹ " ৩৫৷৷৹

ওয়েষ্ট এণ্ড কোম্পানির গাড ঘড়ি বড় সাইজ, ষ্ট্যান্‌ডার্ড কোয়ালিটী, ছয় বৎসরের গ্যারাণ্টি। নিকল রৌপ্যকেস২৫৲ খাঁটি রৌপ্যকেস ৪০।

এম্পিরিয়াল কোয়ালিটি তিন বৎসরের গ্যারাণ্টি। নিকলরৌপ্যকেস ২০৲ ওয়েষ্ট এণ্ড ওয়াচ, কোম্পানির কেলেণ্ডর ওয়াচ, অপরাপর সাধারণ ঘড়িরন্যায় সময় প্রদান ব্যতীত ইহাতে সাপ্তাহিক দিন এবং মাসের তারিখে দেওয়া আছে (বড় এবং মাঝারি সাইজ) ওপেনফেস ২৫৲ হণ্টিং (আবরণ সহিত)

ওয়েষ্ট এণ্ড ওয়াচ কোম্পানির ক্যাম্পেন ফুলপ্লেট ঘড়ি (মাঝারি, সাইজ) পতাতি নির্ম্মিত হেয়ারস্প্রীং দ্বারা উপযুক্তরূপে প্রস্তুত বলিয়া বর্ষাকালে মড়িচা ধরিবার অথবা ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভব নাই। ছয় বৎসরের গ্যারাণ্টি-দেওয়া হয়।

ওপেনফেস (অর্থাৎ আবরণ শূন্য খাঁটি রৌপ্য কেস্ ৪০৲ ওনিকন ২৫৲ "বার্ণা"—নিকলরূপার আশ্চর্য্য ধরণের চাবিশূন্য লেভার ঘড়ি যাহার মূল্য কেবলমাত্র ১২৷৷৹ বারটাকা বার আনা মাত্র।

ভয়ানক অনুকরণ কাণ্ড হইতেছে সাবধান। আবেদনকারীকে বিশেষ বিবরণের সহিত সচিত্র মূল্য নিরূপণ পত্র বিনামূল্যে দেওয়া যায়। ওয়েষ্ট এণ্ড ওয়াচ মেনুফেকচারিং কোম্পানির এজেণ্টগণ তাহাদের দায়িত্বে ভারতবর্ষে ও এপ্রদেশের সকল স্থানে ভেলুপেয়েবেল পার্শ্বেলে পাঠাইয়া থাকেন।

১২ নং লালবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা, ওয়েষ্ট এণ্ড ওয়াচ কোম্পানি ২৯ নং চার্চ গেট ষ্ট্রীট বোম্বাই সহর।

ষষ্ঠ বর্ষ।

ষষ্ঠ ভাগ। শ্রাবণ সন ১২৯৮ সাল। ৪র্থ খণ্ড।

দেবি! প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতে র্নিত্যং যথা সুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানি সর্ব্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু, উৎপাত পাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্॥

প্রতিমূর্ত্তি পূজা রহস্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

মাগো! আমি তোর, নিতান্ত দীন হীন, অজ্ঞানান্ধ অনুপযুক্ত তনয়। উপযুক্ত সপর্য্যা করিয়া যে, তোর পরিতুষ্টি সাধন করিতে পারি, এমন ক্ষমতা নাই। আমার কৃত পরিচর্য্যাতে তোর সেই নিজ মুখ-পঙ্কজ-ক্ষারিত সুধারূপ বিশুদ্ধ বেদমন্ত্র নাই, যথাবিধি ক্রিয়াও নাই। তৎপর, হৃদয় ও দম্ভাদি মহাপাপে মলিন। সুতরাং কোনরূপ দৈন্যাদি বোধ নাই, তোর প্রতি প্রকৃত অনুরাগ ও নাই। তবে আর কেমন করিয়া এই পূজা তোর পরিতোষাবহা হইবে। কেমন করিয়াই বা আমি তোর করুণা-ভাজন হইব। আর কিরূপেই বা আমার এই নিদারুণ পাপাগ্নি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে। তবে তুই নিজগুণে যদি সমস্ত অভাব পরিপূর্ণ করিস, তবেই আমি নিস্তার পাইতে পারি। নতুবা আর অণুমাত্র আশা ভরসা নাই।

মাগো! তোর আচার ব্যবহার দেখিয়া তোর স্বাভাবিক দয়ার প্রতি কিছু আশা সঞ্চারিতা হয়। মা! তোর ঐ শ্রীঅংঙ্গে চন্দন চর্চা, কুঙ্কুম লেপন, এবং মস্তকোপরি বিল্বপত্রের মালা দেখিয়া হৃদয় আশ্বস্ত হইতেছে। বনের অচেতন উদ্ভিজ্জ তোর কখনো কোনরূপ আরাধনাদি করে নাই, অথচ তাহাকেতই এত পবিত্র গন্ধাদিগুণযুক্ত করিয়াছিস যে, উহা সমস্ত দেবর্ষিগন্ধর্ব্বগণের পরমাদরের দ্রব্য হইয়াছে, এমন কি তোর ঐ দেব দুর্দ্ধর্ষ শ্রীঅঙ্গ ও স্পর্শ করিতেছে। ঐরূপ বন্যবৃক্ষ বিল্বপত্র তোর দেবাধৃষ্য কেশপাশে সজ্জিত রহিয়াছে, অতএব আর নিগুর্ণ, অতিনীচ হইলেও সে তোর স্বাভাবিক করুণাভাজন হইবে, ইহা অসম্ভব নহে। মাগো! আমার তুই বিনে আর কেহই নাই। আমি একমাত্র তোরেই শরণাপন্ন অনাথ তনয়। আমাকে পরিত্রাণ কর। মাগো! পরমেশ্বরি! দুর্গে! তুইতো সকলেরই অন্তস্তত্ত্বও সুবিদিতা আছিস। এই দেখ, আমি অতি ভয়াবহ বহুতর শত্রু মধ্যে নিপতিত। তুই ব্যতীত আমার আর নিস্তারের আশা নাই। মা! দুর্গম বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিস বলিয়াই তুই দুর্গা। অতএব আমাকে এই অতি দুর্গম অরিপরাজয় হইতে পরিত্রাণ কর। মাগো! তোকে ভূয়োভূয় প্রণাম, আমাকে পরিত্রাণ কর!

মাগো! কি দেব, কি সিদ্ধ, কি বিদ্যাধর, কি যোগী ঋষি মনুষ্য, কি পশু পতঙ্গাদি প্রাণীগণ সকলেরই বিপদ্‌কালের পরম গতি, পরম শরণ তুই, তুই ব্যতীত আর কেহই কেহকে রক্ষা করিতে পারে না। প্রাণিগণ আধিব্যাধি প্রপীড়িত হইয়া তোকে ডাকিলে তুইই রক্ষা করিয়া থাকিস, রাজার আক্রমণ হইতেও তুইই পরিত্রাণ করিস এবং নির্জ্জন অকূল চত্বরে দস্যুর হস্ত হইতেও তুই রক্ষা করিতে সমর্থা, তাই বলি মা! আমি একাই সর্ব্বাপদ্‌গ্রস্ত, অতএব দুর্গে! আমার প্রতি প্রসন্না হও।

মাগো! এই ত্রিভুবনে তুই ব্যতীত কাহারো স্বতন্ত্রভাবে সকল ক্রিয়া দেখিতে পাই না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি নিখিল দেবগণ হইতে তৃণ কীট পর্য্যন্ত প্রাণী এবং অচেতন জগতে তোকে বাদ দিয়া স্বাধীনরূপে কাহারো কোন ক্রিয়া হইতে পারে না। তুইই নানাকারে নানাধারে অবস্থিতি করিয়া সংসারের ভাল, মন্দ, মধ্যম সমস্ত কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতে-

ছিস। মা! তুই দুর্গারূপে যোগি ঋষিগণের সুপবিত্র হৃদয়-ক্ষেত্রে পরম শান্তি সুধা বিতরণ করিতেছিস। আবার গৌরীরূপে এই ত্রৈলোক্যকে বিমুগ্ধ করিতেছিস। এবং অতি নিদারুণ চামুণ্ডাদিরূপে দুরাত্মাগণের রুধির পান করিয়া থাকিস। মা! তুই নিত্যা, তুই ত্রৈলোক্য পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছিস, আবার ত্রৈলোক্য তোর হইতে বিভিন্ন কিছু নহে। মা, তুই বাক্যরূপিণী, তুই সর্ব্বৈশ্বর্য্যবতী, ব্রহ্মা বিষ্ণু, রুদ্রাদি দেবগণ তোরই রূপান্তরমাত্র। অথচ তুই পর্ব্বত দুহিতা। সমস্ত দেবগণের বল, শক্তি এবং চৈতন্যও তুই, বিষ্ণ্বাদি দেবগণ কর্ত্তৃক যে অসুরগণ নিহত হইয়াছে, তাহার মূল প্রেরয়িত্রী তুই। মাগো! তুই ঘোর রজঃ তমোগুণান্বিতা আবার বিশুদ্ধ সত্ত্বময়ীও তুই, গুণাতীতাও তুই। মা, তুই সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতরা। তুইই আভাসরূপী জীবরূপে বিচরণ করিতেছিস। মা, তুই ক্ষমা, তুইই হিংসা, আবার বলরূপিণীও তুই। তুই সৃষ্টি শক্তির অধিষ্ঠাত্রী, তুই দর্পরূপিণী, তুই খড়্গহস্তা আবার সর্ব্ববিষয়ে উদাসীনা তপস্বিনীও তুই। অতএব তুই যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিস, আমি তুই ব্যতীত কাহার শরণাপন্না হইব? ইচ্ছা হয় নিজগুণে এ অধম তনয়কে পরিত্রাণ করিবি, না হয় ঘোর কুম্ভীপাকে নিক্ষিপ্ত করিবি, আমি কখনও তোকে পরিত্যাগ করিব না।

যে ব্যক্তি তোর শরণ লইতে পারে, সেই এ জগতে ধন্য, সেই জগতের শরণ্য। মা, তুই যাঁহার সহস্রারে প্রকাশিতা হইস, তুই যাঁহাকে প্রসন্না হইস, তাঁহাকে আর কোন সম্পদ্ বা সম্পদ-দাতার উপাসনা করিতে হয় না। তাঁহারা আপনা হইতেই তোর সেবকের সেবা করিতে থাকেন। রাজ্য তাঁহার পদানত হয়, প্রতিষ্ঠা তাহার আরাধনা করেন, লক্ষ্মী সেখানে স্থিরা হইয়া থাকেন, প্রভুত্ব এবং বল সামর্থ্যাদি তাঁহার অনুগামী হয়। অতএব তোকে পরিত্যাগ করিয়া কাহার নিকট যাইব?

মাগো! ওমা। তুইতো সর্ব্বভূতের নিয়ন্ত্রীরূপে সকলের অন্তরে বিচরণ করিতেছিস। তুইতো সমস্তই প্রত্যক্ষ করিতেছিস! মা, আমি মিথ্যা বলিতেছি না, এই দেখ, আমার অভ্যন্তরে একবার দৃষ্টি পাত কর, এই দেখ, আমার কায়মনোবাক্য সমস্তই তোর শ্রীপদে সমর্পিত হইয়াছে।

আমি সর্ব্বদা তোর শরণাপন্ন। আমার হৃদয়, মন, আত্মা ও দেহাদি তুই ব্যতীত আর কিছুই বুঝে না, আর কিছুই মানে না। অতএব ইচ্ছা হইলে পরিত্রাণ করিবি, না হয় যাতনা-সমুদ্রের অতল জলে নিক্ষিপ্ত করিবি, আমার মন প্রাণ তুই ব্যতীত আর কাহারো নিকট যাইবে না।

মাগো! তুই প্রসন্না থাকিলে, তুই মস্তকের উপরে থাকিলে, তাহার কিনা হইতে পারে? অতি নিন্দিত, অতি নিগুর্ণ, অতীব সত্ত্ববিবর্জ্জিত নর পশু হইলেও তোর কৃপাবলে সে নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ করিতে পারে। অতএব তোকে পরিত্যাগ করিয়া আমি কাহার নিকট যাইব?

যাহাই হউক, আমার পাপমুক্তি আপদমুক্তি করিতে যদি তোর ইচ্ছা না হয়, তবে না করিলি, তাহাতেও আমার বিশেষ আপত্তি নাই। আমাকে ঘোর নরকে নিক্ষেপ করিয়া যদি তোর তৃপ্তি বোধ হয়, তাহাই করিস। ম্লেচ্ছ, চণ্ডাল, শৌণ্ডিকাদি হইতে বিষ্ঠা কৃমি, বা আমাকে তৃণগুচ্ছ করিয়া যদি তোর আনন্দ হয়, তাহাতেও সম্মত আছি। তোর যত কষ্ট, যত যাতনা দিতে অভিপ্রায় হয়, তাহাই দিবি, সমস্তই সহ্য করিতে পারিব। কিন্তু মা! মাগো! ওমা! এ কাতরের, এ অনাথের এ দুঃখী তনয়ের শেষ কথা যেন মনে থাকে। মা, তোর চরণপ্রান্তে অষ্টাঙ্গ লুণ্ঠিত করিয়া বলিতেছি, শেষ কথাটা যেন মনে থাকে। আমি আপন কুকর্ম্ম বিপাকে কৃমি কীটাদি যে কোন তির্য্যগ্ যোনিতে পরিভ্রমণ করি, কিম্বা কুম্ভীপাকে, রৌরব, মহারৌরব প্রভৃতি যে কোন নরকাগারে অবস্থিতি করি, সেই স্থানেই যেন তোর প্রতি অবিচলিত, অক্ষীণ ভালবাসা থাকে, যেন তোর প্রতি অনুরাগ থাকে, তোকে যেন সর্ব্বদাই মনে মনে দর্শন করিতে পাই, এক নিমেষের কোট্যংশের নিমিত্তও তোকে বিস্মৃত না হই, ইহাই শেষ প্রার্থনা। মাগো! ওমা! আমি তোকে না দেখিতে পাইলে, পৃথিবীর সাম্রাজ্যকে পূতি পুরীষকূপ মনে করি, কুবেরত্ব, ইন্দ্রত্বকে দাসত্ব মনে করি। এমন কি—ব্রহ্ম লোক, বৈকুণ্ঠ এবং কৈলাস ধামকেও নরক যাতনাময় মনে করি। তোকে না দেখিয়া সুধাপানকে বিষপান বিবেচনা করি। মাগো! অধিক কি বলিব, তোকে না দেখিলে মুক্তিকেও আমি ঘোরতর বন্ধনরূপে বিবেচনা করি। অতএব তোর অদর্শনই

আমার ঘোরতর যন্ত্রণানল, আর তোমাকে অনুভব করাই আমার আনন্দময়ী মুক্তি। তাই বলি মা! আমি মুক্তিত বুঝিনা, স্বর্গও চাই না, নরকে ভীত হই না। তাহাতে যেমন ইচ্ছা থাকে হউক, কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু মা! যেখানে যাই, সেই খানেই তোর ভালবাসা থাকে, জীবের অস্তিত্ব যতদিন থাকিবে, ততদিনই তোর প্রতি অচল অনুরাগ থাকে। তোকে যেন হৃদয় পটে দর্শন করিতে পাই। ইহাই আমার শেষ কথা। মাগো! আমি তোর আবাহনও জানি না, বিসর্জ্জনও জানি না, পূজার বিভাগাদিও অবগত, নহি, যে তদ্দ্বারা তোর পরিতুষ্টি করিব। আমার দেহ, আত্মা, মন, প্রাণ, সমস্ত তোর শ্রীপদে সমর্পণ করিয়া শরণ লইলাম, এখন তোর যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিস।" + + + + এইরূপ অর্থপ্রকাশক আরও বহুতর কথা বার্ত্তা লিখিত আছে। বিস্তার ভয়ে তাহা উপেক্ষা করিয়াছি।

এইত হইল দুর্গা পূজার আদ্যন্তে শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রাবলী। এই সকল মন্ত্রাদি পাঠ করিয়াই সকলে দুর্গা পূজা করেন। এখন তোমার কিরূপ বিবেচনা হয়। শাস্ত্রকি এই সকল মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া এইরূপ প্রণালীতে পুতুলের পূজা করিতে, উপদেশ দিয়াছেন, অথবা আমরা যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি সেইরূপ, মায়েরই আরাধনা মনে করিয়াছেন?

শিষ্য।—ঠাকুর! আমি কৃতার্থ হইলাম, আপনার কৃপাবলোকনে আমার হৃদয়স্থ গাঢ়তর অন্ধকার বিদূরিত হইল। আমি ভ্রান্ত হইয়া আপনাকে নানারূপ বিরক্ত করিয়াছি। প্রভো! আপনি প্রসন্ন হউন, আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন। আমি যেন মায়ের ঐরূপ পূজা করিতে পারি। গুরুদেব! আমরা যে এই সকল আপত্তি করি, তাহাতে আমাদিগের বড় অধিক অপরাধ নাই। আজ কাল যেরূপ পূজা প্রণালী চলিতেছে, তাহা আপনিই সবিশেষ অবগত আছেন। যাহারা নিজে কখনও কিছু না করিয়া কেবল তাহাই দেখে, তাহাকেই শাস্ত্রোক্ত প্রকৃত পূজা বলিয়া মনে করে, তাহারা বোধ হয় নিশ্চয়ই আমার মত সন্দিহান হইবে। সেই জন্যই আপনাদিগকে বিরক্ত করিতে হয়। অতএব ক্ষমা প্রার্থনা করি। শ্রীশশধর শর্ম্মা।

কর্ত্তব্য।

মৎস্যাদি শূন্য স্থালীতে বিড়াল লম্ফ প্রদান করিয়া পতনোন্মুখ হইলে মানুষ হেই হেই করে, পাছে হাঁড়ীটী চুরমার হইলে সাধের মৎস্য ভক্ষণ জনিত তৃপ্তির ব্যাঘাত ও শরীরের পুষ্টিলাভে বঞ্চিত হয়। শরীরের অপোষণে, আত্মার অতর্পণে শরীর ধ্বংস হইতে পারে। তখন দহ্যাভাবে অগ্নিবৎ আমার আমিটুকু লুপ্ত হইবে, এই পরম মঙ্গলময় ধারণায় শরীরে যত্ন, মৎস্যাদি আহার্য্যে যত্ন, স্থালীতে যত্ন, আবার স্থালীর জন্য উননাদিতে যত্ন। এইরূপ ওতপ্রোতভাবে জগতে সমস্ত বস্তুই প্রায় আমাদের যত্নের ধন ও প্রিয়বস্তু। কোন বস্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রিয়, কোন বস্তু পরম্পরা সম্বন্ধে প্রিয়। যে বস্তুর সহিত যত নিকট সম্বন্ধ, সেই বস্তুতে তত বেশী প্রিয়ত্ব ও প্রণয়ত্ব আছে। ফলকথা আমার আমির জন্য সমস্ত বস্তুই আমার প্রিয়, যত্নের ধন, প্রয়োজনীয় ও অভিষ্ট ফলপ্রদ। প্রিয়প্রিয়াদির সম্যক্ নিরূপণ শক্তি না থাকায় অপ্রিয়াদিও প্রিয়াদি বলিয়া প্রতিভাত এবং প্রিয়াদিও অপ্রিয়াদির আকারে বিভীষিকা প্রদর্শন করে। সে ভেল্‌কিতে যে পড়ে, সে ভেল্‌কি না ভাঙ্গিলে বুঝিতে পারে না।

বারস্ত্রীর তীব্র পদাঘাতে, শেলসম বাক্যবাণেও তাহার পদলেহন করি। কেন?—তাহাতে আমার সুখ হয় বলিয়া। আপনি না খাইয়া পুত্রকে উপাদেয় বস্তু প্রদান করি। কেন!—পুত্রের সুখে আমার সুখ সম্পাদিত হয় বলিয়া। প্রযত্ন সঞ্চিত অর্থে পরিবার বর্গের জঠর জ্বালা ও লজ্জা নিবারণ করি। কেন?—তাহাতে আমার ঐহিক পারত্রিক সুখ সাধিত হয় বলিয়া। এবং তাহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করি। কেন?—তাহাদের মঙ্গল হইলে আমার মঙ্গল হইবে বলিয়া। গ্রাম্য স্বজাতীর উন্নতির চেষ্টা কায়মনোবাক্যে করি। কেন?—তাহাদের উন্নতির ছায়ায় আমার তাপিত প্রাণ শীতল হইতে পারে বলিয়া। অন্ততঃ তাহাদের কন্যা পুত্রের বিবাহে এক সাঁজ দগ্ধোদরের ষোড়শোপচারে অর্চ্চনা করিতে পারিব বলিয়া। এইরূপে ক্রমে অন্তরঙ্গ হইতে বহিরঙ্গের মঙ্গল

কামনা করিয়া থাকি। যেমন একটী তুফানে কুলোত্থিত সামুদ্রিক তরঙ্গকুল আকুলভাবে স্তরে ২ ক্রমশঃ প্রসৃত হইয়া সসীমাবস্থা হইতে অসীমাবস্থায় পরিণত হয়, সেইরূপ মঙ্গল কামনাও সসীমাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া অসীমাবস্থায় অভিমুখী হয়। সঙ্কীর্ণমনার মঙ্গল কামনা অতি সঙ্কীর্ণ,—আত্মীয় কার্য্যে পর্য্যবসিত বা পরিবারবর্গ পরিবেষ্টিত। উন্নত-মনার মঙ্গলকামনা স্বদেশ বিস্তৃত। যিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী, যোগী তাঁহার মঙ্গলকামনা জগৎ ব্যাপ্ত, অথবা জগৎ সম্বদ্ধ, সেই ব্রহ্ম পদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বস্তুতঃ তাঁহাদের কথা আমাদের অনালোচ্য।

জগতের সমস্ত বস্তু পৃথিবীর কেন্দ্রিয় আকর্ষণে আকৃষ্ট। যে বস্তুর সমদ্ধ যত ঘনিষ্ঠ,তাহার আকর্ষণ তত বলিষ্ঠ। শূন্যে যষ্টিখণ্ড ধরিয়া রাখিয়াছি। পৃথিবীতে পতিত হইতে দিতেছি না। এখানে পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি আমার শারীরিক শক্তির নিকট পরাস্ত। অস্বাভাবিকে স্বাভাবিক ক্রিয়ার লোপ। সেইরূপ নিজের মঙ্গল কামনায় পরিবারবর্গ, সজাতি, স্বগ্রাম এবং স্বদেশ ইত্যাদি আকৃষ্ট। যে ব্যক্তি যত অন্তরঙ্গ, তাহার আকর্ষণ তত সন্নিকৃষ্ট, বহিরঙ্গের আকর্ষণ বিপ্রকৃষ্ট। বুভুক্ষিতের পরিবারবর্গও স্বজাতি ইত্যাদি উপেক্ষা করিয়া আয়র্লণ্ডের দরিদ্র ফণ্ডে দাতৃত্ব প্রদর্শন অস্বাভাবিক কার্য্য। এরূপ পরোপকারী আত্মদ্রোহীর মধ্যে গণ্য; কেননা পরিবারাদির মঙ্গলে অচিরে আত্ম মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, তদভাবে আত্মাবনতির সম্ভাবনা সমধিক বেশী।

ফলকথা, জগতে সকলেই আত্মোপকারী। "অমুক বড় পরপোকারী" ইহার অর্থ আদর্শগত প্রতিবিম্ববৎ প্রতিকূলদিকে প্রতিফলিত। অমুক বড় পরপোকারীর অর্থ অমুক বড় চতুরভাবে আত্মোপকারক। সকলেই আত্মোপকারের জন্য লালায়িত, কেহ কাহারও উপকার করে না, তাই বেদে আছে

"নবৈ পত্নী পত্যুঃ কামায় বর্ত্ততে আত্মনস্ত কামায়,"

পতিগত প্রাণা পত্নিও পতির ইষ্টসিদ্ধির জন্য কোন কার্য্য করেন না। আপনার ইষ্টসিদ্ধিই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। যেমন আমিক্ষা (ছানা) প্রস্তুত করিতে হইলে বাজিন (ছানার জল) প্রস্তুত প্রসঙ্গাধীন সিদ্ধ হয়।

সেইরূপ পত্নীর আপনার ইষ্টসিদ্ধ করিতে হইলে প্রসঙ্গতঃ পতির ইষ্টসিদ্ধ করিতে হয়। তাই পত্নী পতি আর্ত্ত হইলে আর্ত্তা হন, হৃষ্ট হইলে হৃষ্টা হন, বিদেশস্থ হইলে মলিনা ও কৃশা হইয়া পড়েন। অবশেষে পতির মরণে বিয়োগাসহিষ্ণু হইয়া স্বীয় পাতিব্রত্যব্রত প্রতিপালন করেন।

পরাপকার সাধক আত্মোপকার নিকৃষ্ট—সাধুজনের বিগর্হিত। পর-নিরপেক্ষ আত্মোপকার মধ্যম। এবং পরোপকারাধীন আত্মপোকার উৎকৃষ্ট। পাতঞ্জল দর্শনে আছে।

"মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্য-
বিষয়ানাং ভাবনা তচ্চিত্তপ্রসাদনম্॥"

সহজে চিত্ত প্রসন্ন করার কয়েকটি উপায় বলিয়া দিতেছেন। পরের সুখ সমৃদ্ধি দেখিয়া মাৎসর্য্য পরবশ না হইয়া তাহাতে সহানুভূতি করিলে চিত্ত প্রসন্ন হয়। পরের দুঃখ উপস্থিত হইলে হর্ষ প্রকাশ না করিয়া দুঃখিত হইলে চিত্ত প্রসাদ হয়। পরে যদি পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহা হইলে অসূয়া পরবশ হইয়া মনের গরমে তুষানল সন্তাপ অনুভব করিও না; প্রত্যুত যদি নিরতিশয় হর্ষ প্রকাশ কর, তবে তোমার চিত্ত প্রসন্নতা লাভ করিবে। আর যদি পরে পাপকার্য্য অনুষ্ঠান করে, তবে তাহার অনুকরণ করিও না। সেই নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিও না; প্রত্যুত সেই পাপকার্য্য উপেক্ষা করিলে চিত্ত প্রসন্ন হইবে।

পিতলে স্বর্ণের গিল্‌টি করিলে উপরটি চাকচিক্যময় স্বর্ণের মত দেখায় বটে, কিন্তু ভিতরে যে পিতল সেই পিতল। পরোপকার কথাটি সেইরূপ বাহ্যাভ্যন্তরীণ পদার্থ দ্বয়ে মিশ্রিত। আত্মোপকার পরোপকার দ্বারা গিল্‌টি করা। বাহিরে দেখিতে অতি সুন্দর, ভ্রম প্রদর্শক পরোপকার, সেইরঙে রঞ্জিত ভিতরে ঘোর আত্মোপকার। এইরূপ আত্মোপকার কর্ত্তব্যপ্রিয়ের কর্ত্তব্য। অতএব ভাই, যদি কর্ত্তব্যপ্রিয় হও, তবে এইরূপ আত্মোপকারে সর্ব্বদা ব্রতী হও।

তুমি মহাজন ধারণায় যে মহাপুরুষগণের অবদান অনুসরণ কর, যাঁহাদের চাকরীকে উৎকর্ষকরী ধারণা কর, যাহাদিগকে সভ্য বলিয়া মনে কর, যাহাদের আচার ব্যবহারকে আদর্শস্থানীয় মনে কর,

সেই মহাপুরুষপুঙ্গবগণের প্রতি সাভিনিবেশে দৃষ্টিপাত কর, তাঁহারা কেমন স্বার্থকে পরার্থ রঙে রঞ্জিত করেন! সেই গিলটির রঙে আজ জগৎ স্তব্ধ।

একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা রাজবংশীয়দিগের আত্মোপকার এবং স্বদেশ প্রিয়তা বা কর্ত্তব্যপ্রিয়তা প্রদর্শন করিতেছি। মনে কর, আমরা পয়সায় ২টি দেসেলায়ের বাক্স খরিদ করি। দোকানদার অবশ্যই দুটার স্থানে তিনটী দেসেলায় খরিদ করে। হাউস আওলার অন্ততঃ ২টার স্থানে ৪টী খরিদ করিতে না পারিলে আর ব্যবসায় চলে না।

এইরূপে ক্রমশঃ সস্তা হইতে চলিল। অথচ মূল ব্যবসায়ী আবিষ্কারকের অল্প মূল্যে বিক্রয় করায় তাহার পোষায় না। অধিক মূল্য হইলে আমরা খরিদ করিতে পারি না। অথচ সেই ব্যবসায়ীগণ অগ্নি সাপেক্ষ দেশেলায় ব্যবহারী ভারতবাসীর দুঃখে অতি কাতর। তাঁহারা প্রাণ নিরপেক্ষে এইরূপ পরোপকার করিয়া থাকেন। অগত্যা মূল ব্যবসায়ী লক্ষ মুদ্রায় দেশেলায়ের স্বত্ব বিক্রয় করিলেন। স্বত্বটিতে একজন তাহার স্বামী হইল। সেই ১৲ টাকায় স্বামী ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা লইয়া ভারতের উপকারার্থে দেশেলাই বিক্রয় করিলেন। তাহারও বিলক্ষণ লাভ হইল, মূল ব্যবসায়ীর ও অক্ষত ভাবে ব্যবসায় চলিতে লাগিল দেশের টাকা দেশে থাকিল, বিদেশের টাকা দেশে আসিল। কি চমৎকার কর্ত্তব্যপ্রিয়তা কি চমৎকার পরার্থরঙে আত্মোপকার।

আমরা ইঙ্গরেজি পড়িতেছি ইঙ্গরেজি নীতির আলোচনা করিতেছি, অথচ আমরা ইঙ্গরেজ সদৃশ স্বার্থসাধনে উৎসাহ শূন্য কেন? ইহার কারণ সহজেই বুঝিতে পারা যায়। মনে করুন, অসংস্পৃষ্টরূপে একস্থানে একদলা মৃত্তিকাও কিঞ্চিৎ জল আছে। জলের ইচ্ছা, মৃত্তিকাকে জলীয় ভাবে পরিণত করে, মৃত্তিকার ইচ্ছা জলকে পার্থিব ভাবে পরিবর্ত্তিত করে। উভয়ের প্রবল দ্বন্দ; কিন্তু প্রবলের নিকট দুর্ব্বলের পরাজয় স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং যদি জল প্রবল হয়, তবে মৃত্তিকা জলাধীন হইয়া কর্দ্দম হইবে। আর যদি মৃত্তিকার অংশ বেশী হয়, তবে জলকে শোষিত করিয়া পার্থিবাকারে পরিবর্ত্তন করিবে। এইরূপ সর্ব্বত্রই প্রবলের

জয় দুর্ব্বলের পরাজয়। আমাদের হৃদয়ে প্রবল দুর্দ্দম্য বিলাস প্রিয়তাশক্তি এবং দুর্ব্বল কর্ত্তব্যপ্রিয়তাশক্তি আছে। প্রবল বিলাস প্রিয়তার নিকট দুর্ব্বল কর্ত্তব্যপ্রিয়তা পরাজিত। অনুকরণকালে দুই শক্তির প্রবল দ্বন্দ্বের পর বিলাস প্রিয়তার জয় হয়। তাই আমরা ইংলণ্ডে কৃষকের ও কর্ম্মকারের কাজ শিখিতে গিয়াও, হাব ভাব, বিলাসে অবিকল সাহেব হইয়া বসি। শিখিতে যাই এক, হইয়া পড়ে আর। যতদিন কর্ত্তব্যপ্রিয়তা না শিখিতেছি, তত দিন আমাদের অধঃপতন অনিবার্য্য।

কর্ত্তব্যপ্রিয়তা আত্মোপকার ইত্যাদি সদ্গুণ শিখিতে সাগর পারে তোমার যাইতে হইবে না। দৈনন্দিন ক্রিয়া কলাপের শিক্ষাগুরু শাস্ত্র উপদেশোন্মুখ হইয়া তোমার সম্মুখে অবস্থান করিতেছে, তাঁহার শাসনে শাসিত হইলে আর তোমার শিক্ষার জন্য কাহারও অপেক্ষা করিতে হইবে না। আজকাল তুমি যে লিবারপুলের লবণে তৃপ্তিলাভ করিতেছ, গবাস্থি উদরসাৎ করিয়া শাস্ত্রের অনাদর পূর্ব্বক অধঃপতিত হইতেছ, স্বজাতি উন্নতিসাপেক্ষ স্বীয় উন্নতি হইতে বঞ্চিত হইয়া নির্ধন হইতেছ; সেই লবণ সম্বন্ধে তোমার বৈদ্যক শাস্ত্র ও ধর্ম্ম শাস্ত্রের কি মত একবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা উচিত। লবণের মধ্যে সৈন্ধবই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

'সৈন্ধবং লবণং স্বাদু দীপনংপাচনং লঘু।
স্নিগ্ধং রুচ্যং হিমং বৃষং সূক্ষ্মনেত্রং ত্রিদোষজিৎ।'

ভাব প্রকাশ

একাধারে এত গুণ কোন লবণে নাই। করকচ লবণে ইহা অপেক্ষা অল্প গুণ, অথচ অন্যান্য লবণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাই কথিত আছে "লবণে সৈন্ধবসামুদ্রে"—লবণের মধ্যে সৈন্ধব ও সামুদ্র অর্থাৎ করকচ লবণ ব্যবহার করিবে, অন্য লবণ ব্যবহার করিবে না। অপিচ সৈন্ধব ও করকচের গুণ যখন নিশ্চিত, তখন অনিশ্চিত গুণ লিবারপুলের লবণ সেবন করিয়া শরীরের, ধর্ম্মের ও দেশের অবনতি কেন সাধন করি?

অপিচ ভাব প্রকাশে স্বভাবতঃ অহিতকর বস্তুর পর্য্যায়স্থলে লিখিত হইয়াছে। "লবণেষ্বৌষরং তথা" অর্থাৎ লবণের মধ্যে কেবল ঔষর

লবণ স্বভাবতঃ অহিত কর, কদাচ ব্যবহার করিবে না, লিবারপুলের লবণ "ঔষর" পদবাচ্য হইতে পারে কেন না ঐ লবণ উষর অর্থাৎ ক্ষার ভুমি জাত।

শরীরে যে বস্তুর অভাব হয়, আহারে সেই অভাব দূর হয়। অতএব শারীর গত লবণাংশের সামঞ্জস্য সংস্থাপনের জন্য লবণ ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। বংশপরম্পরাগত গো-খাদকের শরীরে গবাণু সুক্ষ্মভাবে অবস্থান করে; কেননা সেই গবাণু ধাতুরূপে পরিণত হয়; সুতরাং গবাস্থি শোধিত লবণ তাহাদের উপকারক হইতে পারে, কিন্তু আমাদের যে অপকারক তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ সৈন্ধব লবণের মূল্য অপেক্ষাকৃত বেশী হওয়ায় সাধারণের অবস্থায় ব্যবহার ক্লেশকর হইতে পারে, কিন্তু করকচের সহিত লিবার পুলের লবণের মূল্যের বিশেষ পার্থক্য না থাকায় সকলেই ব্যবহার করিতে পারে তথাপি লোকের যে কি মতিভ্রম ঘটিয়াছে কেবল চূর্ণ করিবার আলস্যেও করকচ ব্যবহার করিতে কেহ চায় না। তাই বলি, শরীর সুস্থ করিতে চাও, সরল হৃদয়ে ধর্ম্ম-বলে বলীয়ান্ হইতে চাও আংশিক ভাবে দেশের উন্নতি সাধন করিতে দেশের উন্নতিতে আত্মোন্নতি সাধন করিতে চাও তবে অগ্রে দেশীয় লবণ ব্যবহার কর। বারান্তরে দেশীয় অন্য বস্তুর কথা বলিব।

উপনিষদ্।

অধুনা শ্রমজীবি কৃষক বালক হইতে উপাধ্যায় কুমার পর্য্যন্ত সকলেই একত্র অবস্থানপূর্ব্বক এক বিষয় শিক্ষা করিয়া থাকে। অনেক স্থলে এরূপ বিভিন্ন সঙ্গক্রমে একে অন্যের প্রকৃতি পরিগ্রহ করিয়া থাকে। এই প্রকারে ক্রমশঃ কৃষক বালক বিলাসপ্রিয় হইয়া অকর্ম্মণ্য হয়, আবার ভদ্রবংশজ-গণও অবস্থার অনুপযোগী বিলাস আকাঙ্ক্ষা ও নীচতা গ্রহণ করে। যাহা শিক্ষা করে, তাহা বিজাতীয়—বিভিন্ন দেশীয় বিষয়ও বিজাতীয় মুখে ভিন্নাকারে শুনিয়া শিক্ষিত, সুতরাং দেশীয় কাঞ্চনে উপেক্ষা ও বিদেশীয় কাচে

আকাজ্ক্ষা জন্মিয়া দেশে অবজ্ঞা বিদেশে আগ্রহ হয়। পরিণাম ও আত্ম বোধ ক্রমে ক্রমে নির্ম্মূল হইয়া অসুরবৎ আপাত মনোরম বস্তু গতি লাভের উপায় নির্দ্ধারণে আয়াস জন্মিয়া থাকে। এরূপ বিষম কলিকালে অল্প লোকেরই শাস্ত্র মর্য্যাদায় আস্থা থাকিতে পারে। অনাস্থায় তাৎপর্য্য গ্রহণ একান্ত অসম্ভব। অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্র সমূহে নব্যগণের অশ্রদ্ধার ঐ সমস্ত কারণ রহিয়াছে। বিশেষতঃ তাহারা অশিক্ষিত, যাহা শিক্ষা করিয়াছে তাহাও শাস্ত্রশিক্ষার প্রতিকূলভাবে, এইজন্য অনেক বাবু অনায়াসে শাস্ত্র বাক্য লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছায় বিচরণ করেন। সুতরাং উপনিষদের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। অতএব,—

"বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ সরস্যা দ্বিজন্মনা॥"

মনুর এই বিধি ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া বৈদেক দেশ অধ্যয়ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশ হইতে এরূপ অজ্ঞানাবস্থায় কোন পদস্থ ব্যক্তি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হইলেও অনুচিত যশোলিপ্সাবশে বেদ সম্পর্কে দুই একটা বলিলে বা লিখিলে আপাততঃ সমাদৃত হয়। বর্ত্তমান সময়ে অন্তঃসারের প্রতি লক্ষ্য অতি অল্প, বাহিরের উজ্জ্বলতায়ই চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া থাকে। বহিশ্চাকৃচিক্যময় অন্তঃসার বিহীন উপদেশ হৃদয়ে পরিপোষিত হইয়া কুসংস্কারের স্রোত দুর্দ্দম বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে। সুতরাং প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জনের পরিপন্থী আচারে স্বতঃ রুচি জন্মিয়া যায়। অনুসন্ধিৎসা বৃত্তির প্রভাব অতিশয় নিস্তেজ হইতেছে। সুতরাং পরের উপর দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করিতে মনে অণুমাত্রও শঙ্কার উদ্রেক হয় না। এই সমস্ত কুভাব আজকাল বড়ই প্রচলিত হইতেছে। অনেকে অনায়াসে বিজ্ঞতার ভান করিতে বড়ই ব্যগ্র, এজন্য অজ্ঞাত বিষয়ে ও দুঃসাহসে নির্ভর করিয়া স্বকপোলকল্পিত মতদ্বারা বিদ্যাবত্তা প্রকাশ করেন। শাস্ত্র ও শিষ্টপরম্পরাদ্বারা আবহমান কাল হইতে প্রচলিত, শাস্ত্রকারগণ সমস্বরে যাহা নির্ণীত করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, অধুনা তাহার বিরুদ্ধেও নব্যমতের বিকাশ হইতেছে, এবং নব্যের তাহাতেই দৃঢ় বিশ্বাস।

উপনিষদ্ বৈদেকদেশ। বেদের শিরোভাগ। উহা জ্ঞানকাণ্ড,

ব্রহ্মবিদ্যা, বেদান্ত ও বেদ রহস্য প্রভৃতি উপনিষদেরই নামান্তর। ব্যাস, জৈমিনি প্রভৃতি যাবতীয় ঋষিগণ ঐ সমস্ত অভিধানে উপনিষদের আখ্যা প্রচার করিয়াছেন। এজন্য মুখ্য উপনিষদ্গুলি বেদভাগ হইলেও উপনিষদ্-নামেই সম্যক্ পরিচিত। অতএব উপনিষদ্ বেদ নহে। ইহা অনভিজ্ঞের মীমাংসা। আবার যদিও কেহ বেদ বলিতে অভিলাষী হন। তবে উহাকে ও পূর্ব্ব তন্ত্রকে পৌরুষেয় স্থির করিয়া উপনিষদ্কে ঋষিদিগের পরিমার্জ্জিত বুদ্ধির ফল বলিয়া থাকেন। সে যাহাই হউক উপনিষদের প্রামাণ্য যে অখণ্ডিত তদ্বিষয়ে আমরা কোন সংশয় করিতে পারি না। কারণ আর্য্যগণ ব্রহ্মজ্ঞান বিকাশ জন্য উপনিষদ্ই মুখ্যোপায় স্থির করিয়াছেন "ন বেদবিন্মনুতে তং" এই শ্রুতি বাক্যাংশ উহার নিদর্শন। ব্রহ্মকেও ঔপনিষদ্ পুরুষ বলিয়াছেন। ঐ শ্রুতির শেষাংশে "ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" এইরূপ রহিয়াছে। নব্যগণ বিবেচনা করেন, ইহা অতি অসার কথা। বস্তুতঃ তাহাদের এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ভ্রম, তাহারা ইহার প্রকৃত রহস্য বুঝিতে না পারিয়াই এ প্রকার বলিয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে আর্য্যগণ ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে উপনিষদ্কে বিদ্যা বলিয়া উদ্‌ঘোষিত করিয়াছেন। এই বিদ্যা প্রকৃত বিদ্যা। এই বিদ্যা বিকাশের সহায়তাকারী যে যে বিদ্যা, তাহারাও বিদ্যা, তদ্ভিন্ন অন্য বিদ্যা একরূপ অবিদ্যা আমারে উন্নতি-দায়িকা নহে। নব্যগণ অবিদ্যাকেই বিদ্যা জানেন এবং কায়মনোবাক্যে সেবা করেন। উপনিষদ্ ব্রহ্মবিদ্যা, উহার সেবা দ্বারা অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য আচার্য্য বলিলেন "উপনিষদিতি বিদ্যোচ্যতে। তচ্ছীলিনাং গর্ভজন্মজরাদি নিশাতন্না তদবসাদনাদ্বা ব্রহ্মণো বোপনিগময়িতৃত্বাৎ উপনিষদ্। নবাস্যাঃ পরংশ্রেয় ইতি। তদর্থত্বাদ্‌গ্রন্থোপ্যুপনিষদ্॥ উপনিষদে জ্ঞান লাভ করা বিষয়াসক্তের একরূপ অসাধ্য। বিরক্ত ও আচার্য্যবান্ পুরুষই এই জ্ঞান লাভে সমর্থ। তবে বর্ণপরিচয় বোধ সকলের হইতে পারে।

ব্রহ্মচর্য্য ও আচার্য্য সেবার অভাবে একই ঔপনিষদ্ তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রের তত্ত্বলাভ এবং অসুররাজ বিরোচনের দেহেতে আত্মবুদ্ধি হইয়াছিল। সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও ভগবান্ নারদকে সনৎকুমারের নিকট পুনঃপুনঃ

ব্রহ্মচর্য্য পরিপূতমানসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইয়াছিল। ঘোর বিষয়াশক্ত, ইন্দ্রিয় দাস, ব্রহ্মচর্য্য বিরহিত অশুচিময় নবীন সৌখিন বাবু, হঠাৎ উপনিষৎ দেখিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিবেন, ইহা বড়ই অসম্ভব কথা। মানুষ প্রায়ই স্ব স্ব অন্তরের অনুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে। অধিকাংশস্থলেই ব্যাহ্যানুষ্ঠান আন্তরিক আচারের অনুমাপক। বাহিরের ভাব ভঙ্গী দেখিয়া অন্তর চিনিয়া লয়। সাধু অসাধু ব্যবহারেই জানা যায়। সুতরাং বাঙ্‌নিষ্পত্তি দ্বারা ও অন্তরের অন্তস্তল অনুভূত হইতে পারে। যে ঘোর বিষয় কিঙকর, শয়নে, স্বপনে নিয়ত বিষয়ের অনুধ্যান করিয়া থাকে। তাহার বচন রচনা বিষয় সংশ্লিষ্ট হইবে। আবার বিষয় দাস স্বার্থের ব্যাঘাত করিতে কদাপি প্রবৃত্ত হইতে পারে না। যতক্ষণ স্বার্থ উপস্থিত ততক্ষণ কষ্টসৃষ্টে ধার্ম্মিক সুজন সাজিয়া পরকে উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে। না হয়। সম্পূর্ণ স্বার্থ পর ইন্দ্রিয়ারাম বিলাস বিলোল ব্যক্তি কোন ক্রমেই উপনিষদ্ বা ঔপনিষদ্‌তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতে পারে না। তাদৃশ লোক উপনিষদের কথা সমালোচনা করিয়া যাহা স্থির করিবে, তাহা অবশ্যই নূতন হইবে। বুদ্ধিমান্‌গণ কদাপি তাহাতে আস্থা স্থাপন করিতে পারে না। তবে যাহারা তদ্বিধ লোকের বিষয় প্রাবল্যকে মাহাত্ম্যের কারণ স্থির করিয়া তদ্‌গুণে বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন, তাহারা উহার মূল্যবত্তা স্থির করিতে প্রয়াসী। বর্ত্তমান সময়ে স্পষ্টরূপে ইহা দেখা যাইতেছে যে অধিকার বিচার প্রায়ই নাই। গুরু, শিষ্য, পাঠক, বক্তা ও শ্রোতা, ইহাদের অধিকাংশই অধিকার অনুসন্ধানে পরাঙ্মুখ। সকলেই সর্ব্ববিষয়ের অধিকার সামর্থ্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। অজ্ঞতা অস্বীকার্য্য। সমুচিত সরলতার অভাবেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। যদি কেহ বিষয়ান্তর দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন, তবে অজ্ঞাত বিষয়েও অভিজ্ঞতার ভান করিতে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হন না। সুতরাং সাক্ষর লোকমাত্রেই একরূপ সর্ব্বজ্ঞ। বেদ, বেদান্ত, মীমাংসা বা অন্য কোন দর্শন, যাহাই হউক না কেন, উপস্থিতমাত্রে তাহার একটা সমালোচনা করিয়া স্বাভিমতের নির্দ্দোষাতিশয়তা প্রকাশ করেন এবং উহার দার্ঢ্য সংস্থাপন ও রক্ষার

জন্য অশেষ উপায় অবলম্বন করিয়া অযৌক্তিক হইলে বচন রচনে অবধারা প্রচার করেন। দুই. একটি সংস্কৃত বাক্য যথা স্থানে স্থাপন করিয়া ব্যাস, মনু, বেদ, দর্শন প্রভৃতি প্রামাণিক আমোদার করেন। কতিপয় তদনুরূপ লোক তাহার সমর্থন জন্য সতত বদ্ধ পরিকর হয়, তখন মিথ্যা অসংবৃদ্ধ প্রলাপ ও মুদ্রিত হইতে থাকে। কেহ বা মুদ্রিত হইলেই উহা বেদবাক্যাধিক সুসঙ্গত ও নিত্য মনে করিয়া থাকেন। তখন তদ্রূপ অসার লোকও লিপিগৌরবে গুরু হইয়া পড়েন। কতিপয় লোক উহার ব্যাখ্যায় কৃতার্থতা লাভ করিয়া থাকেন। উপক্রম উপসংহার বোধ, উপপত্তি বিচার প্রভৃতির ক্ষমতা নাই, সুতরাং উহা মনেও স্থান পায় না। অধুনা অধিকাংশ লোককেই এই প্রকার বিজ্ঞ দেখা যায়, অন্ততঃ বেষভূষায় প্রায় সকলেই বিজ্ঞ। যদি একটু আন্দোলন করা যায় তবে অচিরেই বিজ্ঞতার আবরণ বিচ্ছিন্ন হইয়া অস্থি পঞ্জর বাহির করিয়া দেয়। এই জন্য নব্যগণ শাস্ত্র বেত্তৃত্বের অভিমান করিতে অগ্রসর হইয়াও বিচার করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম ও অনভিলাষী। নব্যগণ পত্রদ্বারা চতুরঙ্গ ক্রীড়াকে যত আদর করেন, সম্মুখ সঙ্গরে উপস্থিত হইতে বড়ই অপ্রস্তুত ও অসম্মত ও অসমর্থ। কারণ বিজ্ঞতার যে আবরণে অঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া ছিলেন, তাহা তাহার আয়ত্ত নহে। তাহা হয় পরমুখে অথবা পুস্তকৈকদেশে। অস্ত্রব্যবহার শিক্ষা নাই, অথচ তূণীর প্রকাশের স্বভাব আছে। এরূপ বিষম কালে যেখানে সেখানে উপনিষদ্ বার্ত্তা শ্রবণ করিতে অভিলাষই অসঙ্গত। আর্য্যগণ শ্রুতি সঙ্গতি মুখে বলিয়াছেন,— "আচার্য্যাদেব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপৎ। তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন"। সাধক সাধনা করিয়া দেখিয়াছেন আচার্য্য ভিন্ন সুপথে পরিভ্রমণ করিবার আর সাধ্য নাই। যাহারা আপনাকে আপনি সিদ্ধ মনে করিয়া সর্ব্বজ্ঞতা স্থাপনার্থ অশেষ প্রয়াস পাইয়া থাকেন, তাহারা ব্রহ্মনিষ্ট শ্রোত্রিয় গুরুর প্রয়োজন মনে করেন না। কারণ স্বেচ্ছাচারের আশয়ে সাধীনতার আশয়ে স্বাধীনতার ব্যাঘাত ঘটে বলিয়া আচার্য্যাধীন হওয়া অকর্ত্তব্য বোধ করেন।

উপপূর্ব্বক সদ্ ধাতু হইতে উপনিষদ্ শব্দ উৎপন্ন। সচ্ছ বিশরণ-

গত্যবসাদনেষু। সদ ধাতুর অর্থ বিশরণ, গতি (প্রাপ্তি) ও অবসাদন। ইহার প্রত্যেক অর্থ দ্বারা উপনিষদ্ শব্দ অন্বিত হইতে পারে। বিশরণ শব্দের অর্থ হিংসন ও বিনাশ। উপনিষদ্ পরিচর্য্যা দ্বারা সংসার বিজ বিনষ্ট হইয়া যায়, অবিদ্যার অবসাদ হয় এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে। এই উপনিষদ্ কোন বেদের অন্তর্গত কোনগুলি এবং উহার সংখ্যা মুক্তিকোপনিষদে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"চতুর্ব্বিধা তু যা মুক্তি র্মদুপাসনয়া ভবেৎ।
ইয়ংকৈবল্যমুক্তিস্তু কেনোপায়েন সিদ্ধ্যতি॥
মাণ্ডূক্যমেকমেবালং মুমুক্ষূণাং বিমুক্তয়ে।
তথাপ্যসিদ্ধং চেৎ জ্ঞানং দশোপনিষদং পঠ॥
জ্ঞানং লব্ধ্বা চিরাদেব মামকং ধাম যাস্যসি।
তথাপি দৃঢ়তা নোচেৎ বিজ্ঞানস্যাঞ্জনাসুত!॥
দ্বাত্রিংশাখ্যোপনিষদং সমভ্যস্য নিবর্ত্তয়।
বিদেহমুক্তাবিচ্ছাচেদষ্টোত্তরশতং পঠ॥"

মুক্তিকোপনিষদ্

সালোক্য, সামীপ্য সারূপ্য ও সাযুজ্য এই চতুর্ব্বিধ মুক্তির মধ্যে কৈবল্য মুক্তি কেবল মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ পরিচর্য্যার দ্বারা লাভ হইতে পারে। যদি তাহাতেও মুক্তি লাভ না হয়, তবে দশখানি উপনিষদ্ পাঠ করিতে হইবে। ১ ঈশ ২ কেন ৩ কঠ ৪ প্রশ্ন ৫ মুণ্ড ৬ মাণ্ডুক্য ৭ তিত্তিরি ৮ ঐতরেয় ৯ ছান্দোগ্য ও ১০ বৃহদারণ্যক।

"ঈশ[১] কেন[২] কঠ[৩] প্রশ্ন[৪] মুণ্ড[৫] মাণ্ডূক্য[৬] তিত্তিরিঃ[৭]।
ঐতরেয়ঞ্চ[৮] ছান্দোগ্যং[৯] বৃহদারণ্যকং[১০]তথা॥"

মুক্তিকোপনিষদ্

ইহাদের মধ্যে কেন (তলবকার) ও ছান্দোগ্যোপনিষদ্ সামবেদীয়। ঐতরেয়োপনিষদ্ ঋগ্বেদের। ঈশও বৃহদারণ্যক শুক্লযজুর। কঠবল্লীও তৈত্তিরীয়ক কৃষ্ণ যজুর। প্রশ্ন, মুণ্ড ও মাণ্ডুক্য অথর্ব্ববেদীয়

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ভাষ্য প্রণয়ন কালে ঐ দশখানি উপনিষদের ভাষ্য লিখিয়াছেন। পরং যজুর্ব্বেদের কৃষ্ণভাগের শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ও শাঙ্কর ভাষ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। শারীরকসূত্রের ভাষ্য সঙ্গতির উল্লেখে ভাষ্যকার শ্বেতাশ্বতরীয় শ্রুতি বহুস্থলে উদ্ধার করিয়াছেন। এবং তাঁহার উল্লেখে অন্যান্যোপনিষদ্ ও উদ্ধৃত হইয়াছে। যাবতীয় বেদান্ত শাস্ত্র তিন ভাগে বিভক্ত। উপনিষদ্ প্রস্থান আদিম ভাগ। দ্বিতীয় ভাগ শারীরকসূত্র। শ্রুতি বা ঈশাদি উপনিষদ্ গুলি মুখ্যোপনিষদ্। গীতাদিদ্বারা সুন্দররূপে ঔপনিষদ্ জ্ঞানের সাহায্য হয় এ জন্য গীতাদিকে গৌণোপনিষদ্ বলে। বেদান্তসারে, ইহাই বলিয়াছেন, "বেদান্তো নাম ? উপনিষদ্ প্রমাণং তদুপকারীণি শারীরকসূত্রাদীনি চ"। স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ উপনিষদের নাম বেদান্ত এবং তাহার উপকারক বলিয়া শারীর সূত্রাদি ও বেদান্ত। সুতরাং ইহা বলা অসঙ্গত নহে যে, উপনিষদ্গুলি মূল বেদান্ত এবং উহা মুখ্য ও গৌণ এই দুই ভাগে বিভক্ত। একটু স্থির চিত্তে পর্য্যালোচনা করিলেই স্থির বুঝা যাইবে যে, উল্লিখিত লিপি একান্ত সার্থক।

দশোপনিষদের প্রাচীনত্ববাদীগণ শ্বেতাশ্বতর ভাষ্যকে শঙ্করাচার্য্যের অস্বীকার করিলেও শারীরক ভাষ্যকালে তাহার উল্লেখ অস্বীকার করিবার সাধ্য নাই। সুতরাং একাদশ উপনিষদ্ প্রাচীন বলিতে তাহারা বাধ্য। মুক্তিকোপনিষদ্ অষ্টোত্তর শতোপনিষদের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ঋগ্বেদের দশখানি। শুক্লযজুর ১৯, কৃষ্ণযজুর ৩২, সামবেদের ১৬, ও অথর্ব্ববেদের ৩১। এই এক শত আটখানি।

উপনিষদ্ বিভিন্ন হইলেও সকলেই সেই ঔপনিষদপুরুষ অদ্বিতীয় ব্রহ্মকেই উপক্রম উপসংহার প্রভৃতি লিঙ্গ ষট্‌কের দ্বারা অবধারিত করিয়াছেন। এই উপনিষদ্গুলি ভাষ্য ভিন্ন সুধু পাঠ করিলে তাৎপর্য্য সম্যক্ অনুভব হয়না। ভাষ্যদ্বারা আচার্য্যের নিকট পাঠ করিতে হয়, সম্পূর্ণরূপে বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন দীর্ঘকাল সাপেক্ষ এবং উহা সাম্প্রদায়িক আচার্য্য সমীপে অধ্যয়ন করা উচিত। অনেকে বেদান্তশাস্ত্র দিঙ্মাত্র অধ্যয়ন করিয়া ন্যায়শাস্ত্রানুবলে অধ্যাপনা

করাইতেছেন। উহাতে শব্দার্থ ব্যাখ্যাত হইলেও তাৎপর্য্য পরিস্ফুটিত হয় না। অনেকে বেদান্ত দর্শনের চতুঃসূত্রী অধ্যয়ন করিয়া অধ্যয়ন সমাধা করেন। কেহ বা বেদান্তসার ও পঞ্চদশী পড়িয়াই বেদান্তবিৎ হন। নব্যগণ আদৌ না পড়িয়াই কেবল ইংরাজী রচনা পড়িয়া বেদান্ত-ভূষণ হইয়া পড়েন। আজ কাল অনেকেই ইংরাজীভাষায় বেদ বেদান্ত পড়িয়া বৈদিক অভিমানে প্রমত্ত। অনুকরের অনুকরে উহাদের অবিকল্প জ্ঞান, কাযেই যে কোন শাস্ত্র হউক, একটা কথা কহিতে ভয় নাই। কথা কহিতে তাহারই ভয় হইবে না, যে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান লাভ করিয়াছে, আর যে কিছুই জানে না। মধ্যম লোকেরই ভয় ও আশঙ্কা।

"যশ্চ মূঢ়তমো লোকে যশ্চ বুদ্ধেঃ পরংগতঃ।
উভৌ তৌ সুখমেধেতে ক্লিশ্যত্যন্তরিতো জনঃ॥"

ভারত পুরাণ ইত্যাদি

আজকাল এই শেষ শ্রেণীর লোকই অধিক, সুতরাং তাহাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিয়া থাকেন। বিশেষতঃ যাহারা উচ্চ পদারূঢ় ব্যক্তি তাহারা ইচ্ছা মাত্রেই সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ হইতে পারেন, উপনিষদ্ আর অধিক কি। এইরূপেই দিন দিন শাস্ত্রের বিলোপ হইতেছে। এই বেদান্ত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইলে বহুদিন গুরুর নিকটে রীতিমত অধ্যয়ন করা আবশ্যক, তাহা হইলেই এই শাস্ত্রে অধিকারিত্ব জন্মে। নতুবা স্কুল, কালেজে বেদান্তের জ্ঞান কখনই হইতে পারে না।

বিবাহ।

প্রাচীন কালে বিবাহ সম্বন্ধে এই তিনটী বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল, যথা—

১। এক বংশ জাত স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ হওয়া উচিত কি না?

২। কিরূপ কন্যাকে বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে?

৩। বিবাহের বয়স।

৪। এক বংশজাত স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ হওয়া উচিত কি না? স্ত্রী সম্বন্ধে ভগবান্ মনু বলিয়াছেন;—

অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥

৩য় অধ্যায় ॥৫॥

যে স্ত্রী মাতামহের, সপিণ্ডা না হয়, অর্থাৎ সপ্ত পুরুষ পর্য্যন্ত মাতামহাদি বংশ জাত না হয় ও মাতামহের সগোত্রা না হয় এবং পিতার সগোত্রা বা সপিণ্ডা না হয় অর্থাৎ পিতৃ স্বস্রাদি সন্ততি সম্ভূতা না হয়; এমন স্ত্রীই দ্বিজাতিদিগের বিবাহের যোগ্যা জানিবে।

বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণও মুক্তকণ্ঠে বলিয়া থাকেন যে, রক্ত সম্বন্ধ বর্জ্জন করিয়া বিবাহ করা উচিত, বিজ্ঞানের ভূয়সী চর্চ্চা হওয়াতেই ইদানীং এই সকল ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্বকুল সন্নিহিত কোন বংশের কন্যা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। যেরূপ কোন কৃষক এক ভূমিতে পুনঃ পুনঃ একরূপ শস্য বপন করিলে সুচারুরূপে শস্যোৎপত্তি হয় না, সেইরূপ সমকুলোদ্ভব ব্যক্তিদিগের পরস্পর পাণিগ্রহণ হইলে, সে কুলে অত্যন্ত দোষ স্পর্শে। তদুৎপন্ন সন্তান ক্রমে নির্ব্বীর্য্য ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। উদ্ভিজ্জ ও ইতর জীবদিগের মধ্যেও এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত দেখা যায়। সকল বৃক্ষেরই স্ত্রী জাতীয় পুষ্পের রেণু সেই বৃক্ষেরই স্ত্রীজাতীয় পুষ্পে পতিত না হইয়া অন্যান্য বৃক্ষের পুষ্পে পতিত হইতে পারে, এই আশায় কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম অবলম্বিত হইয়াছে। পোষিত পশুর পক্ষেও এই নিয়মের অন্যথা আচরণ স্থলে সন্ততি সম্বন্ধে অত্যন্ত মন্দ ফল উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। বিবাহের এই সুপ্রণালীর অভাব বশতঃই অনেক ইউরোপীয় রাজবংশ আত্মীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াই অকর্ম্মণ্য জড়বৎ সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন। স্পেনরাজ্যের রাজবংশীয় অনেকানেক ব্যক্তি ভাগিনেয়ী ও ভ্রাতৃ কন্যার বিবাহ করিয়া অতিহীন হইয়াছেন এবং এই গুরুতর দোষে অত্রত্য পোর্ত্তগিশ ধনাঢ্য লোকদিগের বংশে অনেক জড়েরও উৎপত্তি হইয়াছিল। একদা দিগ্বিজয়ী মুসলমান সম্রাট্‌গণের অধঃপাতের অন্যতম

কারণ ইহাকে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান সময়েও মুসলমান-দিগের বংশে অনেক জড়ের উৎপত্তি হইতেছে। প্রাচীন ভারতীয় মহর্ষি-গণ ইহার এই অপকারিতা বহু পূর্ব্বেই পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই ইহার নিষেধক ব্যবস্থাও প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

এ সম্বন্ধে বিখ্যাত পাশ্চাত্য ডাক্তার কার্পেণ্টার, বডক, হাইস, রিমস, এগ্নিমেল, ফেডিয়েট্ প্রভৃতি মহোদয়গণ লিখিয়াছেন যে, এক রক্তের সংস্রবে বিবাহ হইলে, তাহাদের সন্তান সন্ততিগণ প্রায়ই নির্ব্বোধ, পাগল, অসম্পূর্ণ গঠন, বিকৃত স্বভাব, বোবা, অন্ধ, বধির ইত্যাদি অঙ্গ ও ইন্দ্রিয় বৈকল্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বিখ্যাত ডাক্তার কার্পেণ্টার লিখিয়াছেন, তিনি একবংশে বিবাহিত ১৭টী পরিবারের ৯৫টী লোকের মধ্যে কাহাকে নির্ব্বোধ, কাহাকে পাগল ও কাহাকে গণ্ডমালা প্রভৃতি হইতে দেখিয়াছিলেন।

ডাক্তার বডক সাহেব লিখিয়াছেন, তিনি বিলাতের এক রক্তের সংস্রবে বিবাহিত একটি পরিবারে ৯টী সন্তানের মধ্যে ৮টীকে বধির ও বোবা হইতে দেখিয়াছিলেন।

এক রক্তের সংস্রবে বিবাহের আর একটী প্রধান দোষ এই যে, বংশ-গত ব্যাধি থাকিলে, তাহাদের সন্তান সন্ততিগণ প্রবলরূপে ঐ ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। *

---

* Marriage of near kindred or intermarriage of persons of the Same blood.

"The consequece of the intermarrige of persons of the Same blood is to perpetuate and intensigy auy cousttc constie tntecnal ingirmity in the nert peneratеon.'

"Alarye proportion of those chilaren who are born with defectvee senses blind deaf umb and are tne offshsiny of near relation (Ladyomanual by Dr Ruddon pape I13)

"It is stated that when the relatienship between the parents is very close a latfc per centacfe of ths children are Moxc or less inbnreonsly effeeted insanty blindniss dumbness

২। কিরূপ কন্যাকে বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে? ভগবান্ মনু বলিয়াছেন;—

মহান্ত্যপি সমৃদ্ধানি গোঽজাবিধনধান্যতঃ।
স্ত্রীসম্বন্ধে দশৈতানি কুলানি পরিবর্জ্জয়েৎ॥

৩য় অধ্যায়॥ ৬॥

গো, মেষ, ছাগ, ধন ও ধান্য দ্বারা অতি সমৃদ্ধ মহাবংশ হইলেও বিবাহ বিষয়ে এই বক্ষ্যমাণ দশকুল পরিত্যাগী করিবে॥

হীনক্রিয়ং নিষ্পুরুষং নিশ্ছন্দো রোমশার্শসং॥
ক্ষয্যাময়াব্যপস্মারিশ্বিত্রিকুষ্ঠিকুলানি চ॥

ঐ॥ ৭॥

জাত কর্ম্মাদি সংস্কার বিহীন, কেবল কন্যা মাত্র জনক, বেদাধ্যয়ন রহিত, সকলেই বহুরোমযুক্ত, অর্শ, রাজযক্ষ্মা, মন্দাগ্নি, অপস্মার, শ্বিত্র, অথবা বিবিধ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত এই সকল প্রত্যক্ষ দোষে দূষিত দশ কুলে বিবাহ করিবে না॥ ঐ॥ ৭॥

নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীং।
নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাং॥

ঐ॥ ৮॥

যে স্ত্রীর মস্তকের কেশ পিঙ্গল বর্ণ, যাহার ছয় অঙ্গুলী প্রভৃতি বহু অঙ্গ, যে চিররোগিণী, যাহার গাত্রে কিছু মাত্র লোম নাই, যাহার গাত্রে অতিশয় লোম, যে নিষ্ঠুরভাষিণী, যাহার পিঙ্গলবর্ণ নয়ন, এরূপ পাত্রীকে বিবাহ করিবে না।

---

beiay amony the mort freuent resualf (for ennoce medoecenes medi cal palice by Dr Husband pae 399)

Soe Dr Harseis p. 90. Amer gourw med Sei aprel 1849. Dr Bemiss in the Jonrnal of psyclololoieal medicine tor 1857. Dr mitehell in the Endev med Journ for 1862 p. 872

who considers iddsey to be an especially frebueut consequence of the marriage of blood relaton adot in the "comptes Rendus vol II of 1863. p. 978.

আজ কাল উপরি উক্ত অতীব মূল্যবান্ উপদেশগুলির প্রতি প্রায় কেহই তত দৃষ্টিপাত করেন না। অনেকেই বোধ হয় অবগত আছেন যে, আমাদের মধ্যে যে সকল দুশ্চিকিৎসিত ও গুরুতর ব্যাধি সংঘটিত হয়, তাহা প্রায়ই পিতামাতা অথবা পূর্ব্ব পুরুষদিগের শরীর হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কৌলিক পীড়ার নাম অনেকেই শুনিয়াছেন এবং বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলিয়া থাকেন "ইহা আপনার কৌলিক পীড়া, ইহা আরাম হওয়ার সম্ভাবনা নিতান্ত সামান্য"। এই সকল কৌলিক পীড়া কি কারণ বশতঃ আজকাল আমাদের মধ্যে আসিয়াছে ও এত বাহুল্যরূপে সর্ব্বদা দেখা যায় কেন, এই সম্বন্ধে বিখ্যাত ডাক্তার রবার্টস্ প্রভৃতি মহোদয়গণ যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত করা হইল।

ডাক্তর রবার্টস্ লিখিয়াছেন যে,—কৌলিক দেহ স্বভাব কোন কোন পিতামাতার হওয়াতেই যে সন্তানের হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। নিম্ন লিখিত ব্যাধি পিতামাতার থাকিলে সন্তানের হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা যথা;—

১। কোন কোন দৈহিক পীড়া বা রক্ত পীড়া যথা. যক্ষ্মা কর্কট রোগ এবং উপদংশ।

২। স্নায়ুমণ্ডলের পীড়া—যথা, সন্ন্যাস, কোরিয়া, উন্মাদ, মদাতঙ্ক, স্নায়ুশূল, মৃগী, পক্ষাঘাত।

৩। ভৌতিক পীড়া, যথা—ভৌতিক অঙ্গ বৈকল্য ও ইন্দ্রিয়ের অভাব, অন্ধতা, বধিরতা ইত্যাদি।

৪। অকালে স্নায়বিক বা সার্ব্বাঙ্গিক অপকর্ষ, কোন যন্ত্রের মেদাপকৃষ্টতা, ত্বকের স্থিতি স্থাপকের হ্রাস, অকালে কেশের শ্বেতভাব। উঠিয়া যাওয়া। দন্ত পতন, ও নিস্তেজকতার অন্যান্য লক্ষণ।

৫। কোন কোন চর্ম্ম রোগ যথাঃ—কুষ্ঠ ও মোরা এসিন।

৬। শ্বাস কাশ।

৭। ক্ষুদ্রশীলা, কঙ্কর বা গ্রেভেল।

৮। বহুমূত্র।

৯। অর্শ।

বংশ পরম্পরা যে এক পীড়া হয় এমত নহে। স্নায়ুমণ্ডলের পীড়ায় এইরূপ ঘটনা অধিক। কোন কোন বংশে সন্ন্যাস ও কোন বংশে উন্মাদ প্রকাশ পায়। পিতামাতার কুস্বভাব হেতুও সন্তানের নানা পীড়া জন্মিতে পারে,—যথা অতিরিক্ত মদ্যপায়ির সন্তানের স্নায়বিক পীড়া হয়। কখন কখন পিতামাতার উপদংশ পীড়া থাকিলে সন্তান কেবল দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হয়। জন্ম গ্রহণের কোন সময়ে আপনা হইতে অথবা সামান্য কারণে কৌলিক পীড়া প্রকাশ পায়। কখন কখন দুই এক পুরুষ অতিক্রম করিয়া তৃতীয় বা চতুর্থ পুরুষে পীড়া প্রকাশ পায়।

বিখ্যাত ডাক্তার উইলিয়ম্ বলেন, পিতামাতার অন্যান্য দোষ ও সন্তানে বর্ত্তে। কোন কোন পরিবারের মধ্যে সকলেই সদ্‌গুণান্বিত এবং দয়ালু লোক দেখা যায়। আর কোন কোন পরিবারের মধ্যে পুরুষানুক্রমে সকলেই অতি নিষ্ঠুর ও দুরাত্মা হইয়া থাকে যথা,—রোম রাজ্য ক্লডিয়াই। কোন কোন পিতামাতার দেহের অঙ্গবৈকল্য যথা,—পৈতৃক ছয় অঙ্গুলী বিশিষ্ট হস্ত পদ সন্তানে প্রাপ্ত হয়।

ডাক্তার কার্পেণ্টার লিখিয়াছেন। তিনি ৩৫৯ জন নির্ব্বোধ দেখিয়াছিলেন। তাহাদের বুদ্ধি হীনের কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, ৯৯ জন নির্ব্বোধের পিতা মাতা মাতাল ছিল। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে ৯৯ জন নির্ব্বোধের সকলেরই যখন পিতা মাতা মাতাল ছিল, তখন পিতামাতার দোষেই এই ৯৯ জন নির্ব্বোধ হইয়াছে। তিনি ইহাও বিশ্বাস করেন যে, ঐ কএক জন ব্যতীত অবশিষ্ট অধিকাংশের পিতা মাতা ন্যূনাধিক পরিমাণ মাতাল অথবা অপরিমিতাচারী ছিলেন।" *

* বিজ্ঞানবিৎগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে, মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার মতেই ক্ষতিকারক পদার্থ আছে। অভ্যন্তরের দূষিত বা বিষাক্ত পদার্থ সকল নিশ্বাস, ঘর্ম্ম, মল, মূত্র দ্বারা বহির্গত হইয়া যায়। মনুষ্য শরীরের রস

ডারুইন্ মনুষ্য জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধীয় পুস্তকে লিখিয়াছেন 'যে, মনুষ্য, ঘোটক, মেষ, কুকুর, প্রভৃতি পশুর সন্তানোৎপাদন পক্ষে পিতামাতার দোষগুণ বিলক্ষণ লক্ষ্য, করিয়া থাকেন, কিন্তু পুরুষের বিবাহের সময় স্ত্রীর শারীরিক ও মানসিক দোষগুণের প্রতি একেবারেই লক্ষ্য রাখেন না। মনুষ্যগণ এরূপ পরস্পর স্ত্রী পুরুষ উভয়ে শারীরিক ও মানসিক দোষগুণের বিষয় বিশেষ রূপে বিচার করিয়া পাণিগ্রহণ করিলে বলিষ্ঠ ও বুদ্ধিমান্ সন্তান লাভ করিতে পারেন। স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মধ্যে যদি এক জনের শারীরিক বা মানসিক অপটুতা প্রকাশ পায়, তবে কখনই পরস্পরের পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য নহে'।

আমাদের প্রাচীন আর্য্যগণ শত সহস্র বৎসর বহুতর গবেষণা করিয়া

রক্তাদি ও মল মূত্রের বিশেষ দোষ জন্মে। মনু ও সুশ্রুত বলেন যে, কোন কোন মনুষ্যের মূলে, অর্থাৎ শুক্র শোণিতের সংযোগ কালে এমন বিশেষ কোন দোষ ঘটনা হইতে পারে যে, তাহার প্রভাবে মানুষের আমরণ শরীরের বিষাক্ততা থাকিয়া যায়। স্বেদ, ক্লেদ, তাপ, নিশ্বাস, জৃম্ভন; নেত্রতেজ, ইত্যাদি শরীরের ক্ষতিকারক পদার্থ থাকিলে, অন্যের শরীর লইয়া ক্রীড়া করা বিশেষ সাবধাণের কার্য্য। আমরা যে নারীদেহ লইয়া সর্ব্বদা ক্রীড়া করি, তাহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে। স্বামী, নিজের দোষেও পীড়িত ও মরিতে পারে, স্ত্রীর দোষেও মরিতে পারে। এমন দেখা গিয়াছে অনেক যুবক পূর্ব্বে ভাল ছিল, পরে দোষ বহুল নারীর নিশ্বাসে শুকাইয়া গিয়াছেন। না হয় রুগ্ন স্বভাব, মতিচ্ছন্ন বিবর্ণ হইয়াছেন। আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যে, পূর্ব্বে রুগ্ন হইলে, বিবাহের পরে তাহার শরীর সুস্থ হইয়াছে। আমাদের পরিচিত একটী ভদ্রলোকের স্ত্রী বধিরা ছিলেন। বিবাহের ৫।৬ বৎসর পরে সেই ভদ্রলোকটীও বধির হইয়াছিলেন। নেত্র-তেজও প্রাণনাশক আছে, ইহা আশীবিষ আর দৃষ্টিবিষ তীর্য্যক্ যোনিদের মধ্যে দেখা যায়। দৃষ্টিবিষ জীবের নেত্রতেজ অসহনীয়। ইহার দ্বারা ভয়, কম্প, জড়তা প্রভৃতি সমস্তই হয়। প্রাচীন আর্য্যজ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ এই সকল গুরুতর নানা কারণেই স্ত্রীপুরুষগণ ইত্যাদি দেখিয়া বিবাহ দিতে পরামর্শ দিতেন। আমরা কিন্তু এই সকলকে "কুসংস্কার" বলিয়া উপেক্ষা করি; কিন্তু বিবাহের এই সকল প্রণালীর মধ্যে অতি গুরুতর বৈজ্ঞানিক যুক্তি রহিয়াছে।

যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া লিপিবদ্ধ ও সমাজে প্রচলন করিয়া গিয়াছিলেন। আমরা পাশ্চাত্য অপূর্ণ বিজ্ঞান পাঠ করিয়া, পাশ্চাত্যদিগকে আদর্শ করিয়া, সেই সকল উৎকৃষ্ট ব্যবস্থাকে "কুসংস্কার" শব্দে ব্যাখ্যা করিতেছি। এক দেশের লোক কি কারণে পুত্র কন্যা উৎকৃষ্ট হয়, পিতা মাতা কি কি নিয়মে থাকিলে, সন্তান দীর্ঘজীবী, বলিষ্ঠ, ধার্ম্মিকও দয়াদিগুণযুক্ত হয়, তাহার কারণ উদ্ভাবনের জন্য শত সহস্র চেষ্টা করিতেছেন। আর এ হতভাগ্য দেশের শত শত হিন্দু সন্তান সেই সকল উৎকৃষ্ট নিয়ম অবগত ও পুরুষানুক্রমে প্রতিপালন করিয়া আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার কুহকে পতিত হইয়া, সেই সকল ব্যবস্থাগুলিও উপেক্ষা করিতেছেন।

ভগবান্ মনুর উপরি উক্ত ব্যবহার প্রত্যেকটির যুক্তি, এ পর্য্যন্ত যাহা আমরা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

১। জাত কর্ম্মাদি সংস্কার বিহীন, বেদ অধ্যয়ন রহিত। এই সম্বন্ধে অধিক বলা। নিষ্প্রয়োজন, যে বংশে সন্তানাদির উপযুক্ত সংস্কার হয় না, যে বংশে কোন সৎকার্য্য নাই, যে বংশে বিদ্যার চর্চ্চা নাই, সেই বংশের সন্তানাদি বিদ্যান্, সচ্চরিত্র, ধার্ম্মিক হওয়া নিতান্তই অসম্ভব।

২। কেবল কন্যা মাত্র জনক। এই সম্বন্ধে পাশ্চ্যাত্য বিজ্ঞানে বিশেষ কোন যুক্তি নাই। তবে আমরা সচরাচরই দেখিতে পাইব যাহার কেবলই কন্যা সন্তান হয়, তাহার কন্যাকে বিবাহ করিলে সেই স্ত্রীর গর্ভে কন্যা সন্তানই অধিক হইয়া থাকে। যদিও পুত্র কন্যা হওয়ার স্বতন্ত্র কারণ আছে, তত্রাপি যে বংশে কেবলই কন্যা হয়, সেই বংশে বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে।

৩। সকলেই বহুরোগযুক্ত। কোন কোন দৈহিক দুর্ব্বলতার সহিত কেশের অতিরিক্ত বর্দ্ধন হইতে দেখা যায়। অনেক স্থলে ষ্টুমাও ক্ষয়কাশ রোগীদের মস্তকের কেশ অতি বৃহৎ ও পক্ষ্ম স্থূল হয়। যে স্থলে বংশের সকলেই বহুরোগযুক্ত হয়, তথায় কোন দৈহিক পীড়া থাকা সম্ভব।

ক্রমশঃ।

হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারের শ্রেষ্ঠতা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হিন্দু আচার ব্যবহারের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতাও বিজাতীয়দিগের প্রদত্ত আরোপিত দোষ হইতে বিমুক্তির উপায় প্রতিপাদন করা আবশ্যক। যেহেতু হিন্দুর আচার ব্যবহার সকলের অভ্যন্তরেই হিন্দু ধর্ম্ম গ্রথিত রহিয়াছে। হিন্দুদিগের ধর্ম্মানুগত আচার ব্যবহার বলিয়াই এই ধর্ম্মে বা ধর্ম্মানুগত আচার ব্যবহারে স্বেচ্ছা-চারিতা প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। যে ধর্ম্মে ধর্ম্মের সহিত আচার ব্যবহারের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বন্ধন নাই, সেই ধর্ম্ম, স্বেচ্ছাচার পরিপূর্ণ বলিয়াই লক্ষিত হইতেছে। হিন্দুধর্ম্মে ধর্ম্মানুগত নিয়ম সকল আচার ব্যবহারে দৃঢ় বদ্ধ থাকাতে অদ্যাপিও যথেচ্ছব্যবহার প্রচার হইতে পারে নাই।

হিন্দু ধর্ম্মের ভিত্তি এমন দৃঢ় ভাবে সংস্থাপিত হইয়াছে যে, সহস্র যুগ অতীত হইলেও কোটিশঃ বল্মীক কীটের দংশনেও ভগ্ন বা পঙ্কিল হইতে পারিবে না, বরং কীটের দন্তই ভগ্ন হইয়া যাইবে, কিংবা পক্ষদ্বয় জন্মিলে দংশনে বিরত হইয়া, স্বয়ংই বিনষ্ট হইবে।

(হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন ও অমূলক দোষ সকল নিবারণ করার প্রবন্ধে পণ্ডিত বর শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রনারায়ণ বসু প্রণীত "হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" পুস্তক হইতে কতিপয় বিষয় প্রদর্শিত হইল।) হিন্দু ধর্ম্ম, প্রচলিত বিজাতীয় ধর্ম্ম সমূহ হইতে কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন, প্রথমতঃ তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

১ম। "হিন্দুধর্ম্মের নাম কোনও ব্যক্তি বিশেষের নামমূলক নহে" হিন্দু ধর্ম্ম বলিলে অপৌরুষেয় বৈদিক ধর্ম্ম বলিয়াই সহৃদয়ের হৃদয়ে উদয় হইয়া থাকে। হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন যে কোন ধর্ম্মের নাম উল্লেখ করিবে, তাহাতেই ধর্ম্ম প্রচারক তত্তদ্ব্যক্তির বিস্পষ্ট নাম মিশ্রিত ধর্ম্মের পরিচয় পাইবে। যথা বৌদ্ধ ধর্ম্ম, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম, এবং মহম্মদীয় ধর্ম্ম, বুদ্ধ ও

খৃষ্ট এবং মহম্মদের নামে এই সকল ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে, এইরূপে অন্যান্য ধর্ম্ম বিষয় ও জানিবেন। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্ম এইরূপ কোন ব্যক্তি বিশেষের নামে প্রচলিত নহে। ইহার দ্বারা হিন্দু ধর্ম্মের উদারতা ও ও প্রশস্ততা বিশেষ রূপে প্রমাণিত হইতেছে।

ধর্ম্ম সনাতন (নিত্য) পদার্থ, তাঁহার নাম কোনও ব্যক্তির নাম-দ্বারা অঙ্কিত হইতে পারে না এবং কোনও ব্যক্তির নাম মিশ্রিত হওয়া উচিত নহে। এই নিমিত্তই হিন্দুরা স্বীয় ধর্ম্মকে সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন এবং পরম পবিত্র বোধ করেন। কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম মিশ্রিত ধর্ম্মকে কৃত্রিম বলিয়া মনে করেন।

২য়। হিন্দু ধর্ম্মে পর ব্রহ্মের সম্পূর্ণাবতার স্বীকার করে না। হিন্দুধর্ম্মে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি বহুদেবতার বহুবিধ অবতারের বিষয় বর্ণিত আছে, কিন্তু তাহাতে এমন কোনও স্থানে বর্ণনা নাই যে, অনাদি অনন্ত নির্ব্বিকার পরব্রহ্ম পূর্ণভাবে কোনও মানবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। যে স্থলে মানবীগর্ভে ঈশ্বরের জন্মের কথা বর্ণিত রহিয়াছে, সেই স্থলেই ভঙ্গীক্রমে ঈশ্বরের অংশরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

"তত্রাংশে নাবতীর্ণস্য বিষ্ণোর্বীর্য্যানি শংস নঃ।"

শ্রীমদ্ভাগবত। ১০ম স্কন্ধ। ১ অং।

অংশ দ্বারা অবতীর্ণ বিষ্ণুর বীর্য্য (বিভূতি) আমাদের নিকট বলুন।

অপিচ।

"সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ।
অবতীর্ণোহি ভগবান্ অংশেন জগদীশ্বরঃ।"

শ্রীমদ্ভাগবত। ১০ম স্কন্ধ; রাস পঞ্চম।

ধর্ম্মের সংস্থাপনার্থে এবং অধার্ম্মিকদিগের বিনাশার্থে ভগবান্ (ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ) জগদীশ্বর অংশ দ্বারা অবতীর্ণ হইয়াছেন। অপরঞ্চ

"রামাদয়ো হরেরংশাঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।"

রাম প্রভৃতি বিষ্ণুর অংশাবতীর্ণ, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ। (সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান, বৈরাগ্য, এই ষড়ৈশ্বর্য্য) (স্বয়ংপদদ্বারা তত্তদ্দেবতার উপাসকেরা মাত্র পূর্ণ বলিয়া জ্ঞান করেন।)

কিন্তু, উপনিষৎ প্রভৃতিতে, পরব্রহ্মের জরা ও মরণাদি মুক্তকণ্ঠে অস্বীকার করিয়াছেন। যথা "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ। নায়ং কুতশ্চিন্নবভূব কশ্চিৎ।" উপনিষৎ।

পরব্রহ্ম জন্ম গ্রহণ করেন না ও মরেণও না। (এই মতে ব্রহ্মের মেড়ীরগর্ভে জন্ম হয় এবং ক্রমে মোহজালে বিদ্ধ হইয়া লীলা সংবরণের কথাও নাই) এবং পর ব্রহ্ম এই সকল দৃশ্য বস্তুর মধ্যে তিনি কোন বস্তুই নহেন ও কোন বস্তুও হয়েন নাই। অপিচ

ন জায়তে ন ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বান ভূয়ঃ।
অজোনিত্যঃ শশ্বতোয়ং পুরাণোন্ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

মহাভারতীয় ভগবদ্গীতা। ২ অং

পরমাত্মা (পরব্রহ্ম) যে হেতুক অজ বটেন। অতএব জরা গ্রহণ করেন না এবং যে হেতুক তিনি নিত্য, এই নিমিত্তে মরেণও না। কোনও কালে তিনি জরা গ্রহণানন্তর পুনর্ব্বার আর জন্মিবেনও না, তিনি সনাতন ও পুরাণ পুরুষ, শরীর বিনষ্ট হইলেও তিনি (পরমাত্মা) বিনষ্ট হইবেন না।

এই অভিপ্রায় সমস্ত হিন্দুধর্ম্ম পুস্তকে অঙ্কিত রহিয়াছে। শাস্ত্রে স্থল বিশেষে প্রথমাধিকারীর ঈশ্বর পথে প্রবর্ত্তনার্থে কোন দেবতা কিংবা দেবাবতারকে, পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া বর্ণিত রহিয়াছে। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মের কোন স্থলে ও এমন উল্লেখ নাই যে নিরাকার নির্ব্বিকার পরব্রহ্ম মনুষ্য গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। সাকারবাদিরা ঈশ্বরের তেজোময় মূর্ত্তি স্বীকার করেন।

৩য়। হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী মানবগণ কোন মধ্যবর্ত্তী মহাত্মাকে (পেগম্বরদিগকে) স্বীকার করেন না। খৃষ্টানেরা যেমন প্রত্যেক প্রার্থনার শেষে "প্রভুও পরিত্রাতা যিশু দ্বারা তুমি আমাকে পরিত্রাণ কর" এইরূপ বলিয়া থাকেন। হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী মানবগণ সেইরূপ বলেন না।

নবি, অর্থাৎ পেগম্বরে বিশ্বাস শেমীয় (১) ধর্ম্মাবলম্বিদিগের মধ্যে

(১) ঐসকল ধর্ম্ম শেম বংশোদ্ভব জাতির মধ্যে প্রকাশিত রহিয়াছে। এই নিমিত্তে সেই ধর্ম্মকে শেমীয় বলা হইল। য়িহুদি ও আরবেরা ঐ বংশোদ্ভব জাতি।

প্রচলিত আছে। এই শ্রেণীর ধার্ম্মিকগণ য়িহুদি, খৃষ্টান, ও মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ে পরিগত। পেয়গম্বরে বিশ্বাস ঐ সকল ধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণ।

যেকোন একটী বিশেষ ব্যক্তি (সম্ভ্রান্ত রাজাদিগের দৌবারিকের ন্যায়) আমাদিগকে ঈশ্বরের নিকট লইয়া যাইতে সক্ষম বটেন, তিনিই ঈশ্বরের নিকট যাইবার একমাত্র পথ প্রদর্শক, এইরূপ ব্যক্তিকেই পেয়গম্বর বলে।

এইরূপ ব্যক্তিকে ঈশ্বরও উপাসক এই দু'য়ের মধ্যবর্ত্তী করিয়া ঈশ্বরের উপাসনার পদ্ধতি হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত নাই।

হিন্দুগণ জীবন্মুক্ত, শুক, নারদ ও প্রহ্লাদ প্রভৃতিকেও ঈশ্বর উপাসনাতে স্মরণ বা ঈশ্বর প্রাপণের সহায় বলিয়া কদাপিও মনে করেন না। কেবল সদুপদেশক বলিয়া মহর্ষিদিগকে বলেন।

মুসলমানদিগের ধর্ম্মপুস্তকে (কোরাণে) এক ঈশ্বরের উপাসনা করিবার উপদেশ আছে। কিন্তু তাঁহারা বলেন, ঈশ্বরের উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে মহম্মদের অনুগ্রহ ব্যতীত ঈশ্বর তাঁহাকে মুক্তি দিতে পারিবেন না। (এইরূপ যুক্তি পত্র ঈশ্বরের মহম্মদের নিকট স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে। যুক্তিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই বিষয়ে বিচার করুন।) মৃত্যুর পরে শেষ বিচারের শুননির দিন মহম্মদ তাঁহার অমান্যকারী আসামীকে যেই আমি ইহাকে, (যত কেন ঈশ্বরপরায়ণ না হউক) এই পাপাত্মাকে চিনি না, অমনিই ঈশ্বর তাহাকে অনন্তকালের নিমিত্তে নিরয়ে নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

খৃষ্টানিদিগের মধ্যেও কেহ কেবল ঈশ্বরকে আরাধনা করিলে মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম হইবেন না। সঙ্গে সঙ্গে যিশুখৃষ্টের উপাসনার আবশ্যকতা। যদি কেহ বলেন "আমি নিরবয়ব ঈশ্বরের সমুদয় আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছি, কেন আমার উদ্ধার হইবে না?" খৃষ্টানদিগের মতে তাহার তবে মুক্তি হইবে না! হইবে না!, হইবে না! কারণ তিনি খৃষ্টানের উপাসনা করেন নাই। খৃষ্টের উপাসনা ব্যতীত কেবল ঈশ্বর মুক্তি দান করিতে শক্ত নহেন। (মুক্তিদান

করা এক জনের সাধ্যায়ত্ত নহে, মুক্তি একজনে কিরূপে প্রদান করিবে?

হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রকারেরা কেবল ব্রহ্মজ্ঞানকেই মুক্তির কারণ বলিয়া নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন।। যত প্রকার ধর্ম্মপুস্তক আছে এবিষয়ে সকলেরই ঐকমত্য।।

এই বিষয়ে সংক্ষেপে প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে। যথা "এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ! নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি। স্থিত্বাস্যামন্তকালেপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি।।"

ভগবদ্গীতা। ২ অং। ৭২

হে পার্থ! পূর্ব্ব কথিতরূপে তোমার নিকটে ব্রহ্ম বিষয়ক অনুষ্ঠান বলা হইল; এই ব্রহ্ম বিষয়ক অনুষ্ঠান করিলে কোন ব্যক্তিই আর মোহিত হয় না। মরণ সময়েও (বালক কালাবধি অনুষ্ঠান করিলে, নির্ব্বাণ মুক্তি হইবেই) এই ব্রহ্মজ্ঞানানুষ্ঠানে স্থিত হইলে ব্রহ্মে জীবত্মার ঐকাত্মক নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ করিবে।

পুণ্যক্ষেত্র কাশী মরণ প্রভৃতিতেও শিব মুমূর্ষুর কর্ণে পরব্রহ্মের উপদেশ প্রদান করিয়া জীবকে নির্ব্বাণ মুক্তি প্রদান করেন। যথা "কর্ণে তৎ পরমংব্রহ্ম দদামি মামকং পদং" কাশীখণ্ড।

কর্ণে সেই পরব্রহ্মোপদেশ করিয়া নির্ব্বাণ পদ প্রদান করিব। ইত্যাদি। সুতরাং হিন্দুধর্ম্মে মুক্তি লাভের নিমিত্তে কোন মধ্যবর্ত্তীর উপাসনার আবশ্যক করে না।

৪র্থ। হিন্দুধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্মাপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ হওয়ার অন্যতম কারণ এই, ইহাতে পরমেশ্বরকে হৃদয়স্থ জানিয়া উপাসনা করার উপদেশ রহিয়াছে। যথা "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন! তিষ্ঠতি"

ভগবদ্গীতা। ১৮ অং। ৬১

হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সমুদয় প্রাণীর হৃদয়দেশে বিরাজমান রহিয়াছেন।।

অপিচ।

"বহিরন্তশ্চ ভূতানাং অচরংচরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎতদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থঞ্চান্তিকেচ তৎ।" গীতা

প্রাণীদিগের (সর্ব্বভূতের) বাহ্য ও অভ্যন্তরে, সচল ও অচল, পরব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন। সূক্ষ্মত্ব নিবন্ধন তিনি দুর্ব্বিজ্ঞেয় এবং তিনি দূরস্থ ও নিকটস্থও বটেন।

"দিবি ভূমৌ তথাকাশে বহিরন্তশ্চ যোবিভুঃ"।

যোগবাশিষ্ট।

স্বর্গে ভূমিতে এবং আকাশে ও বহির্ভাগেও অভ্যন্তরে যে বিভু (পরব্রহ্ম) বিরাজ করিতেছেন, ইত্যাদি কি বাইবেল, কি কোরাণ, কি আর কোন প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্র, কোথাও এরূপ উপদেশ পাওয়া যায় না। এইটী হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ গৌরবের স্থল। ঈশ্বরকে হৃদয়স্বরূপে পরিজ্ঞাত হইলে ঈশ্বরকে যেমন নিকটস্থ বলিয়া দেখা যায়, তেমন আর অন্য প্রকারে দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা নাই।

৫ম। হিন্দুধর্ম্ম, অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে প্রধান হওয়ার অন্য কারণ এই যে, ইহাতে যোগশাস্ত্রের বিশেষ যোগ রহিয়াছে। যোগশাস্ত্র যেইরূপ প্রত্যক্ষ শাস্ত্র, এইরূপ আর কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। এইস্থলে সংক্ষেপে কিঞ্চিন্মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। যোগশাস্ত্র-প্রধান পাতাঞ্জল দর্শনে "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"। এই সূত্র দ্বারা বাহ্য বিষয় হইতে চিত্তবৃত্তির অবরোধ করিয়া ঈশ্বরের সম্বন্ধে যোগ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

নকুলীশ পাশুপত দর্শনেও উক্ত হইয়াছে। "চিত্তদ্বারণেশ্বরসম্বন্ধো যোগঃ সচ দ্বিবিধঃ ক্রিয়ালক্ষণঃ ক্রিয়োপরমলক্ষণশ্চ ক্রিয়োপরমলক্ষণঃ সংবিদ্যেত্যাদি"। চিত্তদ্বারা ঈশ্বর সম্বন্ধকে যোগ কহে। সেই যোগ দুই প্রকার, ক্রিয়ালক্ষণ ও ক্রিয়াত্যাগ লক্ষণ। ক্রিয়াত্যাগ লক্ষণ যোগ ব্রহ্মজ্ঞানানুষ্ঠানকে কহে। যোগশব্দের অর্থ দ্বারাও ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। "যুজ্যতে ঈশ্বরে চিত্তমানমুষ্ঠানেন ইতি যোগঃ"। পরমেশ্বরে চিত্তের যোজনা হয় যে অনুষ্ঠানদ্বারা, তাহারই নাম যোগ। এই যোগের আটটী অঙ্গ, যথা যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধ্যানধরনাসমাধয়ো হষ্টাবঙ্গানি। পাতাঞ্জল দর্শন। ১ যম। ২ নিয়ম। ৩ আসন। প্রণায়াম। প্রত্যাহার। ৬ ধ্যাণ। ৭ ধারণা। ৮ সমাধি। এই

অষ্টাঙ্গ যোগ। যমাদির লক্ষণ প্রবন্ধ বিস্তৃতিভয়ে প্রকাশিত হইল না। এই যোগানুষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ফল যোগশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যথা—

"শোধনং দৃঢ়তাচৈব স্থৈর্য্যং ধৈর্য্যঞ্চ লাঘবং।
প্রত্যক্ষঞ্চ নির্লিপ্তঞ্চ ঘটস্য সপ্তশোধনং"।

১। শোধন। ২দৃঢ়তা।৩ স্থৈর্য্য। ৪ ধৈর্য্য। ৫ লাঘব। ৬। প্রত্যক্ষ এবং ৭ নির্লিপ্ত (মুক্তি) এই সাতটী ঘটের (শরীরের) শোধক বটে।

"ষট্‌কর্ম্মণা শোধনঞ্চ আসনেন ভদ্দেৃঢ়ং।
মুদ্রয়া স্থিরতাচৈব প্রত্যাহারেণ ধীরতা। ১১
প্রাণায়ামাল্লাঘবঞ্চ ধ্যানাৎ প্রত্যক্ষমাত্মনঃ।
সমাধিনা নির্লিপ্তঞ্চ মুক্তিরেব ন সংশয়ঃ। ১২

ঘেরণ্ড সংহিতা।

১।ধৌতি প্রভৃতি ষট্‌কর্ম্মদ্বারা শরীরের শোধন হয়। (তাহাতে নিরোগী হইবে) ২ সিদ্ধাসন, পদ্মাসনাদির দ্বারা শরীরের দৃঢ়তা জন্মে। (তদ্বারা শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা হয়) ৩। মহামুদ্রা নভোমুদ্রা প্রভৃতির অনুষ্ঠানে শরীরেরও মনের স্থিরতা জন্মে। (তদ্বারা ঈশ্বরের একাগ্রতা হয়) ৪। বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহরণ দ্বারা ধৈর্য্য জন্মে। (তদ্বারা ঈশ্বরে অবিচলিত চিত্তের স্থিতি হয়) ৫। প্রাণায়ামদ্বারা শরীরের লঘুতা জন্মে। (তদ্বারা বায়ুবামনের ন্যায় যথেষ্ট গমন ক্ষমতা হয়) ৬। ধ্যানানুষ্ঠানের দ্বারা পরমাত্মার প্রত্যক্ষ হয়। ৭। এবং সমাধি দ্বারা (চরম যোগানুষ্ঠানের দ্বারা) নির্লিপ্ত, অর্থাৎ মুক্তি হয়, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১১। ১২

ক্রমশঃ।

(১২) হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল বাবু কালীমোহন দাসের আদেশানুসারে মৎসঙ্কলিত "যোগসংগ্রহ" নামক মুদ্রিত পুস্তকে যোগের বিষয় দ্রষ্টব্য।

১২৯৮ সাল। ষষ্ঠ বর্ষ ভাদ্র।

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

লেখকগণ।

Printed by Udoya Churan Pal, At the New Balmick Press,
159, Manicktolla Street, Calcutta.

বিজ্ঞাপন।

ওয়েষ্ট এণ্ড ওয়াচ কোম্পানির চাবিশূন্য। লেভার ঘড়িই সর্ব্বদা ব্যবহারে পক্ষেই উৎকৃষ্ট।

যদি কারুগিরিতে অথবা উপদানে কোনরূপ দোষ লক্ষিত হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া হয় অথবা বিনা ব্যায়ে মেরামত করিয়া দেওয়া হয়। তজ্জন্য সম্পূর্ণ রূপে গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়।

১। যে হেতু আমাদের নির্ম্মিত ঘড়ি প্রত্যেক বৎসর মেরামত করিবার আবশ্যক হয় না।

২। যদি প্রকৃত যত্নের সহিত ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে এই একটি ঘড়িতে জীবন কাটিয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত প্রকারে ঘড়ি সকল ভারতবর্ষের সকল ঘড়ি বিক্রেতার নিকট অথবা ওয়েষ্ট এণ্ডকোম্পানির এজেণ্ট গণের নিকট পাওয়া যায়।

ওয়েষ্ট এণ্ড কোম্পানির চাবিশূন্য ক্যাম্পেনের (অর্থাৎ মাঝারি সাইজ), সিভিল (অর্থাৎ ছোট সাইজ) ঘড়ি যাহার জন্য তিন বৎসরও গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়।

ওপেন ফেস (অর্থাৎ আবরণ বিহীন) নিকল রৌপ্যকেশ ১৮৷৷০; খাঁটিরূপার-কেস্ ৩০৷৷; হণ্টিং (আবরণ সহিত) ২০৲; বার্ণা” ৩৩০৷৷, হাপহণ্টিং (অর্দ্ধ আবরণ সহিত)” ১২৷৷০ ” ৩৫৷৷০

ওয়েষ্ট এণ্ড কোম্পানির গার্ড ঘড়ি বড় সাইজ, ষ্টানডার্ড কোয়ালিটী হয় বৎসরের গরোণ্টি। নিকল রৌপ্য-কেস্ ২৫৲ খাঁটি রৌপ্যকেস ৪০।

এস্পিসিয়াল কোয়ালিটি তিন বৎসরের গ্যারাণ্টি। নিলরৌপ্য কেস ২০৲ ওয়েষ্ট এণ্ড ওয়াচ’কোম্পানির কেলেণ্ডর ওয়াচ, অপরাপর সাধারণ ঘড়িরন্যায় সময় প্রদান ব্যবীত ইহাতে সাপ্তাহিক দিন এবং মাসের তারিখে দেওয়া আছে (বড় এবং মাঝারি সাইজ) ওপেনফেস ২৫৲, হণ্টিং (আবরণ সহিত)

ওয়েষ্ট এণ্ড ওয়াচ কোম্পানির ক্যাম্পেন ফুলপ্লেট ঘড়ি (মাঝারি সাইজ) পতাক্তি নির্ম্মিত হেয়ারস্প্রীং দ্বারা উপযুক্তরূপে প্রস্তুত বলিয়া বর্ষাকালে মরিচা ধরিবার অথবা ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভবনা নাই। ছয় বৎসরের গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়।

ওপেনফেস (অর্থাৎ আবরণ শূন্য খাঁটি রৌপ্য কেস ৪০৲ও নিকল ২৫৲।

“বার্ণা”—নিকলরূপার আশ্চর্য্য ধরণের চাবিশূন্য লেভার ঘড়ি যাহার মুল্য কেবলমাত্র ১২৷৵০ বারটাকা বার আনা মাত্র।

ভয়ানক অনুকরণ কাণ্ড হইতেছে সাবধান। আবেদনকারীকে বিশেষ বিবরণের সহিত সচিত্র মুল্য নিরূপন পত্র বিনামুল্যে দেওয়া যায়। ওয়েষ্ট এণ্ড ওয়াচ মেনুফেকচারিং কোম্পানির এজেণ্টগণ তাহাদের দায়িত্বে ভারতবর্ষ ও এপ্রদেশে সকল স্থানে ভেলুপেয়েবেল পার্শেলে পাঠাইয়া থাকেন।

১২ নং লালবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা, ওয়েষ্ট এণ্ড ওয়াচ কোম্পানি ২৯ নং চার্চ গ্রেট ষ্ট্রীট বোম্বাই সহর।

ষষ্ঠ বর্ষ।

ষষ্ঠ ভাগ। ভাদ্র সন ১২৯৮ সাল। পঞ্চম খণ্ড।

দেবি! প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতে, নিত্যং যথা সুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানিসর্ব্বজগতাঞ্চশমং নয়াশু, উৎপাত পাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্॥

হিন্দুদিগের আবার ব্যবহারের শ্রেষ্ঠতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যোগানুষ্ঠানের প্রত্যক্ষ শুভ ফল সকলের প্রসিদ্ধ প্রমাণ, সংক্ষেপে এই মাত্র দেখাইলেই হইতে পারে।

১। কাশীস্থ যোগীবর তৈলঙ্গস্বামী কোন্ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে এইরূপ দেবত্ব লাভ করিয়াছেন।

২। চট্টগ্রামস্থ প্রসিদ্ধ তীর্থরাজ গস্তিবন বাবাজী যোগানুষ্ঠান বলেই বহুকাল তীর্থরাজত্ব করিয়াছিলেন।

৩। পঞ্জাবী যোগি হরিদাস বাবজী ছয় মাস কাল পর্য্যন্ত মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত ছিলেন, মহারাজ রণজিৎ সিংহ তদুপরি রোপিত ধান্যাদি শস্যের পরিপকাবস্থায় ছেদনানন্তর যোগিবরকে উঠাইয়া অবিকৃতাবস্থ

দেখিয়া বিস্মিত হন। তৎকালে গবর্ণজেনেরল মহোদয় তাহা দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন "আমি এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করা দূরে থাকুক শ্রুতিগোচরও করি নাই। ধন্য হিন্দু ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফল।"

৪। মান্দ্রাজের যোগিবর ত্রাটক সিদ্ধি বলে সার্দ্ধ ত্রিহস্ত উর্দ্ধে উঠিতে সক্ষম ছিলেন।

৫। কলিকাতার ভূকৈলাশে আনীত যোগিবরের বিষয় অনেকেই জ্ঞাত আছেন। প্রজ্বলিত বিষ কাষ্ঠের ধূম নাসিকাতে প্রবেশ করাইয়া বহুকষ্টে তাঁহার চৈতন্য হইয়াছিল। (মৎ প্রকাশিত যোগ সংগ্রহে বা শিব সংহিতায় ইহার সংক্ষিপ্ত ইতি বৃত্ত বিবৃত আছে তাহা দ্রষ্টব্য) যোগ শাস্ত্রের প্রত্যক্ষীভূত শুভফল সকল সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধই রহিয়াছে। তদর্থে প্রয়াস বাহুল্য বলিলেও হয়। এই আর্য্য ধর্ম্মস্থিত যোগের বিষয় বিজাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতৃগণ ঘুণাক্ষরেও অবগত ছিলেন না। অবগত থাকিলে স্ব স্ব ধর্ম্ম পুস্তকেও যোগ অনুষ্ঠানের পদ্ধতি সন্নিবেশিত করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের ন্যায় তাঁহাদিগের ধর্ম্মও উপাদেয় এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট করিয়া তুলিতেন, সুতরাং হিন্দু ধর্ম্ম হইতে অন্যান্য ধর্ম্ম সকল যোগ সম্বন্ধ রহিত হইয়া নিকৃষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে।

হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্রে যোগ শাস্ত্র যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচারিত হইয়াছে। এমন আর কোনও ধর্ম্মে নির্ব্বাচিত হয় নাই। অনেকের সংস্কার যোগানুষ্ঠান করিতে হইলেই গৃহত্যাগী ও সন্ন্যাসী হইতে হয়। গৃহত্যাগ করা ঈশ্বরের অনভিপ্রেত সুতরাং হেয়।

ইহার উত্তর এই যিনি ঈশ্বর প্রেমে প্রমত্ত হইয়া গৃহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন করুন; কিন্তু যোগ শাস্ত্রে গৃহ পরিত্যাগের উক্ত হয় নাই, বরং স্বদেশে বা স্ব গৃহেই যোগানুষ্ঠান বিষয়ের বিধি প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—

"দূরদেশে তথারণ্যে লোকাবাসে জনান্তিকে
যোগারম্ভং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ সিদ্ধিহা ভবেৎ।" ৩

ঘেরণ্ড সংহিতা।

দূরদেশ, কানন, বহুলোকাকীর্ণ স্থান এবং জল সমীপে যোগানুষ্ঠান

করিবে না, করিলে সিদ্ধির হানি হয়। (ইহা দ্বারা কানন বর্জ্জন হইতেছে সুতরাং গৃহত্যাগ নিসিদ্ধ।)

"স্বদেশে ধার্ম্মিক স্থানে সুভিক্ষে নিরুপদ্রবে।"। ইত্যাদি।

৫ উ—৫।

স্বীয় জন্ম ভূমিতে, ধার্ম্মিক স্থানে এবং যেখানে অনায়াসে ভিক্ষা লাভ হয় ও উপদ্রব রহিত স্থানে যোগানুষ্ঠান করিবে। ৫

নীতিজ্ঞ শান্তি শতককার বলিয়াছেন। যথা

"বনেপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিনো, গৃহেপি পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহস্তপঃ।"

বিষয়াসক্ত ব্যক্তির বনেও ইন্দ্রিয় ঘটিত দোষ সকল সম্ভব হয়। এবং গৃহে থাকিয়াও যদি বাক্য, হস্ত, পদ, গুহ্য, এবং শিশ্ন, এই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করিতে শক্ত হইলে তাহাকেই তপস্যা বলে। সুতরাং গৃহে থাকিয়া যে যোগাদির অনুষ্ঠান না হইতে পারে হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্রের এইরূপ অভিপ্রায় কোথাতেও নাই। বরং উপযুক্ত পুত্র, ভার্য্যাদি প্রতিপালনে সক্ষম হইলে প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয়ে পঞ্চাশৎ বর্ষীয় ব্যক্তি বনে গমন করিয়া প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিতে পারেন। যথাস্মৃতি।

"পুত্রেষু ভার্য্যাং সংযোয্য বনং পঞ্চাশতং ব্রজেৎ।"

পুত্রের প্রতি ভার্য্যের ভরণ ভার নিয়োজন করিয়া, পঞ্চাশবর্ষী হইয়া বনে গমন করিবে। দেবঋণ, ঋষিঋণ, এবং পিতৃঋণ (পুত্রোৎপত্তি দ্বারা পিতৃঋণ হইতে উদ্ধার হওয়া যায়) বিদূরিত না করিয়া বনে গমন করিলে বরং বহু শাস্ত্রে নিন্দা শ্রবণ দেখিতে পাওয়া যায়। ঋণত্রয় হইতে বিমুক্ত হইয়া মোক্ষে মনোনিবেশ করিবে। তবে যদি সংসারে নিতান্তই বিরক্তি হইয়া থাকে তবে সেই কালেই সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে। যথা

"ঋণত্রয় মপাকৃত্য মনোমোক্ষে নিবেশয়েৎ।
যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ।"

এ বিষয়ে মনুদেবও বলিয়াছেন। যথা,—

"অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ।"

মনু। ৬ অং। ৩৫

ঋণত্রয় দূরীকৃত না হইলে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলে মানবের অধঃ-

পাতে হয় এবং মনুদেব গৃহস্থাশ্রমকে সর্ব্ব আশ্রম হইতে শ্রেষ্ঠ, বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা,—

"গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ সত্রীনেতান বিভর্ত্তিহি।"

সর্ব্বাশ্রম হইতে গৃহস্থাশ্রম শ্রেষ্ঠ। যে হেতু গৃহী ব্যক্তি দ্বারা ব্রহ্মচারী, বাণপ্রস্থ ও ভক্ষুক পরিপালিত হইয়া থাকে। অতএব গৃহী ব্যক্তি ও পরমোৎকৃষ্ট যোগানুষ্ঠান করিয়া সমুদয় ধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য হইতে সক্ষম। হিন্দু ধর্ম্মের যোগশাস্ত্রে অন্যান্য ধর্ম্মাপেক্ষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইল।

হিন্দু ধর্ম্মের প্রাধান্যের অন্য কারণ এই যে, হিন্দু ধর্ম্মে নিষ্কাম উপাসনার বিধি সকল রহিয়াছে। যদিও সকাম নিষ্কাম দ্বিবিধ বিধিই হিন্দু ধর্ম্মে দৃষ্ট হয়, তথাপিও সকাম উপাসনাকে নিকৃষ্ট উপাসনা বলিয়া প্রত্যেক স্থানেই নিন্দাবাদ রহিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রে নিষ্কাম উপাসনার বিধিমাত্রও দৃষ্টি গোচর হয় না। অন্যান্য সকল ধর্ম্মে কেবল পারলৌকিক সুখ লালসা প্রত্যাশায় ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিধান দৃষ্ট হয়। হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, কোন ফল কামনা না করিয়া কেবল ঈশ্বর প্রীত্যর্থে ঈশ্বরের উপাসনা করিবেক। উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যথা—"উপাসতে পুরুষং হ্যকামাস্তে শুক্রমেতদতি বর্ত্তন্তি ধীরাঃ।"

যে সুধীর ব্যক্তি নিষ্কাম হইয়া সেই পরম পুরুষের উপাসনা করেন, তাঁহার জন্ম গ্রহণ আর করিতে হয় না। ভগবদ্গীতাতে উক্ত হইয়াছে।

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তু মাফলেষু কদাচন।
মাকর্ম্মফল হেতুর্ভূর্মাতে সাঙ্গোহস্তুকর্ম্মাণি॥"

২।অং৪৭।

শ্রীধর স্বামীকৃত টীকা তর্হি সর্ব্বকর্ম্মফলানি পরমেশ্বরারাধনাদেবভবিষ্যতি ইত্যভিসন্ধায় প্রবর্ত্তেতে আশঙ্ক্য তদ্বারয়ন্নাহ কর্ম্মণীত্যাদি। তত্ত্বজ্ঞানার্থিনঃ কর্ম্মণ্যেবাধিকারঃ তৎফলেষু বন্ধহেতুষু অধিকারোমাস্তু। ননু কর্ম্মণিকৃতেতৎ ফলং স্যাদেবভোজনে কৃতে তৃপ্তিবদিত্যাশক্যাহসাকর্ম্মফলহেতুঃ। কর্ম্মফলং প্রবৃত্তিহেতুর্যস্যতথামাভূঃ কাম্যমানস্যৈব স্বর্গাদের্ভোজ্য-

বিশেষণত্বেনফলকত্বাদকামিতং ফলং নস্যাদিতিভাবঃ। অতএব ফলং বন্ধনং ভবিষ্যতীতি ভয়াদকর্ম্মণি কর্ম্মাকরণেপি তবসঙ্গোনিষ্ঠামাস্ত।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, অর্জ্জুন! পরমেশ্বরের আরাধনা দ্বারাই সমস্ত কর্ম্মের ফল সফল হইবে, এই অভিসন্ধান পূর্ব্বক ও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ার মনন করিও না। তত্ত্বজ্ঞানের ইচ্ছুক তোমার কর্ম্মেই অধিকার হউক। কর্ম্মজনিত বন্ধ হেতুক ফলে যেন অধিকার হয় না। যদি বল ভোজন করিলে যেমন তৃপ্তি হয়, সেইরূপ কর্ম্ম করিলে অবশ্যই ফল হইবে, এই আশঙ্কাও করিও না। কর্ম্মফল যেন তোমার প্রবৃত্তির (কর্ম্ম করণের প্রবৃত্তির) কারণ হয় না। কাম্যমান ব্যক্তিরই স্বর্গাদি ফল জন্মে। অকামিত ফল হয় না। অতএব কর্ম্মজনিত ফল বন্ধক হইবে এই ভয়ে যেন তোমার কর্ম্ম না করিতেও প্রবৃত্তি হয় না। নিষ্কামরূপে উপাসনায় প্রবৃত্ত হও। ৪৭

যাঁহারা বিবিধ যজ্ঞাদি কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন তাঁহারাও কর্ম্ম সংপূর্ণের পূর্ব্বে "এতৎ কর্ম্মফলং ব্রহ্মার্পণ মস্তু।" "ময়া যদেতৎ-কর্ম্মকৃতং তৎসর্ব্বং ভগবন্নারায়ণে সমর্পিতং।"

এই বলিয়া কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া থাকেন। গীতাতেও উক্ত হইয়াছে যথা।

"যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষিদদাসিযৎ।
যৎতপস্যসি কৌন্তেয়! তৎ কুরুষ্বমদর্পণং।" ২৭।৯।অং

অর্জ্জুন! তুমি যে কর্ম্ম কর, যাহা ভোজন কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, তাহা আমাতে (ঈশ্বরেতে) অর্পণ কর। ২৭। যে ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া (ধন ধান্য পুত্র পৌত্রাদি প্রাপণ প্রত্যাশায়) ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাঁহাকে ধর্ম্ম বণিক বলিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

"ধর্ম্মবাণিজিকামূঢ়াঃ ফলকামানরাধমাঃ।
আপ্নুবন্তি জগন্নাথং তেকামানাপ্নুবন্ত্যথ।
তিথিতত্ত্বধৃতস্মৃতি।

ধর্ম্মবাণিজি (অর্থাৎ ধর্ম্ম দ্বারা যাঁহারা বাণিজ্য করেন ঈশ্বরকে

দ্রব্যাদি দ্বারা অর্চ্চন করেন, ঈশ্বর ধনাদি অভিলষিত ফল প্রদান করেন এইরূপ বাণিজ্য কারকেরা) মূঢ় (অজ্ঞান), ফলকামী নরাধম ব্যক্তিরা জগন্নাথ পরমেশ্বরকে উপাসনা করেন, অনন্তর তাঁহারা অভিলষিত ফল সকল লাভ করিয়া থাকেন। এই স্থলে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ রহিয়াছেন, ফ ামীরা মূঢ় এবং নরাধম। তাহা দিগের ধর্ম্মকে ও নিন্দা করিয়াছেন!

"ব্যবসায়াত্মিকাবু ঃ সমধৌন ধীয়তে"।

গীতা। ২। অং

ব্যবসায়াত্মক কর্ম্ম সকল সমাধিতে (পরমেশ্বরে চিত্তের একাগ্রতা রূপ ব্যাপারে) প্রশস্ত নহে। ইত্যাদি।

অজ্ঞ অধিকারীর কর্ম্মে প্রবর্ত্তনার্থে সকামকর্ম্মের পদ্ধতি প্রকাশ হইয়াছে। বালকদিগকে যেমন লড্ডুক ভক্ষণকরার লোভ দেখাইয়া নিম ভক্ষণ করাইয়া রোগ নিবৃত্তি করায়, সেইরূপ অজ্ঞদিগকে ধনাদির লোভ দেখাইয়া কর্ম্মে প্রবর্ত্তন করাইয়া ক্রমে ক্রমে নিষ্কাম উপাসনায় প্রবত্ত করাই শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত।

এই বিষয়ে স্মৃতিতে মলমাস তত্ত্বের মুমুক্ষু প্রকরণে অতীব বিস্তৃত ও বিশদরূপে বর্ণিত রহিয়াছে। বাহুল্য ভয়েও বহু শাস্ত্রের বচন লিখিতে হয় বলিয়া যুক্তি প্রসঙ্গে অনুপযুক্ত বিবেচনায় উপেক্ষিত হইল। (মৎ প্রণীত ও মুদ্রিত উপাসনোল্লাসিনীর ১ম খণ্ডে তৎ বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা ও মীমাংসা প্রদর্শিত হইয়াছে।)

হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী ভাষাপদ্য লিখকগণও এই বিশুদ্ধ নিষ্কাম উপাসনার ভাব স্বগ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। কাশীরামদাসকৃত মহাভারতে লিখিত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির কহিতেছেন।

"আমি যত কর্ম্ম করি ফলাকাঙ্ক্ষা নাই।
সমর্পণ করিসব ঈশ্বরের ঠাঁই।
কর্ম্ম করি যেই জন ফলাকাঙ্ক্ষী হয়।
বণিকের মত সেই বাণিজ্য করয়।
ফললোভে কর্ম্ম করে গরু বলি তারে।
লোভে পুনঃ পুনঃ যায় নরক দুস্তরে।

ধর্ম্ম কর্ম্ম করি ফলাকাঙ্ক্ষা নাহি করে।
ঈশ্বরেতে সমর্পিলে অবহেলে তরে।
ধর্ম্ম ফল বাঞ্ছা করি ধর্ম্ম গর্ব্ব করে।
ধর্ম্মেরে করিয়া নিন্দা অধর্ম্ম আচরে।
এই সব জনেরে পশুর মধ্যে গণি।
বৃথা জন্ম যায় তার পায় পশুযোনি॥

হিন্দু ধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্মাপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ বিষয়ে ইহাও একটী কারণ যে, ইহাতে সর্ব্বভূতের প্রতি সমভাবে দয়া করিবার উপদেশ রহিয়াছে। যথা—"মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি" ইতিশ্রুতি। সমুদয় ভূতকেই হিংসা করিবেক না। "অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং" গীতা। সমুদয় ভূতের প্রতি দ্বেষ রহিত হইবে। "সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ"। গীতা। শত্রু মিত্রে সমান দৃষ্টি করিবে। "সর্ব্বভূত হিতেরতঃ" সমুদয় ভূতের হিতানুষ্ঠানে রত হইবে। ইত্যাদি কোটিশঃ, প্রমান রহিয়াছে। বাইবেল ও কোরাণে কেবল মনুষ্যের প্রতি দয়া করিতে উপদেশ দেয়, পশু পক্ষী প্রভৃতির কণ্ঠ নালিতে এক পোঁচ দিয়া ফেলিয়া রাখিবে, ছটফট করিয়া যত কষ্টে মরিবে ততই অনন্ত কাল মহম্মদের স্বর্গীয় রাজ্যে সুখে বাস করিতে পারিবে।

হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রকারদিগের কেবল মনুষ্যের প্রতিই প্রশস্ত দয়া করার উপদেশ এইরূপ নহে। সকল ভূতকেই দয়া করিবে। হিন্দু ধর্ম্মের সাত্বিক মতে বলিদানাদির সম্পূর্ণ নিষেধ। "যথা সাত্বিকী জপযজ্ঞাদৌ নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ।" সাত্বিকী পূজাজপযজ্ঞ নৈবেদ্য ও নিরামিষ দ্বারা অনুষ্ঠান করিবেক। রাজসিক ও তামসিক পূজাতে বলিদানের বিধি থাকিলেও তাহার নিন্দা শ্রুতিও হিন্দু ধর্ম্মের স্থানেই রহিয়াছে। উত্তম অধিকারী সাত্বিক। মধ্যম রাজসিক, এবং তামসিক অধিকারীকে অধম বলিয়াছে। এবং "তামসা নিরয়ংযান্তি" তামসিকেরা নিরয়ে গমন করিবে। এই ভয়ও প্রদর্শন করিয়াছেন।

পরকাল সম্বন্ধেও হিন্দু সম্বন্ধীয় মত সকল অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে উৎকৃষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে। নিরয়ে গমন সকল ধর্ম্মেই উক্ত হই-

য়াছে। কেবল নাস্তিকেরাই পরকাল মানেন্ না। মৃত্যুকেই মোক্ষ বলে। যোনি ভ্রমণ অর্থাৎ পাপী মনুষ্য মৃত্যুর পরে পশুযোনি, পক্ষী যোনি কীট-যোনি অথবা নিকৃষ্ট মনুষ্য যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিবে। এই মত সম্প্রদায় বিশেষের নিকট উপহাসিত হইলেও এবং স্থূল দর্শীরা অকর্ম্মণ্য বলিয়া উপেক্ষিত বোধ করিলেও ইহাতে হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতাব প্রকাশ পাইতেছে।

মুসলমানধর্ম্মে ও খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মে অনন্ত স্বর্গ ও অনন্ত নরকের বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

পুণ্যবান ব্যক্তি অনন্ত কাল স্বর্গ ভোগ করিবে, পাপী ব্যক্তি অনন্ত কাল নিরয়ে নিপতিত থাকিবে। এই সকল মতে পাপীদিগের আর পরিত্রাণের আশা বা সম্ভাবনা নাই। কিন্তু, হিন্দু ধর্ম্ম পাপী-দিগকেও আশা প্রদান করিতেছেন। যোনি ভ্রমণ দ্বারা পাপী ব্যক্তির পাপক্ষয় হইলে, সে পুনরায় উন্নতির পথে পদার্পণ করিতে পারিবে। এমন কি ইঁহারা শপথ করিতে ও যোনি ভ্রমণাত্মক শাস্তি হওয়ার শপথ করিতেন। যথা তীর্য্যগ্ যোনি "গচ্ছাবালে নচেন মব বুধ্যস্তো" মহাভারত বিরাট পর্ব্ব। দ্রৌপদীর নিকট অর্জ্জুন বলিয়াছেন প্রিয়ে! আমি যদি তোমার দুঃখ না বুঝিয়া থাকি, তবে যেন আমার পশু বা পক্ষী যোনিতে জন্ম গ্রহণ হয়। এবং অভিসম্পাত করিতে ও তীর্য্যাগ্ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করার বিষয় বলিতেন। প্রমত্ত নৃগ রাজাকে কৃকলাস যোনিতে (কাক লাস জন্মিতে) জন্ম গ্রহণ শাপ প্রদান করিলেন। কথা। "রাজ্ঞঃ প্রমত্তস্য নৃপস্য শাপতো দ্বিজস্য তীর্য্যক মথাহরাঘবঃ। রামগীতা।

প্রমত্ত নৃগ রাজের ব্রাহ্মণের শাপে তীর্য্য হইয়াছিল, এবং দেবযোনি হইতে ও মনুষ্যাদি যোনিতে জন্ম গ্রহণ বা পশুযোনি প্রভৃতিতে উৎপন্ন হওয়ার বিবরণ পুরাণ প্রসঙ্গে ও কাব্যশাস্ত্রে বহুতর ইতি হাসই বর্ণিত রহিয়াছে। মেঘদূতের যক্ষ, রঘুবংশের অজ কর্ত্তৃক শাসপ মোচন প্রভৃতি অনেকেই অবগত আছেন। স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে। যথা।

"দরিদ্রং ব্যাধিতং মূর্খং ভর্ত্তারং নানুগচ্ছতি।
সামৃতা লভতেব্যালী বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ॥

পরাশর সংহিতা।

অর্থ দরিদ্র ও পীড়িত এবং মূর্খ ভর্ত্তাকে যে স্ত্রী অনুগমন না করেন, সেই স্ত্রী মরণান্তর সর্পিণী হয়, এবং মানবী হইয়াও বার বার বিধবা হয়। এই বিভীষিকা দ্বারা পাপ ভীরুর বর্ত্তমান সময়েও পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্তির মনন হইতে পারে। এবং পরত্র পশুযোনি লাভ, মত ভেদে উহা সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক,—কিন্তু ইহা যে পূর্ব্বোল্লিখিত বিজাতীয় ধার্ম্মিকদিগের মত হইতে ঈশ্বরের ন্যায়পরতার ও করুণাভাবের সঙ্গে অধিক সঙ্গত তাহার আর সন্দেহ নাই।

পুণ্যবান ব্যক্তি এক লোক হইতে উৎকৃষ্টতর অন্য লোকে গমন করিবেন। পরকাল বিষয়ে হিন্দু ধর্ম্ম মতের এই উৎকৃষ্ট অংশে বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাইতেছে। আত্মার এইরূপে ক্রমোন্নতি স্বভাবের উন্নতি-শীলতার সহিত সুসঙ্গত। আত্মা যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মলোকে গমন পূর্ব্বক নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ না করেন সে পর্য্যন্ত এইরূপে ক্রমিক উন্নতি দ্বারা পরে নির্ব্বাণ লাভ করিতে সক্ষম হইবে, ইহাই চিন্তাশীল হিন্দুধর্ম্মকারদিগের মত। ছান্দোগ্য উপনিষদে এক স্থানে ব্রহ্মলোকের বিষয়ে এইরূপ চমৎকার বর্ণন রহিয়াছে যথা—

"নৈনং সেতু মহোরাত্রে তরতঃ ন জরা নমৃত্যুর্ন শোকো ন সুকৃতং ন দুস্কৃতং সর্ব্বে পাপানো ইতো নিবর্ত্তন্তে। অপহত পাপ্মা হ্যেষ ব্রহ্মলোকঃ।

তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বা অন্ধ মনন্ধো ভবতি বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধোভবতি উপতাপীসন্নমুপতাপী ভবতি তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বাপি নক্ত মহরেবা ভিনিষপদ্যতে। সকৃদ্বিভাতো হ্যেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ।"

অর্থ। এই আত্মার সেতুর এ পারে দিনরাত্রি নিয়মিত রূপেই হইতেছে, ওপারে দিনও নাই রাত্রিও নাই এবং জরা ও শোক নাই, সুকৃত (পুণ্য) ও নাই দুস্কৃত (পাপ) ও নাই ইহা পুণ্য জ্যোতিতে সদা পবিত্র রহিয়াছে। জীব. ই র ওপারে উত্তীর্ণ হইলে পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, ইহা

নিষ্পাপ ব্রহ্মলোক। এই সেতুর পর পারে উত্তীর্ণ হইলে অন্ধও অনন্ধ হয়, দিব্য চক্ষুঃ লাভ করে। সংসারের দুঃখ ক্লেশে বিদ্ধ ব্যক্তিও অবিদ্ধ হয়। পাপেও দোষে উপতাপী ব্যক্তিও অনুপতাপী হয়। এই সেতুকে উত্তীর্ণ হইলে রাত্রিও দিনের সমান রূপ আলোক অনুভব করে। এই ব্রহ্মলোকে নির্ম্মল আলোক কদাপিও নির্ব্বাপিত হয় না ইহা সর্ব্বদাই প্রকাশিত রহিয়াছে।

শ্রীভগবদ্গীতাতেও উক্ত হইয়াছে।

নতদ্ভাসয়তে সূর্য্যো নশশাঙ্কোন পাবকঃ।

যদ্‌গত্বানিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ১৫ অং ৭।

অর্থ। যে ধামকে সূর্য্য ও চন্দ্র এবং অগ্নি প্রকাশ করেন না (অথচ স্ব প্রকাশ) যে স্থানে গমন করিলে আর পুনর্ব্বার আগমন করিতে হয় না সেই পরম ধাম ব্রহ্ম স্বরূপ আমায় জানিবে। অপিচ,—

"যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।"

যে স্থান প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্ব্বার আগমন করিতে হয় না। সেই পরম ধাম ব্রহ্ম স্বরূপ আমায় জানিবে। ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা অন্যান্য স্থান হইতে প্রতিনিবর্ত্ত হইয়া পরিশেষে ব্রহ্মলোকে গমন পূর্ব্বক অপুনরাবৃত্ত হয় আর আসিতে হয় না হিন্দুদিগের এই পারলৌকিক মত ও অন্যান্য ধর্ম্মাপেক্ষায় সযৌক্তিক ও শ্রেষ্ঠতম বটে।

হিন্দুধর্ম্মের উদারতা সর্ব্ব ধর্ম্মাপেক্ষায় অধিক। খৃষ্ট্রীয় ও মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বিরা বলেন্ "আমাদের এই ধর্ম্ম না মানিলে এবং অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত না হইলে অনন্তকাল নরকে নিপতিত হইবে।" হিন্দুদিগের ভাব এইরূপ সঙ্কোচিত নহে, হিন্দুদিগের মুখ্য উপদেশ এই যে যাহার যে ধর্ম্ম সে ব্যক্তি সেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই নিস্তার পাইতে পারিবে।

এই বিষয়ের প্রমাণ যথা ভগবদ্গীতা।

শ্রেয়ান স্বধর্ম্মোবিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।

স্বধর্ম্মেনিধনং শ্রেয়ঃ পর ধর্ম্মো ভয়াবহঃ—" ॥ ৩।অং।৩৫ শ্লোক—

অর্থ। সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ পর (বিজাতীয়) ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে অঙ্গহীন স্বীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানও শ্রেষ্ঠ জানিবে। স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে মরণ হইলেও স্বর্গ প্রাপ্তি

প্রভৃতি শ্রেয়ঃ সাধন হয়। এক জাতীয়ের ধর্ম্ম অন্য জাতিয়ের নিষিদ্ধ প্রযুক্ত তাহা ভয়াবহ প্রত্যবায় জনক। এই প্রমাণ দ্বারা অন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হইতেছে। বিজাতীয়েরা বলেন তাঁহাদিগের ধর্ম্ম অন্যধর্ম্ম হইলেও তদ্ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিলেই নিশ্চয় নিরয় প্রাপ্তি হইবে।

কিম্বদন্তী আছে, একজন হিন্দুকে যবনধর্ম্মাবলম্বী করিতে পারিলে প্রযোজকের মক্কায় মসজিদ্ দেওয়ার ফল লাভ হয়। এবং হিন্দুকে খৃষ্টান করিতে পারিলেও প্রভুযীশুর ক্রুশ স্থানের উপরে গির্জা দেওয়ার ফল হয়। হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রের কোনও স্থানে এমন বিধি নাই বা কিম্বদন্তীও নাই যে একজন মুসলমানকে বা খৃষ্টানকে হিন্দু করিতে পারিলে কাশীতে মঠ দেওয়া হইল।

হিন্দুধর্ম্মকারগণ বলেন্ যে কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান না করুন্ পরকালে এক পরমেশ্বরই সকলের গম্যস্থান।

গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্পদন্ত মহিম্নঃ স্তোত্রে বলিয়াছেন। যথা

"ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতি মতং বৈষ্ণবমিতি।
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্য মিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজু কুটিল নানা পথ জুষাং।
নৃণামোকোগম্য স্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥

বেদোদিত সনাতন ধর্ম্ম, সাঙ্খ্য ধর্ম্ম, যোগানুষ্ঠান, পশুপতি মত (শৈব) এবং বৈষ্ণব ইত্যাদি ধর্ম্ম বিষয়ে বিবিধ প্রস্থান (পন্থা) থাকিলেও সকলেরই স্বীয় স্বীয় অনুষ্ঠিত ধর্ম্মকে পরম পথ্য (একান্ত সেব্য) বলিয়া থাকেন্। কিন্তু মনুষ্যদিগের রুচির বিচিত্রতা নিবন্ধন সরল বা বক্র পথগামী মানবগণের এক পরমেশ্বর তুমিই প্রাপনীয় হও; যেমন সরল বা বক্র পথগামী নদী সকলের পরিশেষে এক সাগরই প্রাপণীয় হয়। এইরূপ ঔদার্য্য এইরূপ সারল্য আর কোন ধর্ম্মেও দৃষ্টি গোচর হয় না। হিন্দুধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও ঈশ্বর পরায়ণ হইলে তাহাকে সাধু বলিয়া জ্ঞান করিবে যথা—

"অপিচেৎ সুদুরাচারোভজতে মামনন্য ভাক্।
সাধুরেব সমন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতোহিসঃ। ৩০

মাং হি পার্থব্য পাশ্রিত্য যেপিস্যাঃ পাপযোনয়ঃ।
স্রিয়োবৈশ্যাস্তথাশূদ্রা স্তেপিযান্তি পরাং গতিং। ৩১
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।"

গীতা ৯ অং।

দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্য চিত্তে ঈশ্বর সেবায় নিযুক্ত হয় তবে তাঁহাকে সাধু বলিয়া জানিবে যে হেতুক সেই ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে ব্যবসায়ী (ঈশ্বরনিষ্ঠ) হইয়াছে। ৩০

যে কোনও পাপযোনি জাত ব্যক্তিও যদি ঈশ্বরে (আমাকে) বিশেষ-রূপে আশ্রয় করে তবে সে স্ত্রী বা বৈশ্য বা শূদ্র যে কোন জাতি হউক না কেন, পরমাগতি (নির্ব্বাণ) (বা নিত্য সিদ্ধতা) লাভ করিতে পারিবে। ৩১।

ঈশ্বর পরায়ণ পুণ্যশীল ব্রাহ্মণ বা ভক্ত রাজর্ষিগণ যে মুক্ত হইবে তদ্বিষয়ে আর জিজ্ঞাসা কি ?

অপিচ। "চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি পরায়ণঃ।"

হরিভক্তি পরায়ণ নরাধম চণ্ডাল ও অভক্ত ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ জানিবে।

"চাণ্ডালোস্তু সতুদ্বিজোস্তু গুরুরিত্যেষা মনীযামম"

মনীযা পঞ্চক

ঈশ্বর পরায়ণ ব্যক্তি চণ্ডালই হউক আর ব্রাহ্মণই হউক তিনিই আমার গুরু। এইরূপ জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ শঙ্কর স্বামী নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা হিন্দু ধর্ম্মের উদারতা স্থানে স্থানেই প্রকাশিত রহিয়াছে। এমন কি যাহারা হিন্দু ধর্ম্মের বিদ্বেষ্টা অসুর বা রাক্ষসেরা প্রায় সর্ব্বদা হিন্দুধর্ম্মের বিঘ্ন উৎপাদন করে হিন্দু ধার্ম্মিকেরা সেই পাপাত্মাদিগকেও ধর্ম্মাধিকারে বঞ্চিত বা ঈশ্বরের পরিত্যজ্য বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। যথা,—শ্রীমদ্ভাগবতে,—

"কিরাত হুনন্দ্রে পুলিন্দ পুক্কসা আবীর পক্ষী যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেন্যেস্তপাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ সুধ্যন্তিতস্মৈ প্রভ বিষ্ণবে নমঃ—

কিরাত, হুন, অন্ধ, পুলিন্দ, পুক্কস, আবীর, কঙ্ক, যবন, ও খস প্রভৃতি

জাতীয়লোক এবং অন্যান্য পাপাচারী ব্যক্তিগণ যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শ্রেষ্ঠ হয় সেই জগত্ত্রয়ের প্রভু বিষ্ণুকে নমস্কার।

ইহা দ্বারা কি হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ ঔদার্য্য সর্ব্ব প্রাণিতে সমান দয়া, এবং সকলকে ঈশ্বর পরায়ণ করার প্ররোচনা প্রকাশ পাইতেছে না?

ঈদৃশ হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীকে বিজাতীয় ধার্ম্মিকগণ বিধর্ম্মী, কাফের, এবং অনন্তকাল অনন্তনরক ভোগ করিবে বলিতে সঙ্কোচিত হয় নাই, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

জপ।

—০—

মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছেন ঝিনুকের দ্বারা সিঞ্চন করিয়া সমুদ্রের জলাভাব কল্পনা করা যাইতে পারে, কিন্তু মনের চাঞ্চল্য দমন করা অতি দুরূহ। মনে সাত্ত্বিক ভাবের প্রাবল্য করিবার জন্য শাস্ত্রের অশেষ হিতশাসন ও সাধন পথ রহিয়াছে। অষ্টাঙ্গ যোগের যম, নিয়ম, আসন ও প্রণায়াম পর্য্যন্ত অঙ্গ গুলি যথা বিহীত রূপে সাধিত হইলে অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য জন্মে। অন্তঃকরণকে আয়ত্ত করিবার জন্যই অশেষ সাধন পথ নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। মনকে যিনি বশীভূত করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত পক্ষে আত্মবান্। তাঁহার আত্মাই স্বাধীন, তিনিই যথার্থ স্বাধীন। বাহ্য জগতে স্বজাতীয় রাজা থাকিলেই স্বাধীন, অন্তর্জগতের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলেই ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভুত্ব আবশ্যক। সসাগরা ধরনীর অদ্বিতীয় সম্রাট ও ইন্দ্রিয় কিঙ্কর হইয়া থাকিলে সম্পূর্ণ পরাধীন। দুর্দ্দম রিপুনিচয় মনোরাজ্যে অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিয়া মানুষকে স্ব স্ব পথে বিচলিত করে। মানুষ তাহার দাস হইয়া তদনুকুল আহার বিহারে চরিতার্থ বোধ করে, কিন্তু সে সুখে সুখ হয় না, আশার তর্পন নাই, অভিলাষের বিরাম নাই, নিয়ত নব নব বিষয়ের আশায় মন আকুল থাকে। ইন্দ্রিয়দাস বিষয়

বিপিনে বিচরণ করিয়া পাপবল্লীতে আবদ্ধ হয়। ক্রমশঃ গতিশক্তি বিহীন হইয়া অন্তরে অন্তরে বিষম যাতনা অনুভব করে। এই জন্য ঋষিগণ অশেষ সাধনে ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিতেন, সুতরাং হৃদয় অনাবিল ও স্বচ্ছ ছিল। স্বার্থপরতাদি কুভাব তাঁহাদের অন্তর হইতে অন্তর্হিত ছিল। মন যখন যে ব্যাপারে নিযুক্ত থাকে, তখন বিষয়ান্তর ভাবনায় অক্ষম থাকে। এক সময়ে দুই ব্যাপারে মন ব্যাপৃত হইতে অসমর্থ, অতএব মনকে যদি সদ্ভাবে ব্যাপৃত রাখা যায়, সাধুভাবে রক্ষা করা যায়, তবে মনের সৎশক্তি জন্য ক্রমশঃ প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে। কলুষ ভাবের ক্ষয় দ্বারা আত্মা, স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে। এবং মনোমন্দির হইতে কুচিন্তাবলী সমূলে উৎপাটিত হইতে পারে। অভ্যাসবলে মনের বেগ তখন সম্পূর্ণরূপে সদ্দেশে থাকে, কাজেই অশেষ ইষ্টসাধন হইয়া থাকে এই জন্য নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান একটি অঙ্গ জপ নিয়মিত হইয়াছে। ঘোর কলিকালে যেমন অন্যান্য বিষয়ে বিষম বিকার উপস্থিত, তেমন জপাদি মুখ্য নিত্য কর্ম্মের নানা রূপ ব্যভিচার উপস্থিত হইয়াছে।

মহামুনি পাতঞ্জলি যোগ দর্শনে একটি সূত্র সূত্রিত করিয়া বলিয়াছেন "তজ্জপস্তদর্থ চিন্তনম্" তদর্থ চিন্তার নাম জপ। চিন্তা করিতে হইলেই ইতর বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক লক্ষ্যার্থের চিন্তা করিতে হইবে, মনকে এক ব্যাপারে ব্যাপৃত করিতে হইবে, মনে এক ধারণা থাকিবে, এক তান প্রতীতি থাকিবে। বহির্বিষয়ে একরূপ আন্ধ্যতা ঘটিবে। যখন কোন ব্যক্তি তুন্নবায়ের কার্য্য আরম্ভ করেন, সূচিতে সূত্র প্রবেশ করাইতে প্রয়াস পান, তখন দেখা যায় অনেকেই অনন্যমনে উহা নিষ্পাদন করেন, এমন কি তখন অনেক সময়ে শ্বাসাদি প্রাণন ক্রিয়া পর্য্যন্ত রহিত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থা অনেকেরই ঘটিয়া থাকে, উহাকেই মনের একতানতার প্রকৃত উদাহরণ রূপে উপস্থাপিত করা যাইতে পারে। অভ্যাস বলে জপ সময়েও তদ্রূপ মানসিক ক্রিয়া হইলে জপ সুসমাহিত হইল, এরূপ বলা যাইতে পারে এবং অচিরে জপ ফল লাভ হইবে এরূপ আশা করা যাইতে পারে। যথা বিহিত রূপে

নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে মুক্তি দ্বার অনাবৃত হয়, ইহাই শাস্ত্রোপদেশ। নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠাতা, ক্রমশঃ উন্নত হইবেন, ইহাই আশার বিশ্রাম স্থল। অনুষ্ঠেয় কর্ম্মগুলি অল্প অল্প করিয়া সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে নিস্পাদিত করিতে হইবে। দীক্ষাবধি এপর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে, দেখিতে পাইব, কল্যও যাহা ছিল আজ তাহা হইতেও ন্যূন হইয়া বিষয় বাসনা বলবতী হইয়া অনুষ্ঠানে নানা প্রকার বাধা জন্মাইতেছে। কোনরূপে ব্রত রক্ষা করিয়া মনকে প্রবোধ দেই, অথবা লোকের নিকট অনুষ্ঠাতার বেশ প্রদর্শন করি। ধ্যান কালে ধ্যেয় বিষয় অন্তরে প্রায় আবির্ভূত হয় না, যদিও কদাচিৎ বিদ্যুৎ বিকাশবৎ বিকাশিত হয়, তৎক্ষণাৎ বিষয়ের ছবি প্রকাশিত হয়। হয়ত প্রেয়সীর মোহন মূর্ত্তি অন্তরে অন্তরে বিভাষিত, অথবা অর্থার্জ্জনের পদ্ধতি চিন্তা করি। কোন সময়ে শত্রু-নিপাতের সাধন সমাধান করি, কোন সময়ে বা পরের সর্ব্বনাশ চিন্তা করিয়া তাহার জপনা উপস্থিত করি। জপের সময় তদর্থ চিন্তা কোন রূপেই থাকে না। বিষয়ের মূল মন্ত্র জপে মনে যত উৎসাহ, উপাস্য দেবতার্থ চিন্তায় তাহার সহস্রাংশের একাংশও উৎসাহ বা উদ্যম থাকে না। হস্তে জপমালা কুম্ভ-চক্রের ন্যায় নিয়ত বিঘূর্ণিত হইতে হইতে ক্ষয় প্রাপ্ত হইল, গ্রন্থিগুলি শিথিল হইল, কিন্তু হৃদয়গ্রন্থি কোন রূপেই ছিন্ন হয় না। জপ সময়ে অন্যের সহিত আলাপ করিতেছি, অন্যকে কার্য্যের উপদেশ দিতেছি, সাংসারিক ব্যাপার নির্ব্বাহের বন্দোবস্ত করিতেছি। হাতের মালা হাতেই আছে, সুতরাং আমি জপ-পরায়ণ, নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠাতা, সাধু, ধার্ম্মিক। কিন্তু আমার অন্তর নিতান্ত কলুষিত। মন কলুষ কালিমায় ঘোর তমসাচ্ছন্ন। দিনান্তে দশ বারও রীতি পূর্ব্বক জপ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছিনা। অন্তরের এইরূপ ক্লীব ভাব বিদূরিত করিতে আমার বড় প্রয়াস আছে, ইহাও মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি না, কারণ যাহাতে মনের সত্ত্বভাব বলবৎ রূপে প্রচারিত হয়, এরূপ আহার বিহারের অনুষ্ঠান করি না। শ্রুতিতে আছে "আহার শুদ্ধৌ সত্ত্ব শুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ"। জপের লক্ষ্য মনোমন্দিরে নিয়ত প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইলে, আহার শুদ্ধির

আদৌ প্রয়োজন। আহার শুদ্ধি বলিতে কেবল সাত্ত্বিক ভোজন বলা শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে। আহার বিহারাদির শুদ্ধিই এ স্থলে আহার শুদ্ধি। আমরা যখন কোন বিষয় অভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন কায়মনোবাক্যে দিবানিশি তাহারই অনুধ্যান করিয়া থাকি। তদনুকূল কার্য্য কলাপের সমাদর করি, ইহাতে তদ্বিষয়ে মনের দৃঢ়তা জন্মিয়া গাঢ় সংস্কার উৎপাদন করে। কিন্তু ধেয় ধ্যানে, উপাস্য উপাসনে, পূজ্য পূজনে, জপ্য জপনে মনের গতি কেন জানি তেমন হয় না, প্রথম যদিও কিঞ্চিৎ উৎসাহের আগম হয়, অল্পকালে তাহা বিলীন হইয়া যায়। আর্থিক অবস্থার উন্নতিই এখন উন্নতি বলিয়া বিবেচিত হয় এবং তৎসাধনেই নিরন্তর চেষ্টা থাকে। কিন্তু আত্মার উন্নতি; মনের উন্নতি, দেহের পবিত্রতা কত দূর বৰ্দ্ধিত হইয়াছে, তৎপ্রতি প্রায়ই লক্ষ্য থাকেনা। অশেষ-বিষয়-চতুরতা বুদ্ধিমত্তার জ্ঞাপক হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু সুবুদ্ধি প্রায়ই-সুদূর পরাহত। বিষয়প্রবণান্তর, ইন্দ্রিয়-দাস আমি, জ্ঞাতা। রূপরস গন্ধস্পর্শ শব্দ বিষয় পঞ্চক একান্ত জ্ঞেয়, সুতরাং জ্ঞান ও তদনুরূপ হইতেছে। এবং ভূত প্রমাতার জপে সুফল লাভ নিতান্ত দুরাশা। জপ তিন প্রকার, বাচিক, উপাংশু ও মানস।

"ত্রিবিধো জপযজ্ঞঃ স্যাৎ তস্য ভেদং নিবোধত।
বাচিকশ্চ উপাংশুশ্চ মানসশ্চ ত্রিধামতঃ॥" নারসিংহে

এই ত্রিবিধ জপের মধ্যে, বাচিক হইতে উপাংশু শ্রেয়ান্। আবার উপাংশু হইতে মানস জপ শ্রেয়ান্। মানসজপ সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ।

"ত্রয়ানাং জপযজ্ঞানাং শ্রেয়ানবঃ স্যাদুত্তরোত্তরঃ।" নারসিংহে।

বাচিক জপ—যে স্থলে উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বর সংযোগে স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হয় তথায় বাচিক জপ। ব্রহ্মযজ্ঞ অর্থাৎ বেদপাঠে উদাত্তাদি স্বর ক্রমে পাঠ করিতে হয় উহাও জপ। এই বিধির অভি-প্রায়ানুসারে ইহা বলা যাইতে পারে যে, যে সমস্ত মন্ত্রে উদাত্তাদি স্বর নাই তাহার বাচিক জপে হ্রস্ব দীর্ঘাদি মাত্রার রক্ষা এবং বর্ণাদির যথোচিত উচ্চারণ পূর্ব্বক পাঠ করিতে হইবে। নচেৎ জপ শুদ্ধ হইবে না। জপাদি-স্থলে কেবল তদর্থ চিন্তা দ্বারা ইষ্টলাভ এবং দুর্গতি বিনাশ যেমন হইয়া

থাকে তেমন তন্মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারাও একটি সুফল ঘটিয়া থাকে। এজন্য শ্রুতির শাসন রহিয়াছে যে, অপশব্দাদির ব্যবহার করিবে না। সাধূচ্চারণের সহিত জপ হইলেই পূর্ণাঙ্গ জপ হইয়া থাকে। কোন কর্ম্ম পূর্ণ না হইলে পূর্ণ ফলের আশা করা অসঙ্গত। জপ একটি যজ্ঞ। এই জন্য প্রাগুক্ত শ্লোকে জপযজ্ঞ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যজ্ঞে অপ শব্দ ব্যবহার করা বড়ই নিষিদ্ধ। "না যজ্ঞিয়াং বাচং বদেৎ" এই শ্রুতির শাসন উহার বোধক এবং এতাদৃশ শ্রৌত শাসন আরও রহিয়াছে।

"তস্মাদ্ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতবৈ নাপভাষিতবৈ ম্লেচ্ছোহবাযদেষ অপশব্দঃ"।

অতএব বাচিক জপ, জপের মধ্যে নিম্ন প্রকারের হইলেও স্বরও বর্ণ গ্রামোচ্চারণে বিশেষ সাবধান থাকিতে হয়। স্নানান্তে সন্ধ্যাদি ক্রিয়া শেষে মন সুকুমারতা প্রাপ্ত হয় তখন বাচিক জপ-যোগে চিত্তের স্থৈর্য্য ও শান্তি উপস্থিত হইতে দেখা যায়। কোন বাধা না ঘটিলে কতক সময় মনে সত্ত্বভাব পরিস্ফুরিত হইয়া রূপকার্য্য একরূপ সমাহিত হয় এরূপ বলা যায়। এরূপ জপে দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা বিঘ্ন না ঘটিলেও শ্রবনেন্দ্রিয় অনেক সময় বাধা জন্মাইয়া থাকে। নিভৃতে বসিয়া বাচিক জপ সাধন করিলে অনেক সময় আমার মত দুর্গত মানুষের ও মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, কিন্তু শ্রবনের ক্রিয়া প্রায়ই রুদ্ধ হয় না। তবে তার স্বরে উদাত্তাদি স্বর বিন্যাস করিলে যদি সেই স্বরের নিকট বহিঃস্থ স্বর মন্দ হয়, তবে কোন বাধা হয় না বটে, কিন্তু পুনঃপুনঃ শব্দিত হইলে বাচিক জপ-রব পরাভূত হইয়া যায়, সুতরাং বাধা ঘটে। অন্তরের স্থৈর্য্য ও অনেকক্ষণ থাকে না। আমার মত লোকের নিকট বাচিক জপের ক্রিয়া আংশিক অনুষ্ঠিত হইতে পারে মাত্র।

উপাংশু—ঈষৎ ওষ্ঠ চালনা করিয়া ধীরে ধীরে মন্ত্র উচ্চারণ করিলে উপাংশু হইয়া থাকে। তাহাতে যৎ কিঞ্চিৎ শব্দ শব্দিত হইবে তাহা স্বয়ং ভিন্ন অন্যে জানিতে পারিবে না। অধুনা অনেক লোকেই এই পথের পান্থ। পাণিনী ব্যাকরণের বৈদিক প্রক্রিয়া সাধক সূত্রের উদাহরণ সময়ে উপাংশুর উদাহরণ প্রদর্শনার্থ "গথাজলে নিমগ্নস্য" এরূপ উদাহরণ প্রদর্শিত

হইয়াছে। জলমগ্ন ব্যক্তি কথা কহিতে চাহিলে তৎকালে তাহার ওষ্ঠ চালনা হইয়া থাকে, কথা পরিস্ফুরিত হয় না। উপাংশু, মানস ও বাক্যি যাগের মন্ত্রোচ্চারণ কালে পূর্ব্বোল্লিখিত স্বরত্রয় সংযোগে পাঠ করিতে হয় না তখন একস্বরে পাঠ করিলেই হয়, "যজ্ঞএক শ্রুতিঃ" ইত্যাদি পানিনি শাসন উহার জ্ঞাপক। এস্থলে বর্ত্তমান প্রচলিত ভাব দ্বারা কাহারও ভ্রান্তি ঘটিতে পারে বলিয়া লিখিত হইতেছে যে, উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিনটিই স্বর। হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত উহা মাত্রা। একমাত্র হ্রস, দ্বিমাত্র দীর্ঘ, ত্রিমাত্র প্লুত আর ব্যঞ্জন অর্দ্ধমাত্র। পরিমাণকে মাত্রা বলে। যত সময় উচ্চারণ ক্রিয়া চলিবে তাহার বোধক, মাত্রা।

"উ দাত্তশ্চানুদাত্তশ্চ স্বরিতশ্চ স্বরাত্রয়ঃ।"

নারদীয়া, ও পাণিনীয় শিক্ষা

একস্বরে পাঠ করিতে হইলেই সমান স্বরে অর্থাৎ স্বরিতস্বরে পাঠ করিতে হইবে এরূপ বুঝিতে কোন সন্দেহ থাকা কর্ত্তব্য নহে।

মানস—জিহ্বা ও ওষ্ঠ চালন না করিয়া বর্ণার্থ সন্ধানাত্মক মানস অভ্যাসে মানস জপ-ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। মানস জপে ফলাধিক্য কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আয়াস সপেক্ষা। মনের চাঞ্চল্য থাকিলে মানস জপ হইয়া উঠেনা। মনঃ সংযোগ সহজ নয়। মানস জপ দশবার নিষ্পাদন করা কঠিন। তপস্যার অসাধ্য কিছুই নাই। অধ্যবসায়ে অনেক কর্ম্মই সুসাধিত হয়। সুতরাং মানস জপ একেবারে অসাধ্য নহে। কিন্তু সুসাধ্য নহে। যাহার মন উন্নত ও পবিত্র কুপ্রবৃত্তিগুলি তাহার নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। শয়নে স্বপনে জাগরণে মানসিক উন্নতি জন্য ব্যাকুলতা আছে, অসদ্বিষয় হইতে নিরন্তর অন্তরে থাকিতে চেষ্টা আছে, তাহার পক্ষে মানস জপ শীঘ্রই সুসম্পাদিত হইয়া থাকে। অনেক লোক নানা কারণে বহিরিন্দ্রিয়ের চালনায় স্থগিত থাকেন কিন্তু মনে মনে মনের স্থৈর্য্য সম্পাদনে অক্ষম। ভগবান্ ভূত লোককে মিথ্যাচার বলিয়াছেন। "মিথ্যাচারংশ উচ্যতে" গীতা। মিথ্যাচার ব্যক্তি লোকের নিকট সাধু থাকিলেও লোকনাথের নিকট অসাধু। তাদৃশ ব্যক্তি ও মানস জপে মনশ্চিন্তার বিষয়ীভূত বিষয় ভাবনা গ্রস্ত হইয়া মানস জপ করিতে

পারে না। জপে যাহার অনুরাগ আছে, ইতর কর্ম্মাপেক্ষা জপের সমাদর করিয়া থাকে, যথা সময়ে জপাদি কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকে ক্রমোন্নতি লাভার্থে নানাবিধ যত্ন আছে, আহার বিহারে অতিশয় সাবধান,কুসঙ্গে ঘৃণা আছে, চরমের জন্যে ব্যাকুল, পরকালে আস্থা আছে, ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ম্ম করিয়া নিত্য কর্ম্মে সংশিত ব্রত, শৌচ ও ইন্দ্রিয় সংযমে চেষ্টা আছে, তাহার একদা মানস জপ সমাহিত হইতে পারে। এই ত্রিবিধ জপই প্রচলিত। একের পরে অন্য অবলম্বন করিলে ক্রমে ক্রমে মন পরিষ্কৃত হইয়া শ্রেষ্ঠ কল্পের মানস জপ সাধনে অধিকার জন্মিতে পারে।

"যদ্রোচ্চ'নীচ স্বরিতৈঃ স্পষ্ট শব্দবদক্ষরৈঃ।
মন্ত্রমুচ্চারয়েদ্ব্যক্তং জপ যজ্ঞঃ সবাচিকঃ॥
শনৈরুচ্চারয়েন্মন্ত্রমীষদোষ্ঠৌ প্রচালয়ন্।
কিঞ্চিৎ শব্দং স্বয়ং বিদ্যাদুপাংশুঃ সজপঃস্মৃতঃ॥
ধ্যেয়া যদক্ষরশ্রেণ্যা বর্ণাৎবর্ণং পদাৎপদং।
শব্দার্থ মানসাভ্যাসঃ স উক্তো মানসো জপঃ॥"

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বাচিক জপ উদাত্তাদি স্বর সংযোগে নিষ্পন্ন হইবে কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে বাচিক জপ নিষিদ্ধ, মধ্যভাবে ত্রিস্বর সংযোগে বাচিক জপ করিতে হইবে।

"নোচ্চৈর্জপ্যং বুধঃ কুর্য্যাৎ সাবিত্র্যাস্তু বিশেষতঃ।"

জপ সময়ে কতকগুলি কর্ম্ম নিষিদ্ধ। পাদ চারণ, হাস্য, পার্শ্বাবলোকন, মস্তকে উষ্ণীষাদি ধারণ, কোন কথা বলা অকর্ত্তব্য। এবং অন্যকেও শ্রবণ করাইবে না।

"ন চংক্রমন্ ন বিহসন্ ন পার্শ্বমবলোকয়ন্।
নোপাশ্রিতো ন জল্পংশ্চ ন প্রাকৃতশিরস্তথা॥
ন পদা পাদমাক্রম্য ন বৈ বহিকরৌ স্মৃতৌ।
নৈবং বিধং জপং কুর্য্যাৎ নচসংশ্রাবয়েৎজপম্॥"
উত্তিষ্ঠন্ বীক্ষৎমানোর্ক মাসীনঃ প্রাঙ্মুখোজপেৎ।
প্রাক্কুশেষেব মাসীনো বসানো বাসসী শুভে॥

যদি স্যাৎ ক্লিন্ন বাসাবৈ গায়ত্রী মুদকে জপেৎ।
অন্যথা তু শুচৌ ভূম্যাং কুশোপরি সমাহিতঃ॥

যোগি যাজ্ঞবল্ক্য—

যোগি যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ জপাদির যে সমস্ত বিধান করিয়াছেন উহা গায়ত্রী জপ জন্য হইলেও তদনুসারে বিশেষ বিধান ব্যতীত জপ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে হইবে। অন্যান্য শাস্ত্র সকল বেদানুগত। বেদ বিরুদ্ধ বিধান শিষ্টের অগ্রাহ্য, সুতরাং মানবের প্রতিপালনীয় নহে।

গৌতম বলিয়াছেন জপ ক্রিয়াকালে ক্রোধ, মোহ, হাঁচি নিদ্রা, নিষ্ঠীবন (থুথু ফেলা) হাঁই এবং স্ত্রীজনের প্রতি কটাক্ষও করিবে না। যদি একান্তই ইহাদের সম্ভব ঘটে তবে আচমন পূর্ব্বক সুর পূজিত বিষ্ণু স্মরণ করিয়া পুনর্ব্বার জপে প্রবৃত্ত হইবে।

"ক্রোধং মোহং ক্ষুতং নিদ্রাং নিষ্ঠীবন বিজৃম্ভিতম্।
দর্শনং বনিতানাঞ্চ বর্জয়েৎ জপকর্ম্মণি॥
আচমেৎ সম্ভবেচৈষাং স্মরেদ্বিষ্ণুং সুরার্চ্চিতম্।

জপকালে কথাবার্ত্তা বলা একান্ত নিষিদ্ধ। ব্যাস বলিয়াছেন,"জপকালে নভাষেত ব্রত হোমাদিকেষুচ,"। বাক্যালাপ পরিভ্রমণ, সংক্রমণাদি নিষিদ্ধ হইলেও দেখিতেছি অনেকেই জপ ও ঐ সমস্ত ক্রিয়া যুগপৎ নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। কেহ স্নানান্তে হাটিতে২ জপ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করেন, কেহবা জপ-হস্তে ভোজনাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক উদর-পুর ভোজনে নিযুক্ত হন। কোন কোন জপী অধীনস্থ বা অন্য লোকের সহিত আলাপ ও জপ এক সময়েই সারিয়া ফেলেন। কেহ বা আমাকে জপ-কার্য্য নিরত বলিয়া সুখ্যাতি করুক এই অভিপ্রায়ে আড়ম্বর পূর্ব্বক জপঘটা করিয়া থাকেন, কেহ বা দিবাশেষে ভ্রমণকালে জপমালা বিঘূর্ণিত করিতে করিতে প্রকাশ্য পথে বিচরণ করিয়া থাকেন। নিয়ত জপের বিষয় মানসপটে অঙ্কিত রাখিতে ঘাটে মাঠে পথে সভায় যেখানে ইচ্ছা জপ-ক্রিয়া চালাইতে আপত্তি নাই, কিন্তু ধর্ম্মধ্বজী না হইলেই ভাল। মানুষে প্রচারিত হইবে, এই অভিপ্রায়ে জপাদি কর্ম্ম করিলে কোন ফললাভ হইবে কি? দেহেন্দ্রিয়ের চালনায় মনের অস্থৈর্য্যে জপ-ক্রিয়া কিরূপে নিষ্পাদিত হয়

আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। তবে যাহারা সিদ্ধমনোরথহইয়াছেন, ব্রহ্ম জ্ঞান অন্তরে বিভাসিত, যাঁহাদের বিষয় বাসনা সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হইয়া গিয়াছে, কু অভ্যাস আর ভ্রমেও উপস্থিত হয় না তাদৃশ মহানুভব ব্যক্তি গমন করুক, বা কথা বলিয়া কালক্ষেপ করুক হাস্যপরিহাসাদি যাহাই কেন করুক না তাঁহারা অন্তরে লক্ষ্যভ্রষ্ট হন না। নিয়ত মনোমন্দিরে সেই ঔপনিষদ-পুরুষ বিরাজিত, মন তাঁহাতেই বিলীন। অভ্যাস বশতঃ অন্য কর্ম্মেও বাধা ঘটে না। জপী জপকালে অঙ্গুলীসঞ্চালনাদির যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহাতে জপকার্য্য সুসমাহিত হইতেছে এরূপ বলা যাইতে পারে না। যেমন জপকালে আলাপাদি অন্য কর্ম্ম করা অবিধেয়, তেমন অঙ্গুলী-চালনারও নিয়ম বিহিত আছে।

মধ্যমার দুইপর্ব্ব জপকালে পরিবর্জ্জন করিবে। উহার নাম মেরু। মেরুকে স্বয়ং ব্রহ্মা দূষিত করিয়া গিয়াছেন। অঙ্গুষ্ঠাগ্রে জপ নিষিদ্ধ এবং সংখ্যা-বিরহিত জপ ও নিষ্ফল।

"মধ্যমায়া দ্বয়ং পর্ব্বজপ কালেতু বর্জয়েৎ।
এনংমেরুং বিজানীয়াৎ দূষিতং ব্রহ্মণাস্বয়ম্॥
অঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ যজ্জপ্তং যজ্জপ্তং মেরুলঙ্ঘিতম্।
অসঙ্খ্যাতঞ্চ যজ্জপ্তং তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ॥

মদন পারিজাত।

অঙ্গুলীগুলি কুঞ্চিত করিলে দেখা যায় অঙ্গুষ্ঠ ভিন্ন প্রত্যেক অঙ্গুলীর তিনটী খণ্ড আছে। অঙ্গুলের দুইটী খণ্ড। প্রতি খণ্ড গ্রন্থি সংযুক্ত। এক গ্রন্থি হইতে অন্য গ্রন্থি পর্য্যন্ত খণ্ডের নাম পর্ব্ব। সামান্য ভাষায় উহা পাব বলিয়া চলিত। প্রতি অঙ্গুলীর তিন পর্ব্বেই জপ হইয়া থাকে। মধ্যমার কেবল একপর্ব্ব জপ হইয়া থাকে। অঙ্গুলের কোন পর্ব্ব জপে ব্যবহৃত হয় না কেবল অগ্র পর্ব্ব দ্বারা অন্য পর্ব্বে চালনা করিয়া সংখ্যা করা হয়। অনামিকার মধ্য পর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া তর্জ্জনীর মূল পর্ব্ব পর্য্যন্ত দশধা জপ হইয়া থাকে।

"ত্রিপ্রোঙ্গুল্যাস্ত্রিপর্ব্বাণো মধ্যমা চৈকপর্ব্বিকা।
অনামা মধ্যমারভ্য জপ এবমুদাহৃত॥ পদ্মঃ

এতদ্ব্যতীত আর একটী কথা আছে। জপকালে অঙ্গুলী বিয়োগ করিলে জপ নিষ্ফল হইবে। আর পর্ব্ব সন্ধিতেও জপ নিষিদ্ধ। পর্ব্ব মধ্যে, অঙ্গুষ্ঠাগ্র পর্ব্ব মধ্যে রাখিয়া জপমন্ত্র জপ করিতে হইবে।

"কনিষ্ঠানামিকা মধ্যা চতুর্থী তর্জ্জনীগতা।
তিস্রোঙ্গুল্যস্ত্রিপর্ব্বাণো মধ্যমাচৈক পর্ব্বিকা॥
পর্ব্বদ্বয়ং মধ্যমায়া জপকালে বিবর্জ্জয়েৎ।
এনং মেকং বিজানীয়াৎ দূষিতং ব্রহ্মণাস্বয়ম্॥
আরভ্যানামিকা মধ্যাৎ প্রদক্ষিণ ক্রমেণ তু।
তর্জ্জনীমূল পর্য্যন্তং জপেদ্দশসু পর্ব্বসু॥
অঙ্গুলীর্নবিযুঞ্জীত কিঞ্চিৎ সঙ্কোচয়েত্তলম্।
অঙ্গুলীনাং বিয়োগেতু ছিদ্রেষুস্রবতেজপঃ॥
অঙ্গুল্যগ্রেষু যজ্জপ্তং যজ্জপ্তং মেরুলঙ্ঘনে।
পর্ব্বসন্ধিষু যজ্জপ্তং তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলংভবেৎ॥

পুরশ্চরণ চন্দ্রিকায়াম্।

জপ সম্বন্ধে সাধারণ বিধিগুলি একরূপ বলা হইল। এতদতিরিক্ত আর একটী এই বিধি দেখা যায় যে, দক্ষিণ হস্তে জপ করিতে হইবে এবং উহা বস্ত্রাবৃত করিয়া হৃদয়ে হস্ত রক্ষা পূর্ব্বক জপ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

"হৃদয়ে হস্তমাদায় তির্য্যক্কৃত্বাকরাঙ্গুলীঃ।
আচ্ছাদ্য বাসসা হস্তৌ দক্ষিণেন সদাজপেৎ॥

মন্ত্রকোষে।

এই বিধানে স্পষ্টরূপে দক্ষিণ হস্ত লিখিত না থাকিলেও দক্ষিণ হস্তই বুঝাইবে। নাভির ঊর্দ্ধভাগের কোন কর্ম্ম করিতে হইলে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা নিষ্পন্ন করিতে হইবে এবং নাভির অধোভাগের কোন কর্ম্ম বাম হস্তে নিষ্পন্ন করিতে হইবে। জপকালে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা জপ করিতে হইবে ইহা না বলিলেও বুঝা যাইতে পারে। এখন একটী কথা এই, যে ব্যক্তির দুর্ভাগ্য বশতঃ দক্ষিণ হস্ত অবশ অথবা রহিত তাহার জপ কেমন করিয়া নিষ্পন্ন হইবে? শাস্ত্রে তাহার স্পষ্ট বিধি দুষ্প্রাপ্য। যাহার উভয় হস্ত নাই

তাহারই বা উপায় কি হইবে। এই আপত্তি দ্বারা তাহার জপাদি নিত্য কর্ম্মহইতে মুক্তি লাভ হইবে শাস্ত্রের এরূপ আদেশ নাই। জপ করিবারই বিধি আছে। এমন কি অশৌচকালে মানস জপের বিধানও দৃষ্ট হইয়া থাকে কারণ শাস্ত্র বলেন মনের অশুচি হয় না। সুতরাং হস্ত বিরহিতেরও মানস জপের কোন বাধা নাই। বাহ্যেন্দ্রিয়াভাবে বাহ্যজপেরই বাধা হইতে পারে। বামহস্তবান্ বামহস্ত দ্বারা শৌচ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া, দক্ষিণ হস্ত-করণীয় ব্যাপারও নিষ্পন্ন করিয়া থাকে, অন্যান্য ব্যাপার একহস্তে নিষ্পন্ন হইলে জপের সময় বিরামলাভ অযৌক্তিক। উহা দ্বারাই ক্রিয়া নিষ্পত্তি করিতে হইবে। কর্ম্ম করিবারই বিধি, কর্ম্ম ছাড়িয়া দিবার বিধি নাই। এমন কি জীবন্মুক্ত সিদ্ধমনোরথ মহাজনগণ, কর্ত্তব্যকর্ম্মের পার প্রাপ্ত হইয়াও কেবল লোক সংগ্রহের জন্য পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তদ্দৃষ্টে অন্যলোক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। সিদ্ধগণ যখন কর্ম্মের বহিঃস্থ হইয়াও কর্ম্ম করিতেছেন তখন আর মাদৃশ সদাবদ্ধ জীবের কর্ম্ম না করা শাস্ত্রাদেশে নাই।

অনেকের বন্দনায় অনুরাগ আছে। একান্ত মনে স্তব করিতে ২ মন তগ্দত হইয়া উঠে। তাদৃশ ব্যক্তির বন্দনায়ও ফল লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু বন্দনা সকল সময়ে ঘটিয়া থাকেনা, সন্ধি সময়ে, স্নানান্তে, দেব-গৃহে বন্দনার ভাবাবেগ উপস্থিত হইয়া থাকে কিন্তু জপের অনেক সময় প্রাপ্তি হওয়া যায় কিন্তু জপে মন থাকিতে চায় না। বন্দনা দ্বারা ভক্তিভাব আর্বিভূত হয়, জপে সমাধি লাভ শীঘ্র হয়। জপের ফলাধিক্য থাকিলেও নিষ্পাদন কঠিন। কারণ মনের স্থৈর্য্য ভিন্ন জপ ক্রিয়ার সমাধা হয় না। মনের স্থিরতা অশেষ উপায়ে করিতে হয়, তজ্জন্য জপ কঠিন, অন্ততঃ আমার মত মানুষের নিকট কঠিন। কঠিন হইলেও অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। চেষ্টাও অভ্যাস কালে জপে নিপুণতা জন্মাইয়া থাকে। আমরা যাহা কিছু করি প্রত্যেকেরই ফল কালসাপেক্ষ। সমুচিৎ ধৈর্য্য সহকারে প্রতীক্ষা করিতে হইবে। তৎক্ষণাৎ নিরাশ হইয়া পরিত্যাগ করা সঙ্গত নহে। পূর্ব্বের সহিত বর্ত্তমানের তুলনা করিলে উন্নতি অবনতি নিজেই স্থির করিতে

পারে। তদনুসারে সাবধান হইলেই ভবিষ্যতে উন্নতি হইতে পারে। বলা যত সহজ কার্য্যে পরিণত করা ততোধিক কঠিন।

আমরা যখন কোন সংসারকর্ম্মে বিনিযুক্ত হই তখন যতক্ষণে সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহিত না হয়, কর্ম্মে ফলপ্রাপ্ত না হই। ততক্ষণ তাহা হইতে ক্ষান্তলাভ করি না। সাধনার্থ অশেষ উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। আবশ্যক হইলে নীচজনের পর্য্যন্ত ছন্দানুবর্ত্তন ও তোষামোদ করিতে হয় অর্থের অপ্রতুল হইলে ধার করিয়া থাকি, পরিশোধের ক্ষমতা বা অর্জ্জন ক্ষমতা না থাকিলে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সংগ্রহ করি। কোন সময়ে মার্ত্তণ্ডময়ূখমালা সমাচ্ছন্ন হইয়া গলৎঘর্ম্মে ইষ্টসাধন করি, কখন বা হিমপাত ব্যর্থ করিয়া প্রকৃতির সহিত বিবাদ আরম্ভ করি। প্রাবৃটকালে অবিরল ধারা সম্পাতে সিক্তকলেবরে বসন কদাপি পরিবর্ত্তন করিতে অবসর পাইয়া উঠিনা। সংসারের জন্য সংসারের জ্বালা অম্লান বদনে সহ্য করিতে পারি। শ্বাপদ-সঙ্কুল কাননে বা নক্রাদিযাদোগণপরিপূরিত সাগর গর্ভে প্রবেশ করিতে শঙ্কা করি না, ফলতঃ যাহা বিপজ্জনক তাহাই নিঃশঙ্কে সহ্য করিতেছি। কঠোরতা হইতেও কঠোরতা করিয়া বিশেষ প্রয়াস পাইতেছি কিন্তু জপাদি নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য তেমন গতি হয় না। ধৈর্য্য থাকেনা, অধ্যবসায় আসে না, কঠোরতা সহ্য হয় না, সিদ্ধি-লাভের জন্য সাধুজন সমীপে কিছু জিজ্ঞাসা করি না। যদি কোন অবধূত সৌভাগ্য বশতঃ আবির্ভূত হন তবে তাঁহার নিকট, রোগের ঔষধ, নিজের অর্জ্জন ও চিরায়ুতা, স্ত্রী পুত্রের ও তাদৃশ মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া থাকি। অথবা স্বীয় অভিষ্ট সাধন হইবে কি না তদ্বিষক প্রশ্ন করিয়া থাকি। অনুকূল উত্তর প্রাপ্ত হইলে হৃদয়ে আনন্দ অনুভূত হইয়া থাকে। জপাদির অনুষ্ঠান জন্য আমার চেষ্টা নাই জপফল প্রাপ্ত হই না। পরিশেষে জপাদি দ্বারা কোন ইষ্ট ফল হয় না এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হই। আমাদের দোষে কর্ম্মফল সিদ্ধ হয় না ইহা মনোমধ্যে উদিত হয় না

ভারতের দুর্দ্দিনের সহিত অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে ও ক্রমশঃ অনাস্থা

জন্মিতেছে। জপ তপ প্রায় লোপ পাইতে চলিল। এক এক অঙ্গ ক্রমে সাধনার পথ নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, একটি অঙ্গ যথাবিহীত অনুষ্টিত হইলে অঙ্গান্তরের সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু আমাদের ইচ্ছা কয় সাধনা ব্যতীত অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকি। যাহারা সংসারকে অকিঞ্চিৎকর বোধ করিয়া পর্ণশালায় ফলমূলে জীবন রক্ষা পূর্ব্বক ইষ্টফল সাধন করিতেন, জগতের কল্যাণ চিন্তা করিতেন, শোক মোহ যাহাদের চত্বরের সুদূরেও উপস্থিত হইতে পারিত না পরস্পর হিংস্রক জন্তুগণ যাহাদের মুখাবলোকনে হিংসা দ্বেষ পরিহার করিয়া শান্তভাবে অবলম্বন করিত আজ তাহাদের সন্তানগণ অনুষ্ঠান বিমুখ হইয়া বিলাস পরায়ণ ও মূর্খ হইতেছে। কলির মাহাত্ম্যে আরও কত হইবে শাস্ত্রে তাহাও নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। শীঘ্র আর ভারতে সদাশা নাই। ভারত এখন বিজাতীয় বেশভূষা পরিহিত হইয়া ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে। ধন্য কলি।

শাস্ত্র-ব্যাখ্যা।

—০—

(পঞ্চদশী)

শব্দস্পর্শাদয়ো বেদ্যা বৈচিত্র্যাজ্জাগরে পৃথক্।
ততোবিভক্তা তৎ সম্বিদৈকরূপ্যান্ন ভিদ্যতে ॥ ১ ॥

সকলেই আত্মা বা ব্রহ্ম এই কথাটী জানেন এবং সমস্ত বস্তুর অভ্যন্তরে আত্মা বা ব্রহ্ম আছেন ও আত্মজ্ঞান হইলেই জীব কৃতার্থ হয় ইহাও বিশ্বাস করেন অথচ আত্মা কিং স্বরূপ এবং আত্মজ্ঞান হইলেই বা কি প্রকারে কৃতার্থ বা মুক্ত হওয়া যায় ইত্যাদি বিষয়ে অনেকেই জানেন না। তাহার ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। তন্মধ্যে আত্মা পদা-

থটী কি তাহাই প্রথম প্রতিপাদিত হইতেছে। আমরা জাগ্রদবস্থাতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রসাদি বিষয় সকল পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকি। শব্দ হইতে স্পর্শ ভিন্ন, স্পর্শ হইতে রূপ ভিন্ন, এই প্রকারে ভিন্ন ভিন্নরূপে বিষয়ের জ্ঞান করিয়া থাকি। কিন্তু শব্দ স্পর্শাদির যে জ্ঞান হয়, ঐ জ্ঞানের কোন পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারি না। শব্দের জ্ঞান যেরূপ স্পর্শের জ্ঞান ও ঠিক তদনুরূপ। জ্ঞান বিষয়ে কোনই ভিন্নতা হয় না, অতএব জাগ্রদবস্থাতে শব্দাদি বিষয় পৃথক্ হইলেও তাহার যে জ্ঞান হয়, যে উপলব্ধি হয়, বিষয়ের যে প্রকাশ টুকু হয়—বুদ্ধিতে যে তত্তৎ বিষয়ের স্ফুরণ হয়, তাহা একা সেই জ্ঞান টুকু, সেই প্রকাশ টুকু শব্দ স্পর্শাদি সকলেতেই একাকার।

তথা স্বপ্নেঽত্র বেদ্যন্তু ন স্থিরং জাগরে স্থিরং।
তদভেদতস্তয়োঃ সম্বিদেকরূপা ন ভিদ্যতে॥

স্বপ্নাবস্থাতে যে সমস্ত বিষয়ের উপলব্ধি হয়, তৎ সমস্তই অস্থায়ী, কালান্তরে তাহাদের প্রতীতি হয় না। নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে আর সে সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান হয় না, জাগরণাবস্থায় তাহার বিপরীত, জাগরণাবস্থায় বস্তু স্থায়ী। এইরূপে স্বপ্নে ও জাগরণে বিষয়ের স্থায়িত্ব ও অস্থায়িত্বরূপ ভিন্নতা থাকিলেও জাগরণে বিষয়ের যে জ্ঞান—যে উপলব্ধি স্বপ্নাবস্থায় ও বিষয়ের জ্ঞান ঠিক সেই প্রকার, জ্ঞানগত কোনই পার্থক্য নাই, অতএব স্বপ্ন ও জাগরণাবস্থা ভিন্ন হইলেও অবস্থাদ্বয়ে বিষয়ের যে জ্ঞান টুকু হয়, তাহার কোনই ভেদ নাই॥২॥

সুপ্তোত্থিতস্য সৌষুপ্ততমোবোধো ভবেৎ স্মৃতিঃ।
সাচাববুদ্ধবিষয়াববুদ্ধং তত্তদা তমঃ॥

স্বপ্ন ও জাগরণ অবস্থায় যেমন, বিষয় ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তাহায় যে টুকু জ্ঞান, তাহার ভিন্নতা নাই, তাহা এক, তেমনি সুষুপ্তি অবস্থায় যে অজ্ঞানের উপলব্ধি হয়,—আমি প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিলাম, আমি বাহ্য বিষয় কিছুই জানি না এইরূপ যে 'কিছুই জানি না" বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহা এক, এই জ্ঞানের সহিত স্বপ্ন ও জাগরণ অবস্থার বৈষয়িক জ্ঞানের কোন পার্থক্য নাই। এবং "আমি কিছুই জানিনা" এই প্রকার

যখন স্মরণ হয়, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, সুষুপ্তি অবস্থায় কোন পদার্থের উপলাভ করিয়াছি, নতুবা স্মৃতি হওয়া অসম্ভব, কেননা বিষয়ের উপলব্ধি না করিলে তাহা কখনই স্মরণ করিতে পারি না। অতএব বুঝিতে হইবে সুষুপ্তি অবস্থায় যখন আর কোন ইন্দ্রিয়াদির প্রস্ফুরিতসত্তা থাকে না তখন কেবল মাত্র উহার মূল স্থান অজ্ঞানেরই উপলব্ধি করিয়াছি। তবেই বুঝিতে পারিলাম, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ে জ্ঞানের বিষয় ভিন্ন ভিন্ন হইলেও বিষয়ের যে জ্ঞান তাহা এক প্রকার, উহার কোনই পরিবর্ত্তন বা পরিণাম হয় না ॥৩॥

সবোধো বিষয়াদভেন্নো ন বোধাৎ স্বপ্নবোধবৎ।
এবং স্থানত্রয়ে হপ্যৈকা সপিণ্ডদ্দিনান্তরে ॥
মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা।
নোদেতি নাস্তমে ত্যেকা সম্বিদেষাস্বয়ং প্রভা ॥

তবেই বুঝিতে পারিলাম, সুষুপ্তিকালীন যে অজ্ঞানের উপলব্ধি করিয়াছি, উহা অজ্ঞান হইতে ভিন্ন। যেমন ঘটের জ্ঞান কালে ঘট ও তাহার জ্ঞান পৃথক্‌রূপে অনুভব করি, তেমন সুষুপ্তি সময়েও অজ্ঞান ও তাহার উপলব্ধি ঠিক ভিন্ন, কিন্তু যেমন স্বপ্নে ও জাগরণে জ্ঞানের ভিন্নতা নাই, তদ্রূপ সুষুপ্ত অবস্থায়ও জ্ঞানের কোনই পার্থক্য নাই।

এই প্রকার এক দিনে যেমন জাগ্রদাদি স্থানত্রয়ে জ্ঞানের একতা বুঝিতে পারিলাম, এইরূপ দিবসান্তরে, প্রত্যেক মাসে, প্রত্যেক বৎসরে সমস্ত যুগেও কল্পে, অধিক কি ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালেই বিষয় ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে, বিষয়গত জ্ঞান পদার্থটী একরূপ, এক আকার, উহার কোনই বৈষম্য নাই। এই যে জ্ঞানটীর কথা বলা হইল, ইহার আর একটী নাম "সম্বিৎ" ইহার হ্রাস বা বৃদ্ধি নাই, কখনও সম্বিৎ আছে, কখনও নাই এ প্রকার কদাচ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না, তবে যখন বিষয় থাকে, তখনই তাহার জ্ঞান বা সম্বিৎ হয়, বিষয় সন্নিহিত না থাকিলে বিষয়ের জ্ঞান টুকুও হয় না। বস্তুতঃ জ্ঞান পদার্থটী কখনই উৎপন্ন হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। সম্বিৎ প্রকাশ হইয়া আবার বিনষ্ট হয় ইহার কোনই কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং এ আপত্তিও

উপেক্ষণীয়। বিশেষতঃ যাহা উৎপত্তি প্রধ্বংসশালী, তাহার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, ইহার যখন কোন পরিবর্ত্তন বা পরিণাম পরিলক্ষিত হয় না, তখন উৎপত্তি বিনাশ স্বীকার করা অসঙ্গত। এই সম্বিৎস্বপ্রকাশ স্বরূপ, অন্য ঘটপটাদি যেরূপ জ্ঞানেতে প্রকাশ পায়, তেমনি ইহাও আপন জ্ঞানেই আপনি প্রকাশ পায়, তাই ইহাকে "স্বয়ম্প্রভা" বলে।

ইয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদং যতঃ।
মান ভুবং হিভূয়াসমিতি প্রেমাত্মনীক্ষতে॥

পূর্ব্বোক্ত যুক্তির দ্বারা জ্ঞানের স্বরূপ বুঝিতে পারিলাম, এবং এই জ্ঞান যে নিত্য, ইহার কখনই উৎপত্তি ও বিনাশ হয় না, তাহা ও জানিতে পারিলাম এবং এই জ্ঞান নিজেই, প্রকাশস্বরূপ তাহাও অবগত হইলাম। কারণ বিষয়ের জ্ঞান ও তাহার প্রকাশ একই কথা। বুদ্ধিতে বিষয়ের জ্ঞান হইল আর প্রকাশ হইল, ইহার কোনই পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারা যায় না, সুতরাং জ্ঞান স্বয়ংই প্রকাশ স্বরূপ বুঝিতে পারিলাম। পূর্ব্বে আমরা জ্ঞানের "সম্বিৎ" এই একটী নামের কথা বলিয়াছি, এখন দেখিব ইহার আর কোন সংজ্ঞা আছে কি না? আছে, ব্রহ্মবিদ্গণ এই জ্ঞানকেই আত্মা বা ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই জ্ঞানই প্রকৃত আত্মা, আত্মা বলিলে এই জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন বস্তুকে কুত্রাপি বুঝায় না এই জ্ঞানই আত্মস্বরূপ, ইহাকেই পরমাত্মা, ব্রহ্ম, চিৎ চৈতন্য ইত্যাদি নামে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই আত্মা পরমানন্দস্বরূপ, যেহেতু আত্মাতে অতিশয় প্রেমের অনুভব হয়। সর্ব্বদাই জীব নিজের সত্তা রক্ষা করিতে চেষ্টা করে এবং কখনই যেন আমার অভাব হয় না, এই প্রকার কামনা করিয়া থাকে। যদি আত্মাতে উৎকৃষ্ট আনন্দতার উপলব্ধি না হইত, তাহা হইলে, এতাদৃশ স্নেহের আবির্ভাব হইতে পারে না। আত্মোপলব্ধির মধুরতা বুঝিয়াই জীব তাহার অস্তিত্ব কামনা করিয়া থাকে এবং নানাবিধ উপায়ে তাহার পরিচেষ্টা করে।

তত্ প্রেমাত্মার্থ মন্যত্র নৈব মন্যার্থ মাত্মনি।
অতস্তত্ পরমস্তেন পরমানন্দতাত্মনঃ॥

আমরা পুত্রাদিতে যে প্রেমবান্ হই, উহা কেবলমাত্র আত্মার্থ, আত্মার

উপরে সাতিশয় প্রেম আছে, তাই আত্মার পরিতুষ্টির নিমিত্ত তাহার উপকরণ সংগ্রহ করি। পুত্রাদিতে স্নেহ আত্মপ্রেমমূলক। আত্মাকে যদি ভাল না বাসিতাম, তবে কখনই পুত্রাদির প্রতি এতাদৃশ মমতাকৃষ্ট চিত্ত হইত না। পুত্রের দ্বারা আত্মার সন্তুষ্টি সাধন করিতে পারিব, তাই পুত্রাদিকে ভাল বাসি। বস্তুতঃ একমাত্র আত্মাকেই ভালবাসি, এবং এই আত্মাকে যে ভালবাসি, ইহা আশ্চর্য্য নহে, আত্মাকে ভালবাসিয়া অন্যকে পরিতুষ্ট করা, ইহা উদ্দেশ্য নহে, ঐ ভালবাসা স্বাভাবিক। আত্মার নিকট যেন কি একটু সুধা পাই, কি যেন একটু মধুরতা পাই, তাই তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারি না। ইহার দ্বারাই আত্মার পরমানন্দতা অনুমান করিতে পারি। যেমন ব্যবহার জগতে যদ্দ্বারা যতটুকু আনন্দ পাই, তাহাকে ততটুকু ভালবাসি, তেমনি আত্মাতে যেন কি অপূর্ব্ব আনন্দ আছে, তাহার লোভে লুব্ধ হইয়াই আত্মাকে ভালবাসিয়া থাকি।

এই আনন্দ টুকু যে কি প্রকার বস্তু, তাহা বাহির হইতে বুঝান যায় না। লৌকিক আনন্দ আর এই আনন্দ অতি বিসদৃশ পদার্থ। নিখিল পদার্থ অন্তঃকরণে প্রকাশিত না হইলে, বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত অন্তঃকরণ বিলুপ্ত হইলে যাহা কিছু থাকে, ইহা সেই আনন্দ, ইহা আত্মস্বরূপ আনন্দ, ইহা লৌকিক আনন্দ নহে। কারণ লৌকিক আনন্দের সহিত দুঃখ থাকে, দুঃখের অনুভূতি না হইয়া আনন্দের উপলব্ধি হইতে পারে না।

পূর্ব্বে যে পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করা হইল, তাহার দ্বারাই সযৌক্তিকরূপে আত্মস্বরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে। এখন একটি সন্দেহ হইতে পারে যে, আত্মা যদি পরমানন্দ স্বরূপ হইলেন তবে তাঁহার পরমানন্দতাবস্থা আমরা সর্ব্বদা উপলব্ধি করিতে পারি না কেন? এ বিষয়ে শাস্ত্র বলিলেন, আত্মা পরমানন্দ স্বরূপ এবং তাঁহার আনন্দও সর্ব্বদা তাঁহাতে বিরাজিত আছে, কখনই তাহার অভাব বা হ্রাস, বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু উপলব্ধির প্রতিবন্ধক থাকায় আমরা সর্ব্বদা তাহা উপলব্ধি করিতে পারি না। যেমন শিক্ষার্থী অনেক বালকগণ একত্রিত

হইয়া সমস্বরে পাঠ করিলে আমার পুত্র ইহার মধ্যে কি পাঠ করিতেছে বা তাহার কোন স্বর, তাহা অনুভব করিতে পারি না, কিন্তু বস্তুতঃ তখনও আমার পুত্র, পূর্ব্ববৎই অধ্যয়ন করিতেছে, তাহার অধ্যয়নের কিছু এখন অভাব হয় নাই, তবে অনেক বালকের একত্রে পাঠ বশতঃ কাহারই শব্দ বিষস্পষ্ট অনুভূতি করা যাইতেছে না, তেমনি এখানেও কোন প্রতিবন্ধক বুঝিতে হইবে। আত্মানন্দের অনুপলব্ধির প্রতি অনাদি সহজা অবিদ্যাই প্রতিবন্ধ। এই অবিদ্যাদ্বারাই বিপরীতজ্ঞান, ভ্রান্তিজ্ঞান প্রভৃতি হইয়া থাকে। সর্ব্বদা যে আত্মার উপলব্ধি হয় না এবং দেহাদি আত্মপদার্থেতে যে আত্ম বুদ্ধি হয়, ইহার একমাত্র কারণ অবিদ্যা (১) অবিদ্যা বশতই এই প্রকার ভ্রান্তি জ্ঞান ও বিপরীত জ্ঞানাদি হইয়া থাকে। তাই বলিয়াছেন, "ইহানাদি রবিদ্যৈব ব্যামোহৈকনিবন্ধনং" আত্মানুভূতির এক মাত্র কারণ অবিদ্যা।

(১) আমরা এখানে যে অবিদ্যা শব্দের উল্লেখ করিলাম, এই অবিদ্যা শব্দে অবিবেক বুঝিতে হইবে। ইহাই সাংখ্য ও পাতঞ্জল শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে, "স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ। তস্য হেতুরবিদ্যা। তদ্যোযোগেপ্যবিবেকাৎ ন সমানত্বং ইত্যাদি শাস্ত্র দ্বারা অবিবেকই আত্মানুভূতির বা আত্মানন্দানুভূতির ব্যাঘাতক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু "ইহানাদিরবিদৈঃ ব্যামোহৈক নিবন্ধনং" ইত্যাদি শাস্ত্রে সত্ব, রজঃ তমোগুণের সাম্যাবস্থা অবিদ্যাকেই (প্রকৃতিকে) প্রতিবন্ধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, বস্তুতঃ তাহাতে শাস্ত্রদ্বয়ের পরস্পর কোন বিরোধ নাই, কারণ অবিদ্যাশব্দটা অবিবেক এবং প্রকৃতি এই উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াথাকে এবং অবিবেক ও অবিদ্যা বা প্রকৃতি সম্ভূত, অবিবেক অবিদ্যাকেই প্রতিবন্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, প্রতিবন্ধ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, অতএব পরস্পর কোন বিরোধ হইবে না।

একমাত্র কারণ অনাদি অবিদ্যা। এপর্য্যন্ত আমরা আত্মস্বরূপ

(১) অবিবেক কার্য্য, অবিদ্যা কারণ সুতরাং পরের কালে কার্য্য ও কারণের অভেদে —

ব্যাখ্যা করিলাম, এবং আত্মা প্রকাশস্বরূপ ও সর্ব্বদা উপলভ্যমান পদার্থ হইলেও প্রতিবন্ধ বশতঃ তাঁহার উপলব্ধি হয় না ইহাও ব্যাখ্যাত হইল। অতঃপর যে অবিদ্যা দ্বারা আত্মানুভূতি হয় না, তাহার স্বরূপ এবং সাধ্যক্রমে অন্যান্য বিষয় ব্যাখ্যা করা যাইবে। ইতি—

শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য।

বিবাহ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৫। রাজ যক্ষ্মা। যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত পিতা মাতার সন্তানাদি ন্যূনাধিক পরিমাণে ঐ রোগে আক্রান্ত হইতে সর্ব্বদাই দেখা যায়। যক্ষ্মা যে ভয়ানক ব্যাধি ইহার প্রকোপ হইতে বংশরক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অনেক বিজ্ঞ ২ চিকিৎসকগণ বলিয়া থাকেন যে যক্ষ্মাক্রান্ত স্ত্রীর সহিত পতি একত্র থাকিলে পতিরও যক্ষ্মা হওয়ার সম্ভব। টিউবারর্কিনোসিয়া অথবা স্ক্রকিউনোসিস্ (এই পীড়ায় দেহের এক প্রকার বিশেষ অসুস্থাবস্থা, ইহাতে দেহের সন্তাপ বৃদ্ধি হয় ও শরীর শীর্ণ হইতে থাকে। সচরাচর ফুসফুসে এই পদার্থ জন্মিয়া থাকে এবং তাহা হইলে এই ব্যাধিকে ক্ষয়কাশ অথবা থাইসিস্ কহে) ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের নির্ম্মাণের ও অবয়বের স্বাভাবিক অবস্থা হইতে কিছু বিশেষ আছে। তাহারা সচরাচর গৌরবর্ণ এবং দেখিতে সুশ্রী হয়, ত্বক কমনীয়, পাতলা এবং অতি সূক্ষ্ম নির্ম্মাণ। স্বাভাবিক অবস্থা হইতে কিছু বিশেষ আছে। এই পরিস্কৃত ত্বকের নিম্নে নীলবর্ণ শিরা সকল দেখা যায়। অক্ষি গোলক উজ্জ্বল ও বহির্নিঃসৃত, বৃহৎ এবং দেখিতে সুন্দর হয়। ডাক্তার রবার্টস সাহেব বলেন—"ইহার দীর্ঘাকার, কৃশাঙ্গ, সমুন্নত, কোমল, নির্ম্মাণ ও প্রায় মেদবিহিন এবং সচরাচর ইহাদের মুখমণ্ডল অণ্ডাকার, বর্ণ পরিস্কার, চক্ষু উজ্জ্বল ও কননিতা বৃহৎ, ত্বক সূক্ষ্ম কোমল ও সুকুমার ইহার মধ্য দিয়া নিলবর্ণ শিরা দেখা যায়। কেশ কোমল, অনেক স্থলে পাণ্ডুবর্ণ এবং চক্ষের পক্ষ্ম দীর্ঘ।

৬। মন্দাগ্নি। ইহাও পুরুষানুক্রমে হইতে দেখা যায়।

৭। শ্বিত্র অথবা বিবিধ কুষ্ঠরোগ। পিতা মাতার দোষে সন্তানের হইয়া থাকে। কখন কখন দুই তিন পুরুষ অতিক্রম করিয়া এই পীড়া প্রকাশ হইতে দেখা যায়। ডানিএনসেন্ এবং বেক ২১৩জন রোগীর মধ্যে ১৮৫ জনের কৌলিক দেহ স্বভাব বশতঃ এই পীড়া হইতে দেখিয়াছিলেন। কেবল মাত্র ২৮ জনের ঐ কারণ বশতঃ পীড়া হয় নাই। আইসলণ্ডে ১৮৩৭ সালে ১২৫ জন পীড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায় সকলেরই পিতা মাতার দোষে পীড়া হইতে দেখা গিয়াছে। অনেক স্থলেই এই পীড়া দ্বিতীয় বা চতুর্থ পুরুষে অত্যন্ত প্রবল হইয়া থাকে। লোকের পিতৃ দোষ অপেক্ষা মাতৃ দোষে অধিক পীড়া হয়।

৮। পিঙ্গলবর্ণ কেশ। ইহাও উপরিউক্ত ক্ষয়কাশের একটী লক্ষণ মাত্র। ইতি পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে ডাক্তার মরাটস্ যক্ষার কোন কোন অবস্থায় চুল পাণ্ডুবর্ণ বা রেশমের বর্ণ হয়। আমরা এতদ্দেশের ২টী যক্ষাক্রান্ত স্ত্রীলোকের চুল পিঙ্গলআভাযুক্ত দেখিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে বাহুল্যরূপে এখনও কোন তত্ত্ব জানা যায় নাই।

৯। পিঙ্গলবর্ণ নয়ন। যাহাদের পিঙ্গলবর্ণ নয়ন তাহাদের সন্তানাদির নয়নও পিঙ্গলবর্ণ হইবে। এ স্থলে পিঙ্গল বর্ণ নয়নের কারণ কি বলা হইতেছে।

আমাদের দেশ (ভারতবর্ষ) গ্রীষ্মপ্রধানদেশ, সূর্য্যের উত্তাপ প্রখর। আমাদের চক্ষু যে কালবর্ণ পদার্থে নির্ম্মিত তাহার কারণ এই যে, সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ আমাদের চক্ষুতে পড়িলে ঐ কালবর্ণ পদার্থ অতিরিক্ত উত্তাপ চোষণ করিয়া ফেলে, সুতরাং প্রখর উত্তাপে আমাদের চক্ষু হঠাৎ নষ্ট হইতে পারে না। (এ স্থলে বলা আবশ্যক যে সূর্য্যের উত্তাপ কালবর্ণ পদার্থে অধিক পরিমাণে চোষিত হয়) এ ভিন্ন শীতঃশীতাদি ঘটিয়া চক্ষের পর্দ্দা সচরাচর আরক্তিম হইয়া থাকে সুতরাং এ দেশের লোকদিগকে সূর্য্যের উত্তাপ হইতে চক্ষু রক্ষা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই জন্যই প্রকৃতি এতদ্দেশীয় লোকদিগের চক্ষের তারা কৃষ্ণবর্ণ পদার্থে নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

বেদব্যাস।

১২৯৮ সাল। ষষ্ঠ বর্ষ আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ।

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

লেখকগণ।

Printed by Udoya Churan Pal, At the New Balmick Press,
159, Manicktolla Street, Calcutta.

বিজ্ঞাপন।

ওয়েষ্ট এণ্ড ওয়াচ কোম্প্যানির চাবিশূন্য। লেভার ঘড়িই সর্ব্বদা ব্যবহারের পক্ষেই উৎকৃষ্ট।

যদি কারুগিরিতে অথবা উপাদানে কোনরূপ দোষ লক্ষিত হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া হয় অথবা বিনা ব্যয়ে মেরামত করিয়া দেওয়া হয়। তজ্জন্য সম্পূর্ণ রূপে গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়।

১। যে হেতু আমাদের নির্ম্মিত ঘড়ি প্রত্যেক বৎসর মেরামত করিবার আবশ্যক হয় না।

২। যদি প্রকৃত যত্নের সহিত ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে এই একটি ঘড়িতে জীবন কাটিয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত প্রকারে ঘড়ি সকল ভারতবর্ষের সকল ঘড়ি বিক্রেতার নিকট অথবা ওয়েষ্ট এণ্ডকোম্পানির এজেণ্ট গণের নিকট পাওয়া যায়।

ওয়েষ্ট এণ্ড কোম্পানির চাবিশূন্য ক্যাম্পেনের (অর্থাৎ মাঝারি সাইজ), সিভিল (অর্থাৎ ছোট সাইজ) ঘড়ি যাহার জন্য তিন বৎসরও গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়।

ওপেন কেস (অর্থাৎ আবরণ বিহীন) নিকল রৌপ্যকেশ ১৮॥০; খাঁটিরূপার-কেস ৩০॥; হাণ্টিং (আবরণ সহিত) ২০, ; বার্ণা" ৩১০॥, হাপহণ্টিং (অর্দ্ধ আবরণ সহিত)" ১২॥০ " ৩৫॥০

ওয়েষ্ট এণ্ড কোম্পানির গার্ড ঘড়ি বড় সাইজ, ষ্টাণ্ডার্ড কোয়ালিটী ছয় বৎসরের গ্যারাণ্টি। নিকল রৌপ্য-কেস্ ২৫ খাঁটি রৌপ্যকেস ৪০।

এক্সিপেসিয়াল কোয়ালিটি তিন বৎসরের গ্যারাণ্টি। নিকলরৌপ্য কেস ২০, ওয়েষ্ট এণ্ড ওয়াচ কোম্পানির কেলেণ্ডর ওয়াচ, অপরাপর সাধারণ ঘড়িরন্যায় সময় প্রদান ব্যতীত ইহাতে সাপ্তাহিক দিন এবং মাসের তারিখ দেওয়া আছে (বড় এবং মাঝারি সাইজ)। ওপেনফেস ২৫, হণ্টিং (আবরণ সহিত)

ওয়েষ্ট এণ্ড ওয়াচ কোম্পানির ক্যাম্পেন কুলপ্লেট ঘড়ি (মাঝারি সাইজ) পক্কাতি নির্ম্মিত হেয়ারস্প্রীং দ্বারা উপযুক্তরূপে প্রস্তুত বলিয়া বর্ষা কালে মরিচা ধরিবার অথবা ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভবনা নাই। ছয় বৎসরের গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়।

ওপেনফেস। অর্থাৎ আবরণ শূন্য খাঁটি রৌপ্য কেস ৪০,ও নিকল ২৫,।

"বার্ণা"—নিকলরূপার আশ্চর্য্য ধরণের চাবিশূন্য লেভার ঘড়ি যাহার মুল্য কেবলমাত্র ১২৸০ বার টাকা বার আনা মাত্র।

ভয়ানক অনুকরণ কাণ্ড হইতেছে সাবধান। আবেদনকারীকে বিশেষ বিবরণের সহিত সচিত্র মুল্য নিরূপন পত্র বিনামুল্যে দেওয়া যায়। ওয়েষ্ট এণ্ড ওয়াচ মেনুফেকচারিং কোম্পানির এজেণ্টগণ তাহাদের দায়িত্বে ভারতবর্ষ ও এপ্রদেশে সকল স্থানে ভেলুপেয়েবেল পার্শেলে পাঠাইয়া থাকেন।

১২ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ওয়েষ্ট এণ্ড ওয়াচ কোম্পানি ২৯ নং চার্চ গ্রেট ষ্ট্রীট বোম্বাই সহর।

ষষ্ঠ বর্ষ।

ষষ্ঠ ভাগ।	আশ্বিন সন ১২৯৮ সাল।	ষষ্ঠ খণ্ড।

দেবি! প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতের্নিত্যং যথাসুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানি সর্ব্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু, উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্।

বিবাহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১০। নিষ্ঠুরভাষিণী। নিষ্ঠুরভাষিণী স্ত্রীলোকদিগের সন্তান সন্ততিগণও নিষ্ঠুরভাষী হইবে। এ ভিন্ন নিষ্ঠুর ভাষিণী স্ত্রী গৃহীর পক্ষে নিতান্তই কষ্টদায়িকা।

১১। ছয়অঙ্গুলী প্রভৃতি বহুঅঙ্গুলী। এ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই বিখ্যাত ডাক্তার উইলিয়ম মহোদয়ের মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

১২। যে চিররোগিণী। চিররোগিণীর সন্তানগণও রোগা ও দুর্ব্বল হইবে, সন্দেহ নাই।

১৩। যাহার গাত্রে মাত্র লোম নাই। যে সকল যন্ত্র হইতে কেশ উৎপন্ন হয়, তাহাদের অসম্পূর্ণতা ইহার একমাত্র কারণ। যাহার শরীরে

একবারে লোম নাই, তাহার শরীরাভ্যন্তরে কোন না কোন বিশেষ পীড়া আছে, ইহা অনুমান করা উচিত।

কেশ পতন বা এলোপেসীয়া। কখন কখন উপদংশের প্রথম অবস্থায় গাত্রে কণ্ডু হইবার পূর্ব্বে মস্তক, নেত্র, চিবুক প্রভৃতি স্থানের কেশ পতিত হইয়া থাকে। কোন কোন চর্ম্ম রোগের ক্ষত স্থান হইতে কেশ পতিত হইলে আর বহির্গত হয় না। কখন কখন মস্তকের কোন স্থানের কেশ উঠিয়া গিয়া ঐ স্থান উজ্জ্বল বোধ হয়।

ভগবান্ মনু কিরূপ কন্যাকে বিবাহ করা কর্ত্তব্য, তাহাও সংক্ষেপে লিখিয়া গিয়াছেন,—

অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনাম্নীং হংসবারণগামিনীং।
তনুলোমকেশদশনাং মৃদ্বঙ্গীমুদ্বহেৎস্ত্রিয়ং॥

ঐ॥ ১০॥

কিন্তু যে স্ত্রী অঙ্গহীন নয়, যাহার নাম অতি সুখে উচ্চারণ করা যায়, হংসমাতঙ্গের ন্যায় যাহার মনোহর গমন, যাহার লোম ও কেশ মৃদুল এবং দন্ত ক্ষুদ্র এমন কোমলা স্ত্রীকে বিবাহ করিবে।

১। অঙ্গহীন স্ত্রী বিবাহ করিলে সন্তানাদি পুরুষানুক্রমে অঙ্গহীন হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা।

২। হংস মাতঙ্গের ন্যায় যাঁহার মনোহর গমন।

এই সম্বন্ধেও বিশেষরূপ জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। স্ত্রী এবং পুরুষের নির্ম্মাণের পার্থক্যে বস্তিদেশের গঠনের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এস্থলে সংক্ষেপে এই পর্য্যন্ত বলা আবশ্যক যে, স্ত্রীদের বস্তিদেশের অস্থি সকল ভারি নহে, তাহাতে পেশী সংলগ্ন স্থান সকল অস্পষ্ট লক্ষিত হয়। ইলিয়াক নামক উভয় পার্শ্বের অস্থিদ্বয় বিস্তৃত হওয়ায় স্ত্রীলোকদিগের নিতম্ব প্রস্থে বড়, সুতরাং দেখিতে অতি সুশ্রী হয় ও চলিবার সময় নিতম্ব ছলিতে থাকে। স্ত্রীলোকের বস্তিগহ্বর, উরুদ্বয় ও পদ বিস্তৃত থাকিলে মনোহর গমন অসম্ভব। বস্তিগহ্বর অস্বাভাবিক থাকিলে প্রসব কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয় না। কোন কোন বস্তিগহ্বরের বিকৃতিতে গুরুতর অস্ত্র কার্য্যদ্বারাও প্রসব করান যায় না।

এ স্থলে কোমরের বিকৃতির কারণ ও অনিষ্টের বিষয়ও সবিস্তার উল্লেখ আবশ্যক। এই বিকৃতি এ দেশে পূর্ব্বে ছিল না, এখন অন্যান্য সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে এ সভ্যতাও পাশ্চাত্য সভ্য দেশ হইতে আমদানী হইতেছে। সচরাচর কটি বন্ধনদ্বারাই কোমরের এই বিকৃতি হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের বিখ্যাত ডাক্তারগণ যে সকল তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন, আমরা তাহা সংক্ষেপে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

পরিচ্ছদ পরিধানের দোষে, অর্থাৎ শক্ত বন্ধনীদ্বারা কোমর দৃঢ়তর বন্ধন করায় প্রতি বৎসর ন্যূনাধিক পোনির হাজার স্ত্রীলোক মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়। ইহার কারণ তাঁহারা নির্ণয় করিয়াছেন যে, উদরের মধ্যে যে সকল যন্ত্র আছে, তাহাতে অত্যন্ত চাপ পড়ায় উক্ত যন্ত্রগুলির ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হয়, সুতরাং ঐ যন্ত্রগুলি গুরুতররূপে বিকৃত ও ক্রিয়াহীন হইয়া পড়ে। এইরূপে উক্ত যন্ত্রগুলি বিকৃত, স্থানভ্রষ্ট হওয়ায় নানা পীড়ায় মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়। এই বিষয়ে সামুয়েল হেয়ার নামক বিলাতের একজন বড় ডাক্তার যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। যথা,—

"কোমরে দৃঢ় বন্ধনী ব্যবহার করিলে উদর ও বক্ষের উপরে চাপ পড়ে এবং এই কারণে ক্রমে ক্রমে স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়। স্বাস্থ্য নষ্ট হইলে অস্থি সকল কোমল হয় ও শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে, হৃৎপিণ্ড ও উদরস্থ যন্ত্র সমূহের ক্রিয়া ব্যতিক্রম হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে অকাল মৃত্যু সংঘটন হয়।"

অনেক বিজ্ঞ ডাক্তারগণ নিম্নলিখিত ব্যাধি কোমর, বুক, পিট শক্ত করিয়া বাঁধার জন্য উৎপত্তি হয়, উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—যক্ষ্মা কাশ রোগ, অজীর্ণ, বহু মূত্র পীড়া, ঘেঁচুনী, ঋতু সম্বন্ধীয় নানাপীড়া।

বালিকারা এই প্রকার বাঁধন অভ্যাস করিলে ক্ষুধা মান্দ্য হয়। রাত্রিতে কোমর ও বুকের বাঁধন ছাড়িয়া দিলে মস্তিষ্ক হইতে রক্ত অত্যন্ত বেগে ঐ সকল স্থানে আইসে। এই রক্ত বেগে প্রবাহিত হওয়ায় সময় মূর্চ্ছা ও অবসাদ হইয়া থাকে। ডাক্তার প্লেফেয়ার সাহেব তাঁহার ধাত্রী বিদ্যা নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন,—

বস্তি গহ্বর গঠন বিকৃতি যত প্রকার দেখা যায়, তন্মধ্যে সম্মুখ ও পশ্চাৎভাগের সংকীর্ণতা সচরাচর দেখা যায়। এই সংকীর্ণতা কোন প্রবেশ দ্বারে লক্ষিত হয়। অস্থি সকলের অস্থি সঞ্চার হইবার পূর্ব্বে দেহের উপর কোন প্রকার ভর পড়িলে, অর্থাৎ বালিকা কালে ভার বহন করিলে সেক্রাম নামক * অস্থি অযথা নামিয়া পড়ে ও সম্মুখদিকে ঠেলিয়া থাকে, সুতরাং বস্তি কোটরের মাপ সংকীর্ণ হয়।

কোমর হইতে যে সকল অনিষ্ট হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। বস্তি কোটর বিকৃত থাকিলে প্রসব কার্য্যের নানা বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে, তাহাও উল্লেখ হইয়াছে। বস্তিদেশ বিস্তৃত হইলে উরুর অস্থিও বিকৃত হইয়া যায়। এ ভিন্ন কোন কোন পীড়ায় বস্তি কোটর উরু ও পদের অস্থিসমূহ কোমল ও বিকৃত হইয়া যাইতে পারে। মাতার কোন পীড়া বশতঃ এই সমস্ত স্থান বিকৃত থাকিলে সন্তানের হওয়ার সম্ভব, এই সকল গুরুতর নানা কারণেই ভগবান্ মনু বলিয়াছেন যে, যাহার মনোহর গমন, তাহাকে বিবাহ করিবে।

৪। দন্ত শুভ্র। কোন ব্যক্তির দন্ত পরীক্ষাদ্বারা অনেক সময় তাহার সাধারণ স্বাস্থ্যের বিষয় অবগত হওয়া যায়। দন্তের কোন প্রকার পীড়া ও অস্বাভাবিক অবস্থা না থাকিলে স্বাস্থ্য সাধারণতঃ উত্তম হয়, ইহা মনে করা উচিত।

শৈশব অবস্থায় দন্তোদগমকালে নানা প্রকার পীড়া জন্মে। অজীর্ণ, অধিক অম্ল ভক্ষণ, অতিরিক্ত মদিরাপান ও পারদ ব্যবহারে দন্তে ক্ষত হইতে পারে। গুরুতর জ্বরের বিকার অবস্থায় দন্ত কৃষ্ণবর্ণ ও লেপ যুক্ত হয়। কোন বিশেষ কারণ ব্যতীত দন্ত পতন হইতে আরম্ভ হইলে শরীর নিস্তেজ হইয়াছে বিবেচনা করিতে হইবে। উপদংশ ব্যাধিতে দন্তের অবস্থা নানারূপ রূপান্তর হয়।

৬। কোমলাঙ্গী। স্ত্রীজাতির স্বভাবতঃ কোমলাঙ্গ থাকা উচিত। পুরুষের ন্যায় পরিশ্রম, অথবা অন্য কোন কারণে স্ত্রীলোকের গঠন কঠিন

* বস্তি কোটরের পশ্চাৎ, অথবা মেরুদণ্ডের নিম্ন অস্থি খানাকে সেক্রাম কহে।

হইয়া যায়। গঠন দৃঢ় হইলেও বস্তিগহ্বর প্রভৃতি স্থান অত্যন্ত দৃঢ় হইলে সন্তান প্রসব ও কোন কোন স্থলে গর্ভ হইতে পারে না। অনেক বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের গঠন তত কোমল থাকে না। ফলতঃ রমণী জাতিকে ভগবান্ যেমন কোমল ভাবে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাদের সেই কোমলাঙ্গ কোন কারণেই বিকৃত করা উচিত নহে।

আজ কাল বিলাতী প্রথার অনুকরণে অনেকে ছেলের মতামতে কন্যার সহিত, অথবা কন্যার মতামতে ছেলের সহিত বিবাহ দিতেছেন। আমরা অভিভাবকদ্বারা পাত্রী মনোনীত প্রথাকে অতিশয় আবশ্যকীয় মনে করি, তবে সুবিধা ও উপরি উক্ত কোন কারণ বর্ত্তমান না থাকিলে মতামত নেওয়া যাইতে পারে। অভিভাবকগণ কন্যার শুভাশুভ লক্ষণ, জন্মলগ্ন, কুল ইত্যাদি দেখিয়া পুত্রের ও কন্যার স্বাস্থ্য ও সুসন্তান উৎপাদন প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখেন। কিন্তু বর অথবা কন্যা তৎকালে যৌবন ভারে প্রমত্ত থাকায় কেবল রূপ মাধুরীকেই অমূল্যনিধি বলিয়া মনে করেন, তখন পরস্পরের স্বভাব, চরিত্র, বংশ, উৎপাদিকাশক্তি ও উপরি উক্ত ব্যাধি ও অঙ্গ বৈকল্য ইত্যাদি সম্বন্ধে ভাবিবার তাহাদের অবকাশ অথবা আবশ্যক হয় না। পিতা, মাতা, ভগিনী প্রভৃতি পরিবারস্থ ব্যক্তির সহিত সুমিষ্টালাপ ও সদ্ব্যবহার করিবে কিনা, সন্তানউৎপাদন ও নিজের স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হইবে কিনা ইত্যাদি বিষয় ভাবিবার শক্তি ও সুযোগ থাকে না। আমরা এই জন্যই প্রাচীন প্রথাকে শুভকর মনে করি। আর্য্য ঋষিগণ এই সকল এবং ইহা অপেক্ষা আরও শত সহস্র সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কারণে বিবাহ বিষয়ে আমাদিগকে বিশেষ সতর্ক হওয়ার জন্য নানারূপ উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের সেই অমূল্য উপদেশগুলি পদে পদে অবজ্ঞা করিয়া দিন দিন নানা প্রকার পীড়ায় আক্রান্ত হইতেছি এবং ভবিষ্য বংশধরগণের জন্যও সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া যাইতেছি।

উপরি উক্ত বিষয়গুলি চিন্তা করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, পরস্পরের ইচ্ছাপূর্ব্বক বিবাহ প্রণালী সমাজে বিধিবদ্ধ হইতে পারে না। কেবল দুই জনের বিবাহের ফল তাহাদের পরবর্ত্তি শত শত বংশধরগণ

ক্রমান্বয়ে প্রাপ্ত হইবে, সে স্থলে একমাত্র স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিবাহ প্রণালী সর্ব্ব সাধারণের জন্য কিরূপে বিধিবদ্ধ হইতে পারে? যখন দেখা যায় নানা প্রকার গুরুতর ব্যাধি বিকৃতাঙ্গ, বিকৃত স্বভাব ইত্যাদি সমস্তই পরবর্ত্তি বংশধরগণ ক্রমান্বয়ে প্রাপ্ত হইতেছে, সেস্থলে কোন প্রকারেই পরস্পরের স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিবাহ প্রথা সমাজে প্রচলিত হইতে পারে না।

এ স্থলে অনেকে বলিতে পারেন যে, ঐ সকল পীড়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদিগের তবে কি বিবাহ হওয়া উচিত নয়? আমাদের মতে বিবাহ না হওয়াই নিতান্ত কর্ত্তব্য। এক কিম্বা দুই জনের সুখের জন্য শত সহস্র ব্যক্তি নানাপ্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিবে, ইহা অত্যন্ত অসহ্য। মনে করুন এক ব্যক্তি একটি কুষ্ঠগ্রস্তা রমণীকে বিবাহ করিলেন, সৌভাগ্য ক্রমে পতি সেই ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত নাও হইতে পারেন, কিন্তু তাহার সন্তান সন্ততিগণ অবশ্যই সেই পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। ধরুন, তাহাদের পাঁচটী সন্তান হইল সেই ৫ টীর সন্তানের ২৫ টী সন্তান হইল, সেই ২৫ টির ১২৫ টি সন্তান হইল। আবার ১২৫ টির ৬২৫ টি সন্তান হইল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কুষ্ঠব্যাধি দ্বিতীয় কি চতুর্থ পুরুষের অধিক প্রবল হয়। এখন দেখুন, দুই ব্যক্তির সুখের জন্য এক সময়ে ন্যূনাধিক ৬২৫টি সন্তান অতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করিবে। এই রূপ বন্ধ্যা সম্বন্ধে ও বলা যায়। বন্ধ্যার আক্রান্ত রমণীদের দেহের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে ইতি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এবং সেই সেই স্থলে প্রতারিত হওয়ারও বিশেষ সম্ভব রহিয়াছে, এরূপ স্থলে বিবাহ করিলে তাহাদের ভাবি বংশধর নিশ্চয়ই ঐ গুরুতর ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হইবে। এই সকল গুরুতর নানা কারণেই আর্য্য ঋষিগণ বিশেষ বিশেষ নিয়ম ব্যবস্থা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। আজ কাল যেমন ব্যক্তি বিশেষের সুখের জন্য মানুষ যত চিন্তা করে, ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহা এক বারও চিন্তা করে না। প্রাচীন আর্য্যেরা তাহা করেন নাই, তাঁহারা এক কিম্বা দুই জনের সুখের জন্য কোন ব্যবস্থাই প্রদান করিতেন না। যাহাতে সমাজের অধিকাংশ লোকের মঙ্গল হয়, যাহাতে ভাবি বংশধরগণ সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট, নিরোগী ও নিজ নিজ বংশের অনুরূপ হয়, প্রাচীন আর্য্য-

দিগের ইহাই অভিপ্রায় ছিল এবং সেই উদ্দেশেই এত নিয়ম, এত ব্যবস্থা, এত শাস্ত্র ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

উপরি উক্ত ব্যাধির দ্বারা পীড়িত ব্যক্তিদের বিবাহ না হইলে সমাজের আর একটি মঙ্গল জনক উদ্দেশ্যও সাধিত হয়। একজন ব্যক্তির যে কারণে উপদংশ পীড়া হয়, সেই কারণকে যদি সে ঘৃণা করে, অথবা উপদংশ পীড়া হইলে তাহার বিবাহ হইবে না, কি পুত্র কন্যার বিবাহ হইবে না, এই ভয় যদি সর্ব্বদাই মনে থাকে, তবেই দেখুন সমাজের কত শত সহস্র ব্যক্তি কুসংসর্গ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয় ও সমাজেরও কত মঙ্গল হয়। সকল সমাজেই কর্ত্তব্য জ্ঞানহীন লোকের সংখ্যা অধিক, তাহাদের জন্য কতকগুলি কঠোর নিয়ম (অথচ মঙ্গলদায়ক) বিধিবদ্ধ থাকা আবশ্যক। আমাদের প্রাচীন সমাজে এইরূপ নানাপ্রকার সুব্যবস্থা ছিল, বলা বাহুল্য সে সময়কার সমাজের অবস্থাও উন্নত ছিল। আমাদের সমাজে যতদিন না সেই সকল প্রথা পুনরায় বিধিবদ্ধ করিতে পারা যাইবে, ততদিন আমাদের মঙ্গল নাই।

মনুসংহিতায় বিবাহ ৮ প্রকার বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্ণামপি বর্ণানাং প্রেত্য চেহ হিতাহিতান্।
অষ্টাবিমান্ সমাসেন স্ত্রীবিবাহান্নিবোধত॥

৩য় অধ্যায় ॥ ২০॥

ইহলোক ও পরলোকে চতুর্ব্বর্ণের হিত ও অহিত জনক ভার্য্যা প্রাপ্তির কারণ আট প্রকার বিবাহ বলিতেছি, সাবধানে শ্রবণ কর॥

যে বর্ণের যে বিবাহ ধর্ম্ম ও যে বিবাহে দোষগুণ সমুদিত না হয় এবং যে বিবাহোৎপন্ন সন্তানে যে যে গুণাগুণ জন্মে, সেই সকল আমি তোমাদিগকে উত্তমরূপে বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ২২ ॥ *

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট পৈশাচ এই ৮ প্রকার বিবাহ হয়॥ ঐ ॥ ২১ ॥

* পাঠক মহোদয়গণ এই শ্লোক পাঠ করিয়া দেখিবেন যে, ভগবান্ মনু যাহা ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাই ধর্ম্ম সঙ্গত বটে। তিনি বিবাহের দোষগুণ বলিতেছেন।

এই সকল বিবাহের মধ্যে মনু যে বিবাহের যে দোষ ও যে বিবাহের যে গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন, হে মহর্ষিগণ! আমি সেই সকল সম্যক্‌রূপে বলিতেছি, শ্রবণ কর॥ (মহর্ষি ভৃগু বলিতেছেন) ঐ॥৩৬॥

দশ পূর্ব্বান্ পরান্ বংশ্যান্নাত্মানঞ্চৈকবিংশকং।
ব্রাহ্মীপুত্রঃ সুকৃতকৃন্মোচয়ত্যেনসঃ পিতৄন্॥

ঐ॥৩৭॥

ব্রাহ্ম বিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান যদি সুকৃতিশালী হয়েন, তাহা হইলে ঐ পুত্র পিত্রাদি দশ পূর্ব্ব পুরুষ ও পুত্রাদি দশ পুরুষ এবং আপনি এই এক বিংশতি পুরুষকে পাপ হইতে মুক্ত করেন।

দৈবোঢ়াজঃ সুতশ্চৈব সপ্ত সপ্ত পরাবরান্।
আর্ষোঢ়াজঃ সুতস্ত্রীংস্ত্রীন্ ষট্ ষট্ কায়োঢ়জঃ সুতঃ॥ ঐ॥ ৩৮॥

দৈব বিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত সদনুষ্ঠানশীল সন্তান পিত্রাদি সপ্ত পূর্ব্ব পুরুষ ও পুত্রাদি সপ্ত অপর পুরুষ এবং আপনি এই পঞ্চদশ পুরুষকে পাপ হইতে মুক্ত করেন। আর্ষ বিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভ-জাত সাধু সন্তান, পূর্ব্ব তিন পুরুষ ও পর তিন পুরুষ এবং আপনি এই সাত পুরুষকে পাপ হইতে মুক্ত করেন। প্রাজাপত্য বিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত সৎ কর্ম্মশালী সন্তান ষট্ পিত্রাদি পূর্ব্ব পুরুষ ও পুত্রাদি ষট্ পর পুরুষ এবং আপনি এই ত্রয়োদশ পুরুষকে পাপ হইতে মুক্ত করেন। ঐ॥ ৩৮॥

ব্রাহ্ম্যাদিষু বিবাহেষু চতুর্ষেবানুপূর্ব্বশঃ।
ব্রহ্মবর্চ্চস্বিনঃ পুত্রা জায়ন্তে শিষ্টসম্মতাঃ॥ ঐ॥ ৩৯॥

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য এই আনুপূর্ব্বিক ঐ ৪ প্রকার বিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীতে বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন ও সাধুলোকের মাননীয় সন্তান উৎপন্ন হয়॥ ৩৯॥

তাহারা সুরূপ ও দয়াদি গুণযুক্ত, প্রচুর ধনশালী, যশস্বী ইচ্ছামত বসন ভূষণাদি ভোগ সম্পন্ন ও ধর্ম্মশীল হয়েন ও শত বৎসর জীবিত থাকেন॥ ঐ॥ ৪০॥

ইতরেষু তু শিষ্টেষু নৃশংসানৃতবাদিনঃ।
জায়ন্তে দুর্ব্বিবাহেষু ব্রাহ্মধর্ম্মদ্বিষঃ সুতাঃ ॥ ঐ ॥ ৪১ ॥

তদতিরিক্ত আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই চারি নিকৃষ্ট বিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীতে ক্রূরকর্ম্মা মিথ্যাবাদী, বেদ ও যাগাদিদ্বেষী পুত্র জন্ম গ্রহণ করে ॥ ৪১ ॥

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সমাজে যে সমস্ত বিবাহ হইতেছে, সে গুলি আমাদের বিবেচনায় আসুর বিবাহ। কেননা, প্রায়স উহাতে কন্যা বিক্রয় না হইয়া বর বিক্রয় হইয়া থাকে। এই সকল বিবাহ হিন্দু শাস্ত্রানুসারে নিতান্ত নিন্দনীয়। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুর গৃহে যে সমস্ত বংশধর জন্ম গ্রহণ করিতেছেন, তাহা কি এই আসুর বিবাহের ফল ?

এস্থলে উপরি উক্ত ৮ প্রকার বিবাহ সম্বন্ধে বিশেষ রূপে বর্ণিত হইল। যথা,—

১। সবিশেষ বস্ত্রালঙ্কারাদিদ্বারা কন্যা বরের আচ্ছাদন ও পুজন পুরঃসর বিদ্যা সদাচার সম্পন্ন অপ্রার্থক বরকে যে কন্যাদান, তাহার নাম ব্রাহ্ম বিবাহ বলা যায় ॥ ঐ ॥ ২৭ ॥

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু সমাজের এ প্রকার বিবাহ বাহুল্যরূপে প্রচলন হওয়া উচিত।

২। অতি বিস্তৃত জ্যোতিঃষ্টোমাদি যজ্ঞারম্ভ কালে, সেই যজ্ঞে কর্ম্ম কর্ত্তা পুরোহিতকে সালঙ্কৃত কন্যার যে দান, তাহাকে দৈব বিবাহ বলা যায়।

বর্ত্তমান সময়ে ইহার প্রচলন নাই ও এই প্রকার বিবাহের বিশেষ আবশ্যকও দেখা যায় না।

৩। একং গোমিথুনং দ্বে বা বরাদাদায় ধর্ম্মতঃ।
কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্ম্মঃ স উচ্যতে ॥ ঐ ॥ ২৯ ॥

এক গাভী ও এক বৃষ ইহাকে গো মিথুন বলা যায়। ধর্ম্মার্থে (অর্থাৎ যাগাদি সিদ্ধির জন্য, কন্যা বিক্রয়ের মূল্যরূপে নহে) এইরূপ এক বা দুই গো মিথুন বর পক্ষ হইতে লইয়া ঐ বরকে যে কন্যা দান, তাহাকে আর্ষ বিবাহ বলা যায় ॥

আজকাল ধর্ম্মার্থের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নাই। বিষয় ভোগার্থে অনেক হতভাগ্য হিন্দু সন্তান কন্যা রীতিমত বিক্রয় করিতেছেন। এ সম্বন্ধে ভগবান্ মনু যাহা ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত হইল। কন্যা বিক্রয় প্রথমে অত্যন্ত ঘৃণিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দুসমাজ হইতে এই কুপ্রথা যত শীঘ্র উঠিয়া যায়, ততই মঙ্গল। আমরা হিন্দু সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই ঘৃণিত ও শাস্ত্র বিরুদ্ধকর প্রথা উঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিতেছি। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,—

আর্ষে গো মিথুনং শুল্কং কেচিদাহুর্ম্মৃষৈব তৎ।
অল্পোঽপ্যেবং মহান্ বাপি বিক্রয়স্তাবদেবসঃ॥

ঐ॥ ৫৩॥

কোন কোন পণ্ডিতেরা আর্ষ বিবাহের দত্ত গোযুগলকে শুল্ক এই কথা বলেন, মনুর মতে উহা শুল্ক নহে। শুল্ক অল্পই হউক বা অধিকই হউক, তাহা গ্রহণ করিলেই বিক্রয় সিদ্ধ হয়। কিন্তু আর্ষ বিবাহে গো মিথুন দান গ্রহণ, কন্যা বিক্রয় বুদ্ধিতে নহে, উহা ধর্ম্মার্থের জন্য।

ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্যান্ গৃহ্লীয়াচ্ছুল্কমণ্বপি।
গৃহ্নন্ শুল্কং হি লোভেন স্যান্নরোঽপত্যবিক্রয়ী।

ঐ॥ ৫১॥

শুল্করূপ ধন গ্রহণের দোষজ্ঞ কন্যার পিতা অল্প মাত্রায়ও শুল্ক গ্রহণ করিবে না, যেহেতু লোভ বশতঃ মূল্য গ্রহণ করিলে, তিনি বিক্রয় জন্য অতিশয় পাপী হন।

শূদ্রজাতিও কন্যার শুল্ক গ্রহণ করিবে না, শাস্ত্রবেত্তা ব্রাহ্মণাদি কোন মতেই লইবে না, যদি গ্রহণ করে, তবে কন্যা দাতাকে দুহিতৃ বিক্রয়ী বলা যায় ও সে কন্যা বিক্রয়ের জন্য পাপী হয়॥

৯ অধ্যায়॥ ৯৮।

পূর্ব্ব কল্পেতে শুল্ক নাম করিয়া গোপন ভাবে কন্যা বিক্রয় ব্যবহার শ্রুত হই নাই॥ ঐ ১০০॥

কন্যার পিতাদিকে এবং কন্যাকে শক্ত্যনুসারে অন্ন কিম্বা বস্ত্র

স্বেচ্ছানুসারে যে কন্যা গ্রহণ,তাদৃশ কন্যা গ্রহণে সম্পাদ্য বিবাহকে আসুর বিবাহ বলা যায় ॥ ৩য় অধ্যায় ॥ ৩১ ॥

এই বিবাহের দোষ সম্বন্ধে ইতি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

৫। তোমরা উভয়ে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের আচরণ কর, বর ও কন্যাকে এই কথা বলিয়া অর্চ্চনাপূর্ব্বক ঐ বরকে যে কন্যাদান এই দান সম্পাদ্য বিবাহকে প্রাজাপত্য বিবাহ বলা যায় ॥ ঐ ॥ ৩০ ॥

এই প্রকার বিবাহ সমাজে প্রচলিত থাকা উচিত।

৬। কন্যা এবং বর উভয়ের পরস্পর অনুরাগ সহকারে যে বিবাহ হয়, তাহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলা যায়। এই বিবাহ কাম বশতঃ মৈথুনেচ্ছায় ঘটিয়া থাকে ॥ ঐ ॥ ৩১ ॥

এই প্রকার বিবাহের কি দোষ, তাহা ইতি পূর্ব্বে সবিস্তার বলা হইয়াছে।

৭। বলাৎকারে কন্যাহরণ করিয়া বিবাহ করার নাম রাক্ষস বিবাহ।

৮। নিদ্রায় অভিভূত বা মদ্যপান বিহ্বল, অথচ অনবধানযুক্তা স্ত্রীকে নির্জন প্রদেশে গমন করার নাম পৈশাচ বিবাহ, ইহা অতি অধম জানিবে। ঐ ॥ ৩৪ ॥

উপরি উক্ত রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহ যে অতি নিকৃষ্ট, তাহা তাহাদের নামেই প্রকাশ পাইতেছে। পূর্ব্বকালে ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে রাক্ষস বিবাহ দেখা যাইত।

৩। বিবাহের বয়স।

এই সম্বন্ধে ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,—

ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাম্বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ ॥

৯ অধ্যায় ॥৯৪॥

ত্রিশ বৎসর বয়স্ক পুরুষ দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে, চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ বয়স্ক পুরুষ অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে। তিন গুণের পুরুষ একগুণ কন্যাকে বিবাহ করিবে, ইহার ন্যূনাধিক বিবাহ করিলে ধর্ম্ম নষ্ট হয় ॥

খৃষ্টান ও মুসলমানদিগের মধ্যে পুরুষ ইচ্ছামত বয়ঃকনিষ্ঠা বা বয়ো-ধিকা কন্যাকে বিবাহ করিতে পারেন, কিন্তু হিন্দুদিগের বয়ঃকনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করাই শাস্ত্র সম্মত। এই হিন্দু প্রথার নিম্ন লিখিত কএকটী কারণ দেখা যায়।

১। ইউরোপীয় কোন কোন গ্রন্থকারের গণনামতে গড়ে ১০৩টি সন্তানের মধ্যে ৫০টি কন্যা ও ৬৩টি পুত্র জন্মনের বিষয় অবধারিত হই-য়াছে। উত্তমাশা অন্তরীপে স্বাধীন লোকদিগের মধ্যে তদ্ বিপরীত। আমাদের কৃষক ও শ্রমোপজীবী লোকদিগের মধ্যে বালিকার সংখ্যা অল্প। ফলতঃ স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে যে বলিষ্ঠ, তজ্জাতীয় সন্তানই অধিক হইতে দেখা যায়। স্ত্রী পুরুষের বয়স সমান হইলে কন্যাই অধিক জন্মে এবং স্ত্রী হইতে পুরুষ যত বড় ও বলিষ্ঠ হয়, ততই পুত্র হওয়ার অধিক সম্ভব।

বিখ্যাত ডাক্তার সেডলার ও হেপ্‌কার মহোদয়গণ ১০০ একশত কন্যার মধ্যে পিতা মাতার বয়ঃক্রমের তারতম্য অনুসারে যতপুত্র সন্তান হয়, তাহার এক তালিকা দিয়াছেন। যথা,—

মিঃ হেপ্‌কার মহোদয়ের তালিকা।

		পুত্র—
পিতা মাতা অপেক্ষা যদি বয়সে ছোট হয়	...	৯০০৬
পিতা এবং মাতার বয়স যদি সমান হয়	...	৯০০০
পিতা মাতা অপেক্ষা ১ হইতে ৬ বৎসরের বড় হয়	...	১০৩০৪
পিতা মাতা অপেক্ষা ৬ হইতে ৯ বৎসরের বড় হয়	...	১২৪০৭
পিতা মাতা অপেক্ষা ৯ হইতে ১৮ বৎসরের বড় হয়	...	১৪৩০৭
পিতা যদি ১৮ বৎসরের বড় হয়	...	২০০০০

M. Häfacker

(Anuaasd' Hygiene)

oct 1829

মিঃ সেডলার সাহেব বলেন,—

পিতা যদি মাতা অপেক্ষা ছোট হয়	...	৮৬০৫

পিতা এবং মাতার বয়স যদি সমান হয়	...	৯৪০৪
পিতা মাতা অপেক্ষা ১ হইতে ৬ বৎসরের বড় হয়	...	১০৩০৭
পিতা মাতা অপেক্ষা ৬ হইতে ১১ বৎসরের বড় হয়	...	১২৬০৭
পিতা মাতা অপেক্ষা ১১ হইতে ১৬ বৎসরের বড় হয়	...	১২৭০৭
পিতা মাতা অপেক্ষা ১৬ বৎসরের অধিক হইলে	..	১৬৩০২

Mr Sadler (London) Law of population Vol II P. 343

উপরি উক্ত তালিকায় স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মাতা অপেক্ষা পিতার বয়স যতই অধিক হইবে, ততই পুত্রের সংখ্যা অধিক হইয়া থাকে। এ স্থলে অনেকে বলিতে পারেন যে, কন্যা অপেক্ষা পুত্র সন্তান অধিক পরিমাণে জন্মগ্রহণ করার উদ্দেশ্য কি?

পাশ্চত্য বিজ্ঞান শাস্ত্রে বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিলে দেখাযায় যে, নানা কারণে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের মৃত্যু সংখ্যা অধিক। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত স্ত্রী পুরুষের মৃত্যুর তালিকা দেখিলেই, ইহা সহজে বুঝা যাইবে। ডাক্তার হাজবেণ্ড লিখিয়াছেন "অতি শৈশব কালে বালিকা অপেক্ষা বালকের মৃত্যু সংখ্যা অধিক।*

ডাক্তার রবার্ট্‌স লিখিয়াছেন,—

"স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের মৃত্যু সংখ্যা অধিক" † ফলতঃ স্ত্রীজাতির সন্তান উৎপাদন প্রভৃতি কারণে জীবনে নানারূপ গুরুতর বিপদ্ থাকা সত্বেও স্ত্রীগণ পুরুষ অপেক্ষা দীর্ঘজীবী।

পুং সন্তানের মৃত্যু সম্বন্ধে উক্ত এবং আরও অনেক বিজ্ঞ বিজ্ঞ ডাক্তারগণ লিখিয়াছেন যে, কন্যা অপেক্ষা পুং সন্তানের রক্তস্রাব, হৃত্‌পিণ্ডের পীড়া ধমনীর বিকৃতি প্রভৃতি বহুবিধ পীড়া অধিক হয়। এ ভিন্ন কন্যা

* "More male children die in the earlier years of infancy than female" (The student of Hand Book of Forensic medicine and medical Police by Dr. H. Aubery Husband page 380 4 th Edn.)

† "The proportion of deaths is greater among males than females, (See Dr. Robert's Practice of medecine Page 5)

সন্তান অপেক্ষায় পুত্র সন্তানের মস্তকের পরিধিতে গড়ে প্রায় আধ ইঞ্চি বড় ও কঠিন হয়। সারজেমস্ সিমসন্ মহোদয় বলেন যে, এই জন্যই প্রায় অধিকাংশ পুত্র সন্তান নিস্পন্দ, জড়, বা হীন বরণ হইয়া থাকে। তিনি বলেন যে, কেবল মাত্র এই এক সুতিকাগারে ৪৭ হাজার পুং সন্তান ও ৩৪ হাজার প্রসূতির মৃত্যু হইয়াছে।

ভগবান্ মনুর স্ত্রী পুরুষের সমতারক্ষার জন্যই বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ ও বয়ঃকনিষ্ঠা নারীর পাণি গ্রহণের জন্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

২। স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ বিলম্বে যৌবন প্রাপ্ত হয় ও অনেক পরে সন্তান উৎপাদিকা শক্তি হইতে হীন হয়। স্ত্রী পুরুষের বয়সের এত অধিক ন্যূনাধিক্য থাকার ইহাও একটি বিশেষ কারণ। যে সকল দেশে বা জাতিতে স্ত্রী পুরুষের বয়স সমান থাকে। সে সকল জাতিতে পুরুষের পুত্র উৎপাদন শক্তি রহিয়া যায়, এ দিকে স্ত্রী জাতির ঐ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় ও প্রবৃত্তির হ্রাস ও হয়।

৩। চুম্বকীয় চিকিৎসকগণ বলিয়া থাকেন যে, দুই ব্যক্তি একত্র অবস্থান করিলে অবস্থা বিশেষ দুর্ব্বল ও বয়োধিক ব্যক্তির দেহে পরিণত ও বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তির দেহ হইতে চুম্বকীয় শক্তি সবল হয়। সাংসারিক গুরুভাবের অধিকাংশ কার্য্য পুরুষকেই সম্পন্ন করিতে হয়। পুত্র উৎপাদন ইত্যাদি নানাকারণে বলক্ষয় হয়।

৪। বালিকাদিগকে ঋতুর পুর্ব্বে বিবাহ দেওয়া সম্বন্ধেই বর্ত্তমান সময়ে আন্দোলন হইতেছে। আমরা এ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিব। যাহারা বালিকা বিবাহ দেওয়াতে মহাপাপ বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের ক্ষুদ্র যুক্তি ও নিয়মের প্রতি একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন, এই প্রার্থনা।

বালিকা বিবাহ সম্বন্ধে মহর্ষি অঙ্গিরা বলেন,—

অষ্টবর্ষা ভবেত্ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অতি ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥
তস্মাৎ সংবৎসরে প্রাপ্তে দশমে কন্যকা বুধৈঃ।
প্রদাতব্যা প্রযত্নেন ন দোষঃ কালদোষতঃ॥

অষ্টবর্ষীয়া বালিকা গৌরী, নবমবর্ষীয়া বালিকা রোহিণী, দশমবর্ষীয়াকে কুমারী বলা যায়। ইহার অধিক বয়স হইলে স্ত্রীলোককে রজস্বলা বা ঋতুমতী বিবেচনা করিতে হইবে। অতএব জ্ঞানীগণ দশমবর্ষ প্রাপ্ত হইলেই কন্যাদিগকে সর্ব্ব প্রযত্নে বিবাহ দিবেন, ইহাতে বালিকা বলিয়া যে দোষ, তাহা স্পর্শ হইবে না।

কালেঽদাতা পিতা যস্ত কালে চানুপয়ন্ পতিঃ।

মাতুশ্চারক্ষিতা পুত্রঃ দণ্ড্যোধর্ম্মেণ পাপভাক্॥

বৃহস্পতিঃ॥

কালে যে পিতা কন্যাদান না করে,কালে যে পতি পত্নী সংসর্গ না করে ও যে পুত্র মাতাকে পালন না করে, তাহারা পাপী ও ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে দণ্ডনীয়॥

কন্যার ঋতু না হইতে এবং তাঁহার স্তন উঠিবার পূর্ব্বে বিবাহের কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অবিবাহিতা কন্যা ঋতুমতী হইলে হিন্দুর নিকট তাহা মহাপাতক বলিয়া গণ্য। মহর্ষি বশিষ্ট বলেন,—

যাবন্তু কন্যামৃতবঃ স্পৃশন্তি তুল্যৈঃসকামামপি যাচ্যমানং।

তাবন্তি ভূতানি হতানি তাভ্যাং মাতাপিতৃভ্যামিতি ধর্ম্মবাদঃ॥

সকামা ও তুল্য বরের প্রার্থিত কন্যা যতবার ঋতুমতী হয়, তাহার পিতামাতা তত সংখ্যক জীবহত্যার পাতকী হয়েন।

কলির শাস্ত্র প্রণেতা মহর্ষি পরাশর বলেন,—

প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।

মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ম্॥

মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠভ্রাতা তথৈবচ।

এয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্॥

যস্তাং সমুদ্বহেৎ কন্যাং ব্রাহ্মণোঽজ্ঞানমোহিতঃ।

অসম্ভাষ্যোহ্যপাঙক্তেয়ঃ সবিপ্রো বৃষলীপতিঃ॥

(পরাশর সংহিতা সপ্তম অধ্যায়)

কন্যার দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলেও যদি কন্যা সম্প্রদত্তা না হয়, তবে তাহার পিতৃগণ মাস মাস তাহার ঋতু শোণিতপান করিয়া থাকে।'

কন্যা (অবিবাহিতাবস্থায়) রজস্বলা হইতে দেখিলে তাহার মাতা পিতা ও জেষ্ঠভ্রাতা তিনজনেই নরকগামী হন। যে ব্রাহ্মণ অজ্ঞান মুগ্ধ হইয়া ঐ কন্যা বিবাহ করেন, তিনি শূদ্রাপতি সদৃশ। তাহার সহিত কেহ এক পংক্তিতে ভোজন এবং সম্ভাষণও করিবে না।

ঋতুর পূর্ব্বে বিবাহ সম্বন্ধে আর্য্য ঋষিদিগের এই মত। তাঁহাদের এরূপ কঠোর ব্যবস্থার কারণ কি আমরা নিম্নে বিবৃত করিলাম।

প্রথম ঋতুর পর হইতেই স্ত্রীলোকদিগের শারীরিক ও মানসিক যে সকল পরিবর্ত্তন হয়, তাহা অবগত হইতে পারিলে পাঠক মহোদয়গণ অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে, ঋতুর পূর্ব্বে বিবাহ দিতে মহর্ষিগণ কেন এত কঠোর ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। ইংলণ্ডীয় ধাত্রীবিদ্যায় লিখিত আছে,—

"প্রথম রজোযোগের পর হইতে স্ত্রীলোকের শারীরিক ও মানসিক বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। যথা, শরীর পুষ্ট, গঠন সুগোল ও শোভা-যুক্ত, নিতম্ব দেশ প্রসারিত, স্তনদ্বয় বর্দ্ধিত এবং সমুদয় অবয়ব সুদৃশ্য ও লাবণ্য যুক্ত হয়। মানসিক পরিবর্ত্তন ও আশ্চর্য্যরূপে লক্ষ্য করা যায়। যথা বাল্যকালের অনুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহারা স্ত্রীজাতির কার্য্য ও আচরণে মনোনিবেশ করে, সর্ব্বদা বিনীত ও লজ্জিতভাবে থাকে, স্বীয় অবস্থান্তর জানিয়া তদুপযুক্ত সুখসম্ভোগে ইচ্ছুক হয় এবং যে মহৎ অভিপ্রায়ে স্ত্রীজাতি সৃষ্টি হইয়াছে, শীঘ্রই তৎকার্য্যক্ষমা হইয়া উঠে।" *
(ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি মহোদয়ের ধাত্রীবিদ্যা ৩১ পৃঃ দেখ)।

* MENSTRUATION.

"The effects of the development of this function upon the body and mind of a young girl are very stricking. The figure enlarges becomes rounder and more fully formed, the Pelvis expands, the mammai enlarge and the general bearing becomes graceful and dignified. The mental change is as remarkable, the pursuits of girlhood are exchanged for more womanly interests and a more exquisite perception of

her position and relatives resuts in higher enjoyment, veiled by a more delicate modesty. These changes are rabid and of curing at this peculiar period doujtless fit the individual for the more perfect fulfilment of the duties about to devolve upon fer (See Theary and Practice of Midwebfery by Dr, Churchilli. Page 121.)

পাঠক মহোদয়গণ ! এখন আপনারাই চিন্তা করিয়া দেখুন যে, দেশের স্ত্রীজাতির পবিত্রতা রক্ষা করাই সর্ব্ব প্রথমে উদ্দেশ্য। স্বদেশের পিতা মাতাকে কন্যাদান করিতে হইলে ঋতুর পরে কি পূর্ব্বে দান করা উচিত ? ফলতঃ ঋতুর পরে যদি কেহ চিত্তচঞ্চল বশতঃ দুর্ব্বলতার পরিচয় দেয়, এই আশঙ্কায় সুবিজ্ঞ আর্য্য পণ্ডিতগণ ঋতুর পূর্ব্বে বিবাহের জন্য বিশেষ রূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

প্রাচীন কালে আমাদের দেশে এবং এখনও যে সকল জাতিদের মধ্যে অধিক বয়সে কন্যা বিবাহের প্রথা প্রচলিত দেখা যায়, তাহারা প্রায় সকলেই বলিষ্ঠ জাতি। তাহাদের কন্যাদের প্রথম রজোযোগ অধিক বয়সে প্রকাশ পায়। প্রাচীন সময়ের ক্ষত্রিয় জাতির সয়ম্বর ও ইচ্ছামত বর গ্রহণের প্রথমে উল্লেখ করিয়া আজকাল অনেকেই পাশ্চাত্য দেশ সমূহের বিবাহ প্রণালীকে উৎকৃষ্ট বলেন এবং সেই প্রথা এদেশে প্রচলিত হওয়ার জন্য কেহ কেহ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। আমরা এ সম্বন্ধে গুটিদুই কথা বলিব, বোধ হয় পাঠক মহোদয়গণ এ সম্বন্ধেও একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

প্রাচীন সময়ের ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই শ্রেণীর বিবাহ দুই প্রকারে সম্পন্ন হইত।

১ম প্রকার এই যে, কন্যার পিতা ভ্রাতা বিশেষ কোন পণ রাখিতেন, যিনি সেই পণে জয়লাভ করিতে পারিতেন, তিনিই সেই কন্যা লাভ করিতেন। ইহাতে কন্যার স্বাধীনতা বা অধিক বয়সে বিবাহ হওয়ার কোন প্রমাণ নাই। ২য় প্রকারের এই যে, বহুতর স্বজাতি বিবাহার্থী সভা স্থলে উপস্থিত হইলে, কন্যা তন্মধ্য হইতে স্বীয় মনোমত পতি নির্ব্বাচন

করিয়া লইবে, এই নিয়ম অনুসারে যে সর্ব্বদা এই বিবাহ সম্পন্ন হইত, তাহা নহে। বশিষ্ঠ ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে কোন কোন সময় কোন কোন রমণী ঐরূপে পতি মনোনীত করিয়া লইতেন। সেই সকল বিশেষ বিশেষ স্থলেও রমণীগণের ঋতুর পূর্ব্বে কি পরে হইত, তাহারত স্পষ্ট কোন প্রমাণ নাই। সেই সময়কার আর্য্যগণ যে বিবাহ বিষয়ে শাস্ত্র মানিবেন না, তাহাই বা কি প্রকারে বলিব? সম্ভবতঃ তখনকার রমণীগণ অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে ঋতুমতী হইতেন। যাহা হউক স্থল বিশেষে বিশেষ কোন কারণ থাকিলে, কি অবস্থানুসারে এইরূপে অধিক বা অল্প বয়সে বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইত। বলা বাহুল্য এখনও হইতেছে। ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন,—

উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।
অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাদ্যথাবিধি॥

৯ অধ্যায় ॥ ৮৮॥

কুল এবং আচার উৎকৃষ্ট, সুরূপ এবং সজাতীয় বর পাইলে কন্যা বিবাহ যোগ্যা না হইলেও তাহাকে যথা বিধানে সম্প্রদান করিবে॥ ৮৮॥

ঋতুমতী হইয়াও যাবজ্জীবন গৃহে থাকিবে, সেও বরং ভাল, তথাপি বিদ্যাদিগুণ রহিত পুরুষকে কদাচ দান করিবে না॥ ঐ॥ ৮৯॥

ত্রীণি বর্ষাণ্যদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
ঊর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিং॥ ঐ ৯০॥

পিত্রাদিরা যদি গুণবান্ বরকে কন্যা সম্প্রদান না করেন, তবে কন্যা ঋতুমতী হইলেও তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া, পরে স্বয়ম্বরা হইবে॥৯০॥

পিত্রাদি কর্ত্তৃক অদীয়মানা কন্যা যদি যথাকালে ভর্ত্তাকে বরণ করে, তাহাতে কন্যার কিছুমাত্র দোষ হয় না এবং উক্ত ভর্ত্তার ও কোন দোষ নাই॥ ঐ॥ ৯১॥

ঐরূপ স্বয়ম্বরা কন্যা পিতৃদত্ত, ভ্রাতৃদত্ত, অথবা মাতৃদত্ত ভূষণাদি গ্রহণ করিতে পারিবে না, যদি লয়, তবে চোর হইবে॥ ঐ॥ ৯২॥

ঐ ঋতুমতী কন্যাকে যে বিবাহ করিবে, সে কন্যার শুল্ক উঁহার

পিতাকে দিবে না, কারণ ঋতু রোধ অপত্যের উৎপাদন দোষ বশতঃ ঐ কন্যাতে উহার স্বত্ব নষ্ট হইয়াছে॥ ঐ॥ ৯৩॥

আমরা শাস্ত্রকারদিগের উপরি উক্ত সমস্ত ব্যবস্থাগুলি আলোচনা করিলে নিম্ন লিখিত কএকটী বিষয় স্পষ্ট রূপে দেখিতে পাই। যথা;—

১। সকল ব্যবস্থাপকেরাই ঋতুর পূর্ব্বে কন্যাদিগের বিবাহের মত দিয়াছেন।

২। ভগবান্ মনু স্থল বিশেষে ঋতুর পরেও বিবাহের মত দিয়াছেন। ইহা একটি বিশেষ বিধি। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পাত্র না পাইলে কি অন্য কোন বিশেষ কারণে বিবাহের প্রতিবন্ধক হইলে ঋতুর পরেও বিবাহ দিতে পারা যাইবে। ইচ্ছাপূর্ব্বক বিনা কারণে ঋতুর পরে বিবাহ দেওয়া মনুর মতেও নিতান্ত অন্যায়।

৩। স্বয়ম্বর প্রথা প্রাচীন কালে ক্ষত্রিয়দের মধ্যেই প্রচলন ছিল, তাহারা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বলিষ্ঠ জাতি। সম্ভবতঃ তাহাদের কন্যাগণের ঋতু অধিক বয়সে প্রকাশ হইত।

৪। প্রাচীন কালে বালক বালিকাদিগের অতি শৈশবকাল হইতে রীতিমত ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দেওয়া হইত। এখন যে কথায় কথায় আমরা প্রাচীন কালের দোহাই দেই, আমরা আমাদের রমণী ও পুরুষগণকে কি ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা প্রদান করিতেছি। কাহার বলে পুরুষ ও রমণীগণ আত্মরক্ষা করিবে। এ সকল কথা আমাদের লক্ষ্য নাই। প্রাচীন কালে কোন কোন স্থলে রমণীগণ স্বাধীন ভাবে পতি নির্ব্বাচন করিতেন, ইংরাজ ইত্যাদি ইউরোপের রমণীগণও করিতেছেন, অতএব এই প্রথা আমাদের মধ্যেও বর্ত্তমান সময়ে প্রচলন হওয়া কর্ত্তব্য, এই একমাত্র কথা, এই এক মাত্র যুক্তি।

ইংরেজ প্রভৃতি জাতির কন্যার অধিক বয়সে বিবাহ হওয়ার অন্যান্য কারণ মধ্যে সে দেশের কন্যাগণের প্রথম রজোদর্শন আমাদের দেশের কন্যাগণ অপেক্ষা অনেক গৌণে হয়। তাহাদের দেশের কন্যাগণের প্রথম রজোদর্শন ১৬।১৭ বৎসরে ও আমাদের দেশে ১১।১২ বৎসরে প্রকাশ পায়। ইংরেজদিগের দেশ অতি শীত প্রধান, তথায় জীবের

বৃদ্ধি অল্পে অল্পে হয়। উত্তপ্ত দেশে জীব কি বৃক্ষ সকলই দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠে, আমাদের দেশে পাঁচ বৎসরে যতটুকু বৃদ্ধি পাইবে, ইংলণ্ডে সেই পরিমাণে বৃদ্ধি হইতে ৭ বৎসর লাগিবে। ইহাদ্বারা বুঝা যায়, কেন আমাদের দেশে অল্প বয়সে ও ইংলণ্ডে অধিক বয়সে বিবাহ হয়। আমাদের দেশের কন্যারা ১৪।১৫ বৎসরে যুবতি হয়, ইংলণ্ড দেশে কন্যারা ১৪।১৫ বৎসরে বালিকা থাকে, লাপলাণ্ড দেশে ১৮ বৎসরেও বালিকা থাকে (সে দেশে ২০।২৫ বৎসরে কন্যাগণ ঋতুমতী হন) এজন্য বিবাহের বয়স দেশ ভেদে ইতর বিশেষ হইয়া থাকে।

এ ভিন্ন উষ্ণ প্রধান দেশ বলিয়া আমাদের দেশের স্ত্রীজাতির জননেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া কিয়ৎ পরিমাণে প্রবল হইয়া থাকে। (ইহাও একটি বিশেষ আবশ্যক কথা)। বিলাতেও সময় সময় ১৬।১৭ বৎসরের সময় কন্যাদিগকে বিবাহ দেওয়া হয়। তাহাদের ১৬।১৭ বৎসরে বিবাহ হওয়াতে যে কথা, আমাদের ১০।১১ বৎসরে বিবাহ হওয়াও সেই কথা। যাহাকে বিলাতে ২২।২৪ বৎসরের মধ্যেই অনেকের বিবাহ হয়। আমাদের দেশে ঐ সময়ে বিবাহ হইলে কন্যার শারীরিক সেই সম্পন্নতা বা যৌবন আর থাকে না।

আজকাল কেহ কেহ বলেন যে, বালিকা বয়সে কন্যার বিবাহ হইলে এবং তদ্‌গর্ভে সন্তান জন্মিলে রক্ষা পায় না। এ আপত্তির মধ্যে কোন মূল্যই নাই। মনুর সময়াবধি আমাদের মধ্যে বালিকা বিবাহ প্রচলিত আছে, চিরকাল অতি অল্প বয়সে স্ত্রীলোকদিগের সন্তান হইয়া আসিতেছে, কিন্তু বালিকার সন্তান যে রক্ষা পায় না এমত সংস্কার লোকের কখনোও হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ের অন্ততঃ ৭০ বৎসর পূর্ব্বের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট দেখা যায় যে, সেই সময়েও বালিকা-বিবাহ ছিল, সেই সময়ের সন্তানগণ বলিষ্ঠ ও দীর্ঘায়ু হইত এবং সেই সকল দীর্ঘায়ু লোক এখনো সচরাচর সর্ব্বত্রই রহিয়াছেন।

আমরা সেই তত্ত্ব অবগত হওয়ার জন্য প্রায় একশত বৃদ্ধ (৬০ হইতে ১০০ বৎসরের) ভদ্রলোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছি যে, আপনারা বালিকা মাতার সন্তান সন্ততি কি না? তাঁহারা সকলেই বলিয়াছিলেন যে,

"আমরা সকলেই সেই মহর্ষি অঙ্গীরার ব্যবস্থানুসারে বিবাহিতা বালিকা মাতার সন্তান সন্ততি। আমাদের সময়ে অনেকস্থানেই পুরুষের বিবাহ অধিক বয়সে হইত, কিন্তু মেয়েদের বিবাহ সর্ব্বত্রই ঋতুর পূর্ব্বেই নিষ্পন্ন হইত। ফলতঃ এখনও বাঙ্গালীদের মধ্যে যে সকল দীর্ঘায়ু ও বলিষ্ঠ ব্যক্তি আছেন, তাহারা সকলেই বালিকা বয়সে বিবাহিতার সন্তান।

শরীর তত্ত্ব বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিলেও দেখা যায় যে, সন্তানের জীবনশক্তি সম্বন্ধে জননীর বয়স অপেক্ষা জনকের বয়স অধিক কার্য্যকারক। যদি জনক প্রাপ্ত বয়স্ক হন, তবে জননী অল্পবয়স্কা হইলেও কোন ক্ষতি নাই। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা কথায় কথায় একমাত্র ইংলণ্ডের বিজ্ঞানের দোহাই দেন তাঁহাদের মনে করা উচিত যে, ইংলণ্ডের বিজ্ঞান আমাদের লোকের প্রকৃতি সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া লিখা হয় নাই। ইংরেজেরা তাঁহাদের দেশের লোকের প্রকৃতি সম্যকরূপে অবগত হইয়া যে সকল তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাই বিশদরূপে ঐ সকল বিজ্ঞানে লিখা আছে।

বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজ সংস্কারক মহোদয়গণ কি নিশ্চয়রূপ বলিতে পারেন যে, এদেশের স্ত্রীজাতির জননেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া হইতে ইংরেজের রমণীর জননেন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার কি কি প্রভেদ আছে? নিশ্চয়রূপে তাঁহারা এ সকল যে কিছুই বলিতে পারিবেন না। কারণ এ দেশের মৃতদেহ ও জীবিত দেহ ব্যবচ্ছেদ ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া কেহ কোন বিশেষ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানিনা। বড় বড় ডাক্তারগণ যাহা কিছু বলেন, তাহা সমস্তই প্রায় অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলেন।

বালিকা বিবাহের আর একটি দোষের কথা কেহ কেহ বলেন যে, এই বিবাহে প্রণয় জন্মে না, আর যদি জন্মে সে সামান্য। যৌবন বিবাহে প্রথমে প্রণয়ের যে প্রবল বেগ দেখা যায়, বালিকা বিবাহের প্রথম কি শেষে সেই প্রকার বেগ কখনই জন্মে না, ইহা সত্য, কিন্তু যৌবন বিবাহের প্রণয়ের বেগ কেবল শারীরিক, মানসিক নিতান্ত সামান্য। মানসিক চাঞ্চল্য যাহা কিছু হয়, তাহা কেবল শারীরিক চাঞ্চল্য হইতে।

শারীরিক চাঞ্চল্য হ্রাস হইলে সেই মানসিক চাঞ্চল্যও সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস হয়। এই জন্যই ইংরেজদের মধ্যে বিবাহের অনেক সময় দেখা যায়। প্রথমে বড় প্রণয়, কিন্তু দশ দিন পরে আরতো থাকেনা।

আমাদের দেশের বালিকা বিবাহে আশ্চর্য্য প্রণয় নাই সত্য, কিন্তু পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অকৃত্রিম ভালবাসা বা প্রণয় আর কোন জাতির সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে ঘটে না বলিলেও হয়। আমাদের সংসারের এই সুখের, এই অকৃত্রিম ভালবাসার একমাত্র কারণ বালিকা বিবাহ। বালিকা বিবাহে প্রণয় যেটুকু জন্মে, সেটুকু স্থায়ী হয়, সংসারযাত্রা সুখে নির্ব্বাহ হয়।" ক্রমশঃ

ঋষি।

যাঁহাদের প্রসাদে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম বহুবিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া নানা অত্যাচার সহ্য করিয়া আজিও জগতে বিদ্যমান রহিয়াছে, যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের প্রবর্ত্তয়িতা—প্রাণ ও ভিত্তিস্বরূপ, ভারতের আজি এমন দিন পড়িয়াছে যে,হিন্দুগণ অনেকেই তাঁহাদের স্বরূপ পরিজ্ঞাত নন। অনেকের হয়ত বিশ্বাস যে, আজ এখন যেমন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ বর্ত্তমান রহিয়াছেন, ঋষিগণ ও সেইরূপ ছিলেন, তবে তাঁহারা অনেক গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন ও অতি প্রাচীনকালে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া এখনকার পণ্ডিতগণ অপেক্ষা সম্মানিত হইয়া থাকেন, কেহ কেহ বা এরূপ বিশ্বাস করেন যে, তাঁহারা অতি সচ্চরিত্র সম্পন্ন ও এখনকার ধার্ম্মিক মনুষ্যের ন্যায় ধার্ম্মিক ছিলেন। বোধ হয় এই বিশ্বাস বশেই আজি কালিও আমাদের দেশের দুই একজন মহাত্মার প্রতি ঋষি শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কি কারণে ঋষিগণ সাধারণ মনুষ্য হইতে অধিক সম্মানিত হইতেন এবং কেনই বা তাঁহারা ঋষিপদ বাচ্য হইয়াছেন, তাহা হিন্দু শাস্ত্রেই বিশেষরূপে বর্ণিত রহিয়াছে, তাহা জানিলে হইলে ঋষিগণ সম্বন্ধে আমাদের অনেক ভ্রম দূরীভূত হইবে। যজুর্ব্বেদে তাহাদের ঋষিত্বের কারণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

* "অজান্ হবৈ পৃশ্নীংস্তপস্যমানান্ ব্রহ্ম স্বয়ং
স্বয়ম্ভ্বভ্যানর্ষৎ তদৃষয়েঽভবন্তদৃষীণামৃষিত্বম্"

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে

অর্থ—কল্পাদৌ সৃষ্ট মুনিগণ স্বরূপতঃ নির্ম্মল হইলেও পুনঃ পুনঃ তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া জগৎ কারণ স্বতঃ সিদ্ধ পরব্রহ্ম কোন মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তপস্যমান ঋষিগণের প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিলেন। সেই হেতু তাঁহারা ঋষি ধাতুর অর্থানুসারে ঋষিপদ বাচ্য হইয়াছেন। অন্য ঋষিগণের এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে ঋষিত্বসিদ্ধ হইয়া থাকে।

এই বেদোক্ত আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া নিরুক্তকারগণ ও ঋষি শব্দের অর্থ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ভগবান্ যাস্ক তাঁহার নিরুক্তগ্রন্থে নিম্নলিখিতরূপে ঋষিশব্দের অর্থ-নির্ণয় করিয়াছেন।

† "ঋষিদর্শনাৎ স্তোমান্ দদর্শেতি ঔপমন্যবঃ। তদ্যদেনাংস্তপস্যমানান্ ব্রহ্মস্বয়ম্ভ্বভ্যানর্ষৎ তদৃষীণাং ঋষিত্বমিতি বিজ্ঞায়তে"

অর্থাৎ সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয়ার্থ যিনি দর্শন করেন তিনি ঋষি। ঔপমন্যব আচার্য্য বলেন বেদমন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া ঋষি "তদ্যদেনাৎ" ইত্যাদি ব্রাহ্মণাংশের দ্বারা উক্তমরূপ অর্থ প্রকাশ পায়।

---

* "কল্পাদৌ এব ব্রহ্মণা সৃষ্টাঃ ন অস্মদাদিবৎ পুনঃ পুনঃ জায়ন্তে তস্মাৎ "অজাঃ" তেচ "পৃশ্নয়ঃ" শুক্লা স্বরূপেণৈব নির্ম্মলাঃ সন্তোঽপি পুনঃ পুনঃ তপঃ আচরন্ তদীয়েন তপসা তুষ্টং স্বয়ম্ভু "ব্রহ্ম" জগৎ কারণত্বেন স্বতঃ সিদ্ধং পর ব্রহ্মবস্তু কাঞ্চিৎ মূর্ত্তিং ধৃত্বা তপস্যমানান্ তানৃষীন্ অনুগৃহীতুং আভিমুখ্যেন প্রত্যক্ষং আগচ্ছৎ ততস্তে মুনয় ঋষিধাত্বর্থবিষয়ত্বাৎ ঋষয়োঽভবন্ তস্মাদন্যেষামপি ঋষীণাং অনয়ৈব ব্যুৎপত্ত্যা ঋষিত্বং সম্পন্নম্"

† ঋষিদর্শনাৎ পশ্যত্যসৌ সূক্ষ্মানর্থান্। স্তোমান্ দদর্শেত্যৌপমন্যব আচার্য্য মন্যতে" ব্রাহ্মণমপি চৈতস্মিন্নর্থে দর্শয়তি তদ্যদেনামিত্যাদি।

ইতি দুর্গাচার্য্যঃ

প্রথমোদ্ধৃত ব্রাহ্মণাংশের সায়ণভাষ্যানুসারে ঋষিগণের নিকট ব্রহ্ম প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা ঋষিপদ বাচ্য, যাস্কমতে তাঁহারা সূক্ষ্ম অর্থ দর্শন করেন বলিয়া ঋষি। ঔপমন্যবাচার্য্যের মতে তাঁহারা বেদ দর্শন করেন বলিয়াই ঋষি। এই তিন প্রকার অর্থ হইতে ঋষিগণ অতি সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয়ার্থ দর্শন করিতেন এইরূপ অর্থ প্রতিপন্ন হইতেছে। প্রথম আখ্যায়িকানুসারে ঋষিগণ ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, ব্রহ্ম অতীন্দ্রিয়, সুতরাং অতীন্দ্রিয়ার্থ দর্শন রূপ সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিলে কোন আপত্তি হইতে পারে না। ঔপমন্যবাচার্য্যের মতে বেদদর্শন হেতু ঋষি, সুতরাং বেদ প্রতিপাদ্য বিষয় অবশ্যই দর্শনে সমর্থ ছিলেন। বেদ অতীন্দ্রিয় বিষয়ই প্রতিপাদন করেন। বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় দুই, এই দুই বিষয়ই অতীন্দ্রিয় ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম।

"প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা তু যস্তূপায়ো ন বুধ্যতে।
এতং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্ বেদস্য বেদতা॥"

অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারায় যে উপায় (ইষ্ট প্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের উপায়) বুঝিতে পারা যায় না, সেই উপায় বেদ হইতে জানা যায় বলিয়া উহার নাম বেদ। সায়ণাচার্য্য তাহার যজুর্ব্বেদ ভাষ্যের উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন" ইষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্টপরিহারয়োরলৌকিকমুপায়ং যোগ্রন্থঃ বেদয়তি, স বেদঃ"

"যদুক্তমলৌকিকার্থবোধকো বেদইতি তত্র বেদার্থঃদ্বিবিধঃ ধর্ম্মো ব্রহ্মচ।"

ঋষিগণ যে বেদ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা শাস্ত্রের অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই তাঁহারা কোন স্থলে মন্ত্রদ্রষ্টা কোন-স্থলে বা মন্ত্রকৃৎ নামে অভিহিত হইয়াছেন। সায়ণাচার্য্য যজুর্বেদ ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

অতীন্দ্রিয়ার্থদ্রষ্টারো ঋষয়স্তেষাং বেদদ্রষ্টৃত্বং স্মর্য্যতে।
"যুগান্তে তর্হি তান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতা স্বয়ম্ভুবা॥"

অর্থাৎ প্রলয়কালে ইতিহাস সহিত বেদ অন্তর্হিত ছিল, ঋষিগণ তপস্যার দ্বারা স্বয়ম্ভুর অনুগ্রহে তাহা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রুতি বলিতেছেন,—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীমায়মন্তামন্ববিন্দন্ন ঋষু প্রবিষ্ঠাম্"

যাজ্ঞিকেরা যজ্ঞদ্বারা বেদলাভ যোগ্য হইয়া ঋষিস্থিত সেই বেদ লাভ করিয়াছিলেন।

শঙ্করাচার্য্য শারীরক ভাষ্যে লিখিয়াছেন, "স্মরন্তি চ শৌনকাদয়ো মধুচ্ছন্দঃপ্রভৃতিভিঃ ঋষিভির্দ্দাশতয্যো দৃষ্টা ইতি" শৌনকাদি স্মৃতিগ্রন্থে বলিয়াছেন, মধুচ্ছন্দঃ প্রভৃতি ঋষিগণ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ঋক্ সকল দর্শন করিয়াছিলেন। মহীধর স্বপ্রণীত যজুর্ব্বেদ ভাষ্যে "ত্বামদ্য ঋষে" ইত্যাদি মন্ত্রের ব্যাখ্যা স্থলে "হে ঋষে মন্ত্রাণাং দ্রষ্টঃ" এইরূপ ঋষিশব্দের অর্থ মন্ত্রদ্রষ্টা করিয়াছেন। ঋষিগণ বেদদ্রষ্টা হইলে, তাঁহারা অতীন্দ্রিয়ার্থ দ্রষ্টা ছিলেন, এইরূপ অর্থ হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভগবান্ যাস্ক তাঁহার নিরুক্ত গ্রন্থের এক স্থলে লিখিয়াছেন।

"সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মাণঃ ঋষয়ো বভূবুঃ। তেঽবরেভ্যোঽসাক্ষাৎকৃতধর্ম্মভ্য উপদেশেন মন্ত্রান্ সম্প্রাহুঃ"

পূর্ব্বে ঋষিগণ নির্ম্মল সত্ত্ব হেতু ধর্ম্মাদি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও বেদ মন্ত্রাদি স্বয়ং অনুভব করিতেন, পরবর্ত্তী মুনিগণ স্বয়ং ঐরূপ ধর্ম্মাদি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অনুভব করিতে সমর্থ ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত মহর্ষিগণ উপদেশদ্বারা ঐ সকল বিষয় পরবর্ত্তী ঋষিগণকে শিক্ষা দিতেন, পরে ইঁহারাও মহর্ষিগণের ন্যায় আধ্যাত্মিক তত্ত্বাদি দর্শনে সমর্থ হইতেন। এতদ্দ্বারা যাস্কের পূর্ব্বোদ্ধৃত "ঋষি দর্শনাৎ" এই বাক্য আরও বিশদ হইল। ঋষিগণেরা ধর্ম্মাদি তত্ত্ব সকল স্বয়ং অনুভব করিতে পারিতেন, তাহা ন্যায় দর্শনের ভাষ্যে ভগবান্ বাৎস্যায়ন দেব ও বলিয়াছেন। তিনি "মন্ত্রায়ুর্ব্বেদ প্রামাণ্যবচ্চ তৎপ্রামাণ্যমাপ্তপ্রামাণ্যাৎ" এই সূত্রের ভাষ্যে ঋষিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন "কিং পুন রাপ্তানাং প্রামাণ্যম্? সাক্ষাৎকৃত ধর্ম্মতা, ভূতদয়া, ভূতার্থচিখ্যাপয়িষেতি। আপ্তাঃ খলু সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মাণঃ ইত্যাদি।

আপ্তগণের (ঋষিগণের) প্রামাণ্যের কারণ কি? সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মতা,

ভূতদয়া ও যথার্থ বিষয় কীর্ত্তনেচ্ছা। ঋষিগণ সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা ছিলেন ইত্যাদি। ঋষিগণের অতীন্দ্রিয়ার্থ দ্রষ্টৃত্ব অন্যত্র ও দৃষ্ট হয় "আম্নায়-বিধাতৃণামৃষীণামতীতানাগতবর্ত্তমানেষতীন্দ্রিয়ার্থেষু ধর্ম্মাদিষু গ্রন্থোপ-নিবদ্ধেষু বা লিঙ্গাদ্যনপেক্ষনাদাত্মমনসোঃ সংযোগাদ্ধর্ম্মবিশেষাচ্চ প্রাতিভং জ্ঞানং যদুৎপদ্যতে তদার্যম্"

বেদবিধাতা ঋষিগণের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান অতীন্দ্রিয় বিষয়ে, গ্রন্থোপনিবদ্ধ ধর্ম্মাদিতে প্রমাণাদির অপেক্ষা না করিয়া আত্মমনঃ সংযোগে ও ধর্ম্মবিশেষদ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে আর্ষ জ্ঞান কহে।

সায়ণাচার্য্য বেদভাষ্যে ঋষি শব্দের অর্থ অতীন্দ্রিয়ার্থদ্রষ্টা করিয়াছেন।

"যং কাময়ে তং উগ্রং কৃণোসি। তং ব্রহ্মাণং তং ঋষিং তং সুমেধাম্"

ঋগ্বেদ দশম মণ্ডল।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, ঋষিং, অতীন্দ্রিয়ার্থদ্রষ্টারং।

"যো দেবানাং প্রথমং পুরস্তাদ্বিশ্বাধিকো রুদ্রো মহর্ষিঃ" ইত্যাদি মন্ত্র ব্যাখ্যা স্থলে মহর্ষি শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

"মহর্ষিঃ অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টৃণাং মধ্যে মহান্। ত্বয়া জুষ্ট ঋষির্ভবতি" ইত্যাদি মন্ত্রে হে মেধাদেবি! তোমার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলে মনুষ্য ঋষি, অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় দর্শী হয়। মহীধর বাজসনেয় সংহিতা ভাষ্যে "য ইমা বিশ্বা ভুবনানি জুহ্বদৃষির্হোতা ন্যসীদৎ পিতা নঃ"

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা স্থলে ঋষিঃ অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টা সর্ব্বজ্ঞঃ এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। এইরূপ আরও অনেক মন্ত্র আছে, যাহাতে ঋষি শব্দ অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টা, এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। †

ঋষিগণ অতীন্দ্রিয়ার্থ দর্শনে সমর্থ ছিলেন বলিয়া অতি প্রাচীন কাল হইতে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। এই জন্যই হিন্দুগণ ঋষিবাক্যে

† ঋষিঃ=অতীন্দ্রিয় দ্রষ্টা

ঋগ্বেদ ১।১৭৯।৬
৬।২১।৩
৬।৫৩।১০
৯।৭৬।৬ অতীন্দ্রিয় জ্ঞানী।

অনাস্থা প্রদর্শন করিতে পারেন না। এই ক্ষমতা বলেই তাঁহারা অতি সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলি প্রকাশ করিয়া তদ্বিষয়ে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। আমরা তাদৃশ ক্ষমতাশালী নহি, তাঁহাদের ন্যায় আমাদের তপস্যাদি কিছুই নাই, সুতরাং তাঁহাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবলীর বিষয় কিছুই বুঝিতে পারি না, বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের অনেক কথায় অনাস্থা প্রদর্শন করি। আমরা তাঁহাদের অনুভব সিদ্ধ তত্ত্বগুলি আধুনিক বাহ্য বিজ্ঞানদ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করি; কিন্তু সভ্য জগতের অহঙ্কারের বাহ্য বিজ্ঞান অধ্যাত্ম বিজ্ঞান হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। তাহার দ্বারা অতি সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলির বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। আমাদের বাহ্য বিজ্ঞানের উপরই আস্থা অধিক। যাহা বাহ্য বিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় না। অসম্পূর্ণ বাহ্য বিজ্ঞানের বিরোধী বলিয়া বোধ হয়, আমরা তাহার অস্তিত্বও বিশ্বাস করি না, কাজেই ঋষিগণের বাক্য অনেক সময় বাতুলের প্রলাপ বলিয়া বোধ হয়। আমরা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আপনাদিগকে আর্য্যঋষিগণ অপেক্ষা জ্ঞানী বলিয়া বোধ করি, সেই হেতু তাঁহাদের প্রকাশিত কোন বিষয় কিছু অভিনব ও আমাদের যুক্তির বিরোধী বলিয়া বোধ হইলে আমাদের যে ভুল হইতে পারে, তাহা একবারও ভাবি না। ঋষিগণ যে ভুল করিয়াছেন, তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করি। ঋষিগণ যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাদের অনেকগুলিই আমাদের লৌকিক যুক্তির সীমা বহির্ভূত। লৌকিক যুক্তি অনুমানের উপর স্থাপিত, অনুমান আবার প্রত্যক্ষ মূলক, সুতরাং লৌকিক যুক্তি প্রত্যক্ষের উপরই নির্ভর করিতেছে। প্রত্যক্ষ আবার ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ ব্যতীত হয় না। অতএব অতীন্দ্রিয় বিষয় লৌকিক প্রমাণদ্বারা অবগত হওয়া যায় না। আমরা লৌকিক প্রমাণ অবলম্বন করিয়া অলৌকিক বিষয়ের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হই, কাজেই ঐ সকল অলৌকিক বিষয় আমাদের নিকট অসত্য বলিয়া বোধ হয়। যতদিন আমরা লৌকিক যুক্তিদ্বারা অলৌকিক বিষয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিব, ততদিন আমাদের কৃতকার্য্য হইবার আশা নাই। যেখানে লৌকিক যুক্তির দ্বারা অলৌকিক বিষয়ের

নির্দ্ধারণের চেষ্টা, সেই কালেই গোলযোগ উপস্থিত হয়। একজন একরূপ স্থির করিলেন, অপর একজন তদপেক্ষা বুদ্ধিমান্ তাঁহার ভুল প্রদর্শন করিয়া নিজ মত স্থাপন করিলেন। আবার হয় ত তদপেক্ষা বুদ্ধিমান্ পুরুষ তাহা হইতে কিছু নূতন করিলেন। এইরূপে কিছুই স্থির হয় না। অনুভব বা অলৌকিক জ্ঞানের প্রাধান্য না থাকিলে প্রায়ই গোল মিটে না। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রে আছে, "তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ" অর্থাৎ লৌকিক যুক্তির বা তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই, তাহা হইতে অলৌকিক বিষয় নির্দ্ধারণ করা যায় না। এই জন্যই শাস্ত্র ভূয়োভূয়ঃ শাস্ত্রানুযায়ী যুক্তির প্রাধান্য দিয়াছেন। আধুনিক দার্শনিকগণ সকলেই লৌকিক যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া অলৌকিক বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হন, কাজেই গোল মিটে না একজন অপরের প্রতিবাদ করেন। সকলেই স্ব স্ব প্রধান। গোলযোগ ক্রমেই গাঢ় হইতে গাঢ়তর হয়। আর্য্য ঋষিগণ অলৌকিক উপায়ে অলৌকিক বিষয় নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন, তাই তাঁহাদের তত্ত্বগুলি অভ্রান্ত। কিন্তু আমরা সেই অলৌকিক উপায় বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, কখন তাহা পরিজ্ঞাত হইতে চেষ্টাও করি না, সেই জন্য তাঁহাদের প্রকাশিত অধ্যাত্ম তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রায়ই কিছুই বুঝিতে পারি না, যতদিন আমাদের অহঙ্কার বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন আমরা অধ্যাত্ম তত্ত্ব বুঝিতে সমর্থ হইব না। আমরা যতই এখন উন্নত বলিয়া অহঙ্কার করি না কেন, আমরা প্রতিদিনই অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছি। এখন হইতে আবার যদি সেই অপরিমিত জ্ঞানশালী ঋষিগণের প্রবর্ত্তিত পন্থা অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের প্রকাশিত তত্ত্ব সকল পরিজ্ঞাত হইতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের কল্যাণ হইবার সম্ভব। তাহা হইলে আবার আমাদের উন্নতি হইতে পারে। নতুবা যে স্রোত বহিতেছে ইহাতে গা ঢালিয়া দিলে আমরা ক্রমেই আধ্যাত্মিক রাজ্য হইতে দূরে গমন করিব। প্রত্যাবর্ত্তনের আর আশা থাকিবে না।

শাস্ত্রব্যাখ্যা। *

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে অবিদ্যাকেই আত্মানন্দ উপলব্ধির প্রতিবন্ধিকা বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছি, এখন সেই অবিদ্যা বা প্রকৃতি বস্তুটী কি? এবং তাহার অন্তর্গত যে সমস্ত ভেদ আছে, তাহা বিবৃত করার নিমিত্ত দ্বিতীয় প্রস্তাবের অবতারণা করা হইতেছে। এই প্রস্তাবে ঈশ্বর, জীব ও আত্মার তুরীয় অবস্থা কি পদার্থ, তাহাও ব্যাখ্যাত হইবে।

শাস্ত্র বলেন,—

চিদানন্দময়ব্রহ্মপ্রতিবিম্বসমন্বিতা।
তমোরজঃসত্ত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা॥
সত্ত্বশুদ্ধিবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াবিদ্যে চ তে মতে।
মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ॥
অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যস্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা॥

সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থাকে-অকার্য্যা-বস্থাকে-যে অবস্থায় গুণত্রয় বিকৃত হয় নাই, তাহাকে প্রকৃতি বলে, দৃশ্যমান পদার্থ সমস্তই প্রকৃতির বিকার, সত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয় হইতেই নিখিল পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে, গুণত্রয় পরস্পর ভবাভিভব ক্রিয়ার দ্বারা সমস্ত বস্তু উৎপন্ন করিতেছে, কিন্তু যে অবস্থায় গুণত্রয়ের তাদৃশ ভবাভিভব চেষ্টা নাই, পরস্পর বৈষম্যভাব নাই, তাদৃশ অবস্থাকে প্রকৃতি বলে। বস্তুতঃ সত্ব, রজঃ,

---

* প্রুপসংশোধকের অজ্ঞতায় বিগত ভাদ্র মাসের শাস্ত্রব্যাখ্যা প্রবন্ধটী নিতান্তই অস্পষ্ট, এমন কি এক প্রকার অপাঠ্যই হইয়াছে, স্থানে স্থানে টীকার কথা মূলে, মূলের কথা টীকায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহাতে আমরা বিশেষ দুঃখিত হইলাম, আমাদের পরিশ্রমই বিফল হইয়াছে। কি করি পাঠক মহোদয়গণ একটু চিন্তা করিয়া পড়িলে কতকটা সংশোধন করিয়া লইতে পারিবেন। ইহা ব্যতীত আর আমাদের উপায় নাই।

তমঃ এই গুণত্রয়ই প্রকৃতি শব্দবাচ্য। কেবল মাত্র অবস্থাভেদে-ক্রিয়া ভেদে ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞার দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। যেমন তুলা একটী বস্তু, যতকাল তুলার কোন প্রকার বিকৃতি হয় নাই, তাবৎ পর্য্যন্ত উহাকে তুলাই বলে, পরে যখন ঐ তুলার সূত্রাকারে পরিণতি হয়, তখন ঐ তুলাকেই সূত্র বলিয়া অভিহিত করে, আবার সূত্র বস্ত্রাকারে পরিণত হইলে ঐ সূত্রকে বস্ত্র বলিয়া ব্যবহার হয়। বাস্তবিক কল্পে তুলা, সূত্র, বস্ত্র একই পদার্থ, কিন্তু অবস্থার তারতম্যে পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞায় ব্যবহার করা হইয়া থাকে। বস্ত্রাবস্থায় উহার সূত্র নাম ও সূত্রাবস্থায় বস্ত্র নামটী থাকে না, কিন্তু মূল পদার্থটীর পরিণতি ভিন্ন একেবারে বিনাশ কখনই হয় না, তেমনি প্রকৃতি সম্বন্ধেও বুঝিয়া লইতে হইবে। যখন গুণত্রয় সাম্যাবস্থায়,অবিকৃতাবস্থায় থাকে, গুণত্রয়ের কোনই পরস্পর ভবাভিভব চেষ্টা না থাকে, তখনই তাহাকে প্রকৃতি নাম দেওয়া হয়। প্রকৃতি কথার আর কোনই জটিল অর্থ নাই, প্রকৃতি মূল উপাদানের সংজ্ঞান্তরমাত্র, যাহা অখিল বস্তুর-ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুর সাক্ষাৎ এবং পরম্পরা সম্বন্ধে উপাদান কারণ-যাহা হইতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিকাশিত হইয়াছে, তাহাই প্রকৃতি, এই অর্থেই সর্ব্বত্র প্রকৃতি শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে, যেমন ঘটের প্রকৃতি মৃত্তিকা, বস্ত্রের প্রকৃতি সূত্র ইত্যাদি। এই প্রকৃতিরই অবস্থাভেদে, পরিণামের তারতম্যানুসারে বিবিধ নাম হইয়াছে। প্রকৃতির প্রথম পরিণাম বুদ্ধি, বুদ্ধির পরিণাম অহঙ্কার, অহঙ্কারের পরিণতি অবস্থা পঞ্চতন্মাত্র, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্রের অবস্থান্তর স্থূলভূত, এই স্থূল ভূতের বিকৃতি এই নিখিল জগৎ। এই যে পরস্পর বিকারাবস্থা দেখান হইল, ইহাতে প্রত্যেকটী—দৃশ্যমান জগৎ হইতে প্রকৃতি পর্য্যন্ত পরেরটী পূর্ব্বটীর, অর্থাৎ ঘটাদির স্থূলভূত, স্থূলভূতের পঞ্চতন্মাত্র পঞ্চতন্মাত্রের অহঙ্কার, এই প্রকার পরস্পর প্রকৃতি বিকৃতি ভাবে বুঝিতে হইবে। তাই আচার্য্যদেব বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন, "প্রকৃষ্টা কৃতিঃ পরিণামরূপা অস্যা প্রকৃতিঃ" অনন্ত পদার্থ যাহার পরিণাম, যাহা হইতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বিস্ফারিত হইয়াছে, সেই প্রকৃষ্ট কার্য্যকারী পদার্থই প্রকৃতিপদবাচ্য।

একটী প্রশ্ন এই—যদি সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের অকার্য্যাবস্থাকে প্রকৃতি বলা হয়, তবে কি এই বুদ্ধি তত্ত্ব প্রভৃতি পদার্থে প্রকৃতির বিনাশ হইয়াছে? কেন না বুদ্ধি হইতে বাহ্য পদার্থ পর্য্যন্ত কুত্রাপি গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা (অকার্য্যাবস্থা) নাই, সর্ব্বত্রই গুণত্রয় পরস্পর ভবাভিভব চেষ্টার দ্বারা বিকৃত হইয়া সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করিতেছে। এ প্রশ্ন পূর্ব্বেই মীমাংসিতপ্রায় হইয়াছে, তথাপি আর একটু বিস্তার করিয়া বুঝাইতে হইবে। পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে, প্রকৃত প্রস্তাবে গুণত্রয়ই প্রকৃতি, ইহা প্রকৃতি শব্দের লক্ষণ, সুতরাং গুণত্রয় প্রসূত সমস্ত পদার্থেই প্রকৃতির সত্ত্বা রহিয়াছে, কুত্রাপি প্রকৃতির বিনাশ বা বিলয় হয় নাই। তবে অবশ্যই গুণত্রয়ের অকার্য্যাবস্থাকে কেবলমাত্র প্রকৃতিই বলা হইয়া থাকে, আর বিকৃত পদার্থ বুদ্ধি প্রভৃতিকে পৃথক পৃথক নামের দ্বারা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ প্রত্যেক পদার্থেতে যখন গুণত্রয়ের সম্মীলন রহিয়াছে, তখন কুত্রাপিও প্রকৃতির অভাব হইতে পারে না। তবে এই মাত্র ভেদ করা যাইতে পারে যে, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকে সাক্ষাৎ প্রকৃতি, আর বুদ্ধি প্রভৃতি নিখিল পদার্থকে গৌণ প্রকৃতি বা প্রাকৃত বলিয়া ব্যবহৃত করা যায়, কিন্তু যেহেতু ত্রিগুণময় সংসার, তখন কুত্রাপি প্রকৃতির বিনাশ সম্ভবে না। তবে এই বিশেষ যে, অকার্য্যাবস্থাপন্ন গুণত্রয় প্রকৃতি, আর কার্য্যাবস্থাপন্ন গুণত্রয় পরিদৃশ্যমান সংসার। পরস্পরে কেবলমাত্র অবস্থার ভিন্নতা, বস্তুগত কোনই পার্থক্য নাই। যেমন পাট ইত্যাদি ও কাগজ। কাগজের প্রকৃতি পাট ইত্যাদি, কিন্তু কাগজের অবস্থায় পাট প্রভৃতির কিছুমাত্র সত্ত্বা উপলব্ধ হয় না। অবশ্য স্বীকার্য্য যে, কাগজের অবস্থায় পাটের বিনাশ হয় নাই, যদি পাটের বিনাশ হইত, তাহা হইলে কদাচ কাগজ উৎপন্ন হইতে পারিত না। তবে রূপান্তর হইয়াছে মাত্র, তেমনি প্রকৃতির অবস্থান্তর হইয়া-পরিণাম হইয়া নিখিল পদার্থ সৃষ্ট হয়, কিন্তু কুত্রাপি প্রকৃতির বিকৃতি ভিন্ন বিনাশ হয় না। তাই আচার্য্য বলিয়াছেন, "তত্র প্রকৃতিত্বং সাক্ষাৎ পরম্পরয়া অখিলবিকারোপাদানত্বং" যাহা সাক্ষাৎ এবং পরম্পরায় নিখিল পদার্থের কারণ, তাহাই প্রকৃতি, সুতরাং এখন বুঝিতে পারিলাম যে, সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় সর্ব্বত্রই প্রকৃতির অস্তিত্ব

আছে, কখনই প্রকৃতির বিনাশ হয় না। তন্মধ্যে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকে মুখ্য প্রকৃতি বা সাক্ষাৎ প্রকৃতি বলিয়া ব্যবহার হয়, আর বুদ্ধ্যাদি বিকার পদার্থেতে পরম্পরায় প্রকৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আমরা যে পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করিয়া আসিলাম, ইহার দ্বারা একটী ভ্রান্তিমূলক বিশ্বাসও খণ্ডিত হইল। তাহা এই,—অনেকেই বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, সাংখ্য মতে আর বেদান্ত মতে এক প্রকৃতি নয়, অর্থাৎ বেদান্তিরা প্রকৃতির যে লক্ষণ করেন, সাংখ্যাচার্য্যেরা তাহার বিরুদ্ধরূপ প্রকৃতির ব্যাখ্যা করেন। বস্তুতঃ ইহা নিতান্ত অলীক বিশ্বাস। আমরা পূর্ব্বে যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এতাবৎ ব্যাখ্যা করিয়া আসিলাম, উহা বেদান্ত গ্রন্থ পঞ্চদশীর শ্লোক, সুতরাং উহাতে সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থাকেই প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, ইহা আমরা এ পর্য্যন্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়াছি, এখন সাংখ্যমত সংক্ষেপে বুঝিতে পারিলেই উভয়ের সামঞ্জস্য জানিতে পারিব। সাংখ্যাচার্য্য ভগবান্ কপিলদেব বলিয়াছেন, "সত্ত্বরজস্তমসাংসাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্ম্মহান্" ইত্যাদি। সত্ব রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি বলে + × ×। এখন আমরা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলাম সাংখ্যের প্রকৃতি আর বেদান্ত মতের প্রকৃতিতে কোনই পার্থক্য নাই, উভয় মতে একই লক্ষণ, একই অর্থ, সুতরাং কোন বিরোধ হইতে পারে না। এই সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় আমরা তৃতীয় প্রস্তাবে বিবৃত করিব। ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রসন্নকুমার শর্ম্মণঃ—
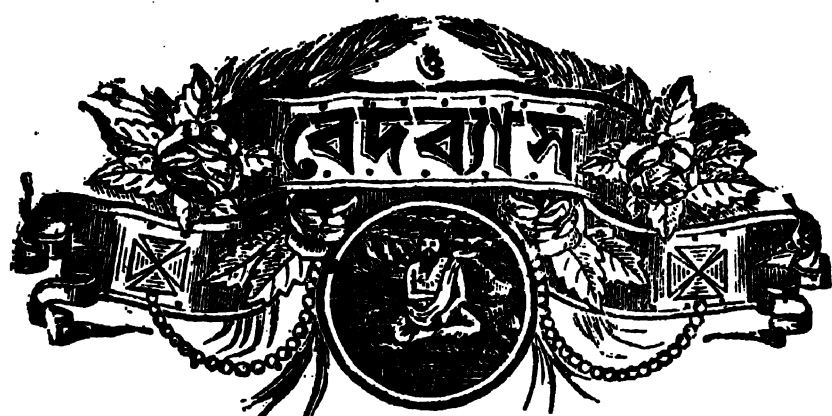
ষষ্ঠ বর্ষ ।

ষষ্ঠ ভাগ । কার্ত্তিক সন ১২৯৮ সাল । সপ্তম খণ্ড ।

দেবি ! প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতের্নিত্যং যথাসুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ ।
পাপানি সর্ব্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্ ॥

শাসন ও সংযম ।
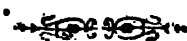
স্বাধীনতা বড়ই মুখরোচক। এই ছয় শতবৎসর স্বাধীনতার আস্বাদ বাঙ্গালী ভুলিয়াছে, তবুও সে কথা শুনিলে সমাজ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্রতার অন্বেষণে ধাবিত হইতে হয়, স্বাধীনতার লক্ষণ মনে নাই, তাই স্বাধীনতা ভ্রমে স্বেচ্ছাচারিতাকে আলিঙ্গন করিতে যাই। কিন্তু সমাজে থাকিতে হইলে, দশজনের মধ্যে একজন হইতে হইলে পরাধীন হইতে হইবে, শাসন ও সংযমের কঠিন গ্রন্থিতে অষ্টাঙ্গ বদ্ধ থাকিবে, আচার ও ব্যবহার, রীতি ও নীতির দাস হইয়া চলিতে হইবে। সমাজ, ধর্ম্ম দুই অঙ্গে বিভক্ত, এক শাসন, দ্বিতীয় সংযম, শাসন ও সংযমের বাহিরে যাইতে

চাহিলে সমাজ ত্যাগ করিতে হইবে, শ্মশানবাসী সন্ন্যাসী হইতে হইবে, যে দেশে মানুষের বাস, সে দেশ দূরে রাখিয়া চলিতে হইবে। তোমার আমার সমাজ না হইলে চলে না, একান্ত নির্জ্জন প্রদেশে তুমি, আমি থাকিতে পারি না, কাযেই আমাদের সামাজিক বিষয়ের আলোচনা করা আবশ্যক, তাহাতে আবার মন ভুলান বৈদেষিক সাম্যবাদের কথা দেশে প্রচারিত হইয়া আমাদিগকে ব্যবহার ভ্রষ্ট করিতেছে।

বলিয়াছি শাসন এবং সংযম সমাজে দুইটী পক্ষ, এই দুইটি সম শক্তি সম্পন্ন থাকিলে সমাজ ধীরে ধীরে উন্নতির পথে ধাবিত হয়, সমাজে সুখ ও সন্তোষ বিরাজ করে। শাসন বালক শিক্ষার জন্য, সংযম বুদ্ধিমান্ ও বিজ্ঞকে সুস্থ রাখিবার জন্য। যখন ভাল মন্দ বুঝি না, যখন সুবিধা, অসুবিধা দেখিতে পাই না, যখন যাহা আশু আনন্দ দায়ক, তাহা লইয়া মত্ত হই, তখন শাসন আমাকে সংযত রাখে। শাসনের প্রধান অনুপান ভীতি। তুমি আমি কেহই ভয় শূন্য নহি। তুমি পণ্ডিত মহাশয়ের বেত্রাঘাতে ভীত ও চঞ্চল হও, আমি পিতার তাড়না ও পরুষ বাক্যে ভীত ও ব্যথিত হই, অন্য কেহ বা অপমানের ভয়ে গলিয়া যায়, তোমাকে আমাকে সমাজের বাঁধা খাদে ফেলিয়া সমাজের-দৃঢ় সংস্কার রজ্জুতে আবদ্ধ করিতে হইলে শাসনের প্রচণ্ড প্রকাশ আবশ্যক। খেজুরের ছড়ির সপ্ সপানির সহিত, পিতার দৈনিক তাড়নার সহিত মাতার খেলনা ক্রয় করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাঁহাদের মনোমত এক প্রকার জাব তৈয়ার হইয়া উঠি। বর্ণ পরিচয় হয়, পুস্তকাদি পাঠ করিতে শিখি, লোক লজ্জা, লোক ভয় রূপে এক নূতন ভীতির উৎপত্তি হয় এবং আমার সমাজের ও দেশের পাপ পুণ্যের উচিত অনুচিতের চুল চেরা পার্থক্যের ভাব মনে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের সংস্কার অঙ্গে জড়াইয়া আচ্ছাদিত চক্ষু যেন পক্ষির ন্যায় সমাজের ইঙ্গিতানুযায়ী একদিকে গিয়া আপতিত হই। শাসন এইটুকু করে, সংযম আমাদিগকে আমাদের সমাজের শাসন শিক্ষিত ভাল মন্দের মাপ কাটিতে আমাদিগকে সকল বিষয় বুঝিয়া মাপিয়া লইতে বলে। যতদিন শাসনের দ্বারা সংস্কার বদ্ধ না হয়, যতদিন শাসনের প্রভাবে স্বতঃ সিদ্ধির

ন্যায় গুটি কতক বিষয় মনে দৃঢ় অঙ্কিত না হয়, তত দিন সংযমের প্রয়োজন নাই। সমাজের অষ্টে পৃষ্ঠে বন্ধনের মধ্যেও একটু স্বাধীনতা আছে, তুমি আমি সামাজিক জীব যখন শিক্ষাদ্বারা, শাসন ও দণ্ডের দ্বারা এই স্বাধীনতা খণ্ডের অধিকারী হইব, তখন আমাদিগকে এই সংযমের ব্যবহার করিতে হইবে। যাহা আমি ইচ্ছা করিলে করিতে পারি, কিন্তু কার্য্যের প্রকাশে হয়ত আমাকে লোক লজ্জা ভয়রূপী শাসনের প্রচণ্ড প্রহারে ব্যথিত হইতে হইবে, এবং যে ব্যাপার আমার হৃদয়ের গুপ্ত ভাণ্ডারে লুক্কায়িত থাকিলেও থাকিতে পারে, তাহার সেই কার্য্য সম্পাদনে আমাকে সংযম প্রয়োগ করিতে হইবে। নচেৎ পরোক্ষ ভাবে আমি সমাজ শাসন যোগ্য হইব।

শাসন দুই প্রকারের শারীরিক এবং মানসিক। মানসিক শাসন আবার দুই ভাগে বিভক্ত, প্রথম লৌকিক, অপর পারলৌকিক। শারীরিক শাসনের কথা অধিক কি বলিব, উহা গৃহে চড়-চাপড় রূপে, পাঠশালায় বেত্ররূপে, বিচারালয়ে পিনাল কোডের ধারা রূপে বিরাজমান। মানসিক লৌকিক শাসন, লোক লজ্জা অপমান ক্ষতিবোধকেই বলা যায়। মানসিক পারলৌকিক শাসন অন্য কিছু নহে, উহা কেবল নরক ভোগ ভয়, এবং ভগবানের অসন্তুষ্টি জন্য দুঃখভোগ ভয়। শারীর শাসনের জন্য দণ্ডবিধি, মানসিক শাসনের জন্য ব্যবহার নীতি ও ধর্ম্ম প্রথা প্রণীত হইয়াছে। শারীর শাসনের কর্ত্তা রাজা, কারণ তিনি দণ্ডধারী, মানসিক লৌকিক শাসনের কর্ত্তা সমাজ এবং মানসিক পারলৌকিক শাসনের কর্ত্তা স্বয়ং ভগবান্। তবে অনেক স্থানে শারীর শাসন এবং মানসিক শাসন একই আধারে প্রবাহিত হয়। চুরি করিলে রাজশাসনানুযায়ী দণ্ড কারাবরোধ এবং সমাজ শাসনানুযায়ী দণ্ড। অপমান ও সমাজ কর্ত্তৃক পরিবর্জ্জন। অপিচ মৃত্যুর পরে ভগবানের ব্যবস্থানুযায়ী নরক ভোগ করিতে হয়। যে সমাজের প্রত্যেক ব্যবস্থা এই তিন শাসনের দ্বারা পরিপুষ্ট এবং দৃঢ়ীকৃত, সেই সমাজ বহুকাল স্থায়ী।

সংযম ও দুই প্রকারের শারীর ও মানসিক। শরীর সংযমের দ্বারা লোকে সমাজ বিরুদ্ধ ও ব্যবহার বিরুদ্ধ কার্য্য হইতে বিরত থাকে।

মানসিক সংযমের দ্বারা কু-চিন্তা এবং কু-বাসনা হইতে মনকে পবিত্র ও বিমল রাখা যায়। গোপনে যবনিকার অন্তরালে, গৃহাভ্যন্তরে পাপ কার্য্য, যাহা হয়ত আইন বিরুদ্ধ নহে, এবং আইনের চক্ষে দণ্ডনীয় নহে, করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহার প্রকাশে লোক নিন্দার ভয় আছে এবং অপ্রকাশে ভগবানের দুয়ারে দায়গ্রস্থ হইতে হইবে, সুতরাং সে কার্য্যে বিরত থাকিলাম, ইহাই শারীর সংযম। মানসিক সংযম উচ্চাঙ্গেরও উচ্চাধিকারীর জন্য। সমাজ সমক্ষে ও রাজদ্বারে ইহার উল্লঙ্ঘনের জন্য কেহ দায়ী নহে। তুমি আমি মনে মনে শত শত অপরাধ করিতে পারি, দণ্ড দেয় কে, প্রমাণ কোথায়? পরন্তু সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বচক্ষু, সর্ব্ব দীপ্তিমান, সর্ব্বাধার ভগবানের কাছেত লুকাচুরি খেলা নাই, মন রাজ্যের তিনি রাজা, ইহার শাসন দণ্ড ভার তাঁহার হস্তে। এবং ধর্ম্মের সূক্ষ্ম ব্যবস্থানুযায়ী ইহার শাসন প্রথাও নির্ণিত হইয়াছে।

পরন্তু শাসন ও সংযম সংশ্লিষ্ট ভাবেই থাকে, শাসন শূন্য সংযম নাই, এবং একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, শাসনের ফলই সংযম। শাসনের ভয় না থাকিলে কে কবে প্রবৃত্তিকে সংযত করিত? কারাগারের ভয়, নরক ভোগের ভয়, লোক লজ্জা ভয় না থাকিলে সংসারে সংযমী ধার্ম্মিক লোক পাওয়া যাইত না। সেই শৈশব-উষা হইতে এই যৌবন-মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত অল্পে অল্পে ভয়ে লোভে, অহঙ্কারে কত নূতন কথা শিখিয়াছি, কত ভাল মন্দ বিষয় জানিতে পারিয়াছি, এইটি কু, ও এইটা সু, ইহা পাপ উহা পুণ্য, আদি কত বিষয় বুঝিয়াছি, কাহাকেও বা ঘৃণা করিতে, কাহাকেও বা আদর করিতে আরম্ভ করিয়াছি, সংস্কার বদ্ধ হইয়া সদসত্তের বাছাই করিতে পারি, তাই না আমার সমাজের চক্ষে আমি সংযমী ও ধার্ম্মিক হইয়াছি। কাজেই বলিতে হয় সংযম শাসনের ফল। স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত সংযমী কেহই নহে। সকলেরই ইচ্ছা সমাজ শিক্ষাদ্বারা পরিচালিত এবং সম্যক্ শাসিত। পক্ষান্তরে কেবল ভয়ের সাহায্যে শাসন প্রণালী প্রচারিত হইলে কু ফলও ফলিতে পারে। শুদ্ধ ভয় দেখাইয়া সংসারে কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। তাই ভয়ের সঙ্গে, সঙ্গে লোভ, মোহ, উচ্চাশা

মুখলিপ্সাই জড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। সমাজ বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে নিন্দা ভয়, দণ্ডভয়, নরক ভয়, আছে। অপরঞ্চ সমাজানুকূল কার্য্য করিলে লোকে যশ, রাজদ্বারে সম্মান এবং স্বর্গ সুখ সঞ্চিত থাকে। ভয়দ্বারা লোককে যেমন কু কার্য্য হইতে দূরে রাখে, তেমনি আশা সুখেচ্ছাদ্বারা তাহাদিগকে সৎকার্য্যে মতি দেয়। এবং সমাজ অনুকূল সাধু কার্য্যে রতি থাকিলেই কাযে কাযেই কু বৃত্তি ও কু বাসনা অন্তর্দ্ধৃত হইবে। সুতরাং শাসনের উদ্দেশ্য ভয় ও লোভদ্বারা সাধিত হয়। ভয় শূন্য শাসন অসম্ভব, কিন্তু ভয়ের পার্শ্বে গুপ্ত ভাবে লোভের ভুলান মোহিনী মূর্ত্তিও ফুটিয়া উঠে। মানুষ ভয়ে শঙ্কিত হইয়া এবং লোভে উত্তেজিত হইয়া সমাজানুকূল সাধু কার্য্যে রত হয়।

কেহই কখনও ভাবিয়া বুঝিয়া কাগজে কলমে বিধি নিষেধ লিখিয়া বাঁধিয়া হঠাৎ একটা সমাজ নির্ম্মাণ করে নাই। সমাজের স্থিতি অনাদি, অন্ততঃ আমরা কোন সমাজেরই উৎপত্তির কথা ইতিহাসের কোন স্থানেই পাই নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিত মেন, বেন্থাম মণ্টেস্কু আদি কেহই সমাজের জন্মকথা বলিতে পারেন নাই। মনুষ্য সামাজিক জীব ঐতিহাসিক সময়ের মধ্যে যখনই মনুষ্যের পুরাবৃত্তের আলোচনা করা গিয়াছে, সভ্য, বর্ব্বর, রাক্ষস, পৈশাচ যে কোন অবস্থায় তাহাকে পাওয়া গিয়াছে, সে তখনই সেই অবস্থাতেই তাহাদিগকে সমাজ শাসনদ্বারা পরিচালিত হইতে দেখা গিয়াছে। সুতরাং বলিতে হইবে সমাজ কোন মনুষ্য বিশেষের স্বকপোল কল্পিত চিন্তা প্রসূত নহে। উপযোগিতা, উপকারিতা অতএব দেশকাল পাত্রানুযায়ী আচার ব্যবহার সমাজে প্রচলিত হইয়া থাকে, এবং তাহাদের পরিবর্ত্তনও হইয়া থাকে। তবে বিধিবদ্ধ ও প্রচলিত আচার পদ্ধতি বড় সহজে পরিবর্ত্তিত হয় না। এবং শীঘ্র ও সহজ পরিবর্ত্তনে সমাজের ক্ষতি ও বিশৃঙ্খলার খুব সম্ভাবনা। যাঁহারা সামাজিক, সমাজের ভাব উন্নতি, অবনতির জন্য যাঁহারা চিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহারা স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত, আশুসুখদ, হয়ত পরিণাম বিরস, কোন ব্যবহারের প্রচলন হঠাৎ করিতে দেন না। স্থিতি শীলতা সমাজের দীর্ঘজীবনের লক্ষণ, তীব্র উন্নতি শীলতা সমাজের আত্ম-বিধ্বংসের ভীষণ ইঙ্গিত।

অধিক লোকের মধ্যে অনেক প্রদেশে যে সমাজ-পদ্ধতি বিস্তারিত, তাহা এক প্রকার অমর—বহুযুগস্থায়ী। সুতরাং সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, যাহার শাসন প্রভাবে তাহারা সমাজ বন্ধন খুব দৃঢ় করিতে চেষ্টা করেন। বলিয়াছি শাসনের অঙ্গ ভয় ও লোভ। যে ভয় চিরজীবন স্থায়ী, যাহার তামসচ্ছায়া পরলোককেও অন্ধকারাবৃত করে, যাহার তর্জ্জনী তাড়নে জীবন প্রতিক্ষণ কম্পিত ও বিচলিত হয়, এবং যে লোভ আশৈশব জরা পর্য্যন্ত মন ভুলাইয়া থাকে, যাহার মোহন মাধুরীতে নরকের ভীষণতা ও অপসৃত হয়, যাহার উত্তেজনায় ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজিত হইয়া উঠি, সেই ভয় এবং সেই লোভই শাসনের প্রকৃত উপযোগী। এবং এবম্বিধ শাসনের দ্বারা সমাজবিধি চিরদিন স্থায়ী হইয়া থাকে। ইহাই ধর্ম্মশাসন, যমরাজার ইহাই প্রচণ্ড দণ্ড। যে সমাজে ধর্ম্মশাসন ক্ষীণবল এবং অবহেলার বিষয়, সে সমাজ বহুদিন আর এসংস্কারে তিষ্ঠিতে পারিবেন না। কেননা উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল মনুষ্য প্রবৃত্তিকে সংযত ও সংবদ্ধ রাখিতে হইলে এমন কোন শাসন চাই, যাহা চিরদিন স্থায়ী। রাজার শাসন দুই-বৎসর কিম্বা দশবৎসর কারাবরোধ, লোকনিন্দা দুইদিন দশদিন থাকে, তাহার পর সকলিই অতীতের গর্ত্তে পতিত হয়। কিন্তু ধর্ম্মশাসনে ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান মিশিয়া গিয়াছে, আশা-আকাঙ্ক্ষা এক হইয়া হতাশার সহগামী হইয়াছে, সহায় নাই, সম্বল নাই, পৃষ্ঠপোষক পরামর্শ দাতা কেহ নাই। কাহার মুখের দিকে তাকাইয়া তোমার নিজকৃত পাপের, অসহ্য যন্ত্রণা বিস্মৃত হইবে? কাহাকেই বা মনের ব্যথা জানাইয়া দুঃখের লাঘব করিবে। ধর্ম্মরাজ্যে তুমি একলা, তোমার সহানুভাবক কেহই নাই। আছেন কেবল অগতির গতি ভগবান্। তিনিও কিন্তু ভক্তির অধিন, পবিত্রতার পক্ষপাতী, তিনি আর্ত্তের বন্ধু নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। তোমার আমার অহঙ্কার যতদিন থাকিবে, ততদিন ভগবৎকৃপাপ্রার্থী হইলেও তাঁহার করুণা যোগ্য হইব না। সুতরাং বলিতে হইবে ধর্ম্মের শাসন বড়ই ভীষণ, বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। ধর্ম্ম ভয়ের ন্যায় ভয় নাই, ধর্ম্মের তাড়নার ন্যায় তাড়না জগতে পাওয়া যাইবে না। পরন্তু ও শাসন কার্য্যকরী করিতে হইলে ইহার শিক্ষা আবশ্যক। কেননা সংস্কার

খেয়ালের উপরই জগৎ পরিচালিত। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন খেয়ালের ব্যবস্থা আছে। সেই ব্যবস্থানুযায়ী শিক্ষিত হইলে সংস্কার, খেয়াল, বুদ্ধি তদনুরূপ গঠিত হয়। ধার্ম্মিকের খেয়াল এক প্রকারের, দেশহিতৈষীর অন্য প্রকারের, আবার নাস্তিক বিলাসপ্রিয় চার্ব্বাকগণের সংস্কার স্বতন্ত্র। শিক্ষা এবং আলোচনার দ্বারা এই সকল সংস্কারের উৎপত্তি। অতএব ধর্ম্ম শাসনের উপযোগীতা বুঝিয়া উহাকে প্রবল রাখিতে হইলে, ধর্ম্মশিক্ষা প্রচারিত করা আবশ্যক।

সকলেই জানেন যে, আমাদের আধুনিক বঙ্গ সমাজ বড়ই বিশৃঙ্খলাপূর্ণ হইয়াছে। সকলেই বুঝেন যে, সমাজের শীঘ্র কোন সংস্কার না করিলে সমাজ ধ্বংস মুখে পতিত হইবে, তাই বাঙ্গালার শতকরা নব্বই জনে সংস্কারক সাজিয়াছে, হিন্দু সমাজ সংস্কার হইতেছে, উন্নত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার হইয়াছে, থিওসফী জাগিয়াছে, পজিটিভিষ্ট ভিতরে ভিতরে ঘুরিতেছে, নব্য হিন্দু দল সংগঠিত হইয়াছে এবং শুনিলাম খৃষ্টান জাঁদ্রেল বুথ ও ভারত উদ্ধার মানসে আসিতেছে। গোটা ভারতটা উদ্ধার করিবার জন্য সকলেরই চেষ্টা, সকলেরই বাসনা এবং তজ্জন্য উদ্যোগেরও অভাব নাই। কিন্তু ফলে কিছু হইতেছে না, কেন হইতেছে না, ইহাই প্রথমে বুঝা আবশ্যক। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর বিষয় একটু আলোচনা করিলে অনেক কথা পরিষ্কার হইবে। বাঙ্গালী পঞ্চম বর্ষের বালক হইতে, ভরা যৌবন পঞ্চ বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত ইংরাজি শিখিবার জন্য স্কুল কলেজে পাঠ করিয়া থাকেন। এই বিংশতি বর্ষের শিক্ষায় হৃদয়ে যে সকল সংস্কার দৃঢ়বদ্ধ হইয়া যায়, বুদ্ধি যে ভাব ধারণ করে, তাহার পরিবর্ত্তন অসম্ভব। প্রৌঢ়ে যতই ধার্ম্মিক, আচারী, ভক্তিমান্ হউক না কেন, শৈশব ও যৌবন শিক্ষা সংস্কার কিছুতেই বিমোচিত হইবে না। বাঙ্গালী স্কুলে ইংরাজি শিখিয়া থাকেন, যথেচ্ছাচার অভ্যাস করেন, কলেজে যাইয়া ইংরাজী বিজ্ঞান দর্শন পড়েন, মিল, স্পেন্সার, বেনের ফিলজাফি মন্থন করেন, টিণ্ডাল হকসলির মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েন, ঈশ্বরকে অনাবশ্যক বোধে ত্যাগ করেন, উপযোগীতা লইয়া জীবন প্রবাহ সংপ্রণালীত করিবার চেষ্টা করেন। যাহাতে হৃদয় মাধুর্য্যের

নির্ম্মল প্রবাহ ছুটিয়া যায়, যাহাতে চরিত্রের দৃঢ়তা ও সহিষ্ণুতা হয়, যাহাদ্বারা স্বার্থ ত্যাগের অঙ্কুর হৃদয়ে উপ্ত হয়, যাহা পাইলে লোকে মহাবীর জিতেন্দ্রিয় হয়, বাঙ্গালী ইংরাজ রাজের আশীর্ব্বাদে তাহা ত্যাগ করিয়া, সেই অমূল্য নিধি স্বর্ণমণি দূরে রাখিয়া, ভগবত্‌প্রভাব শূন্য, ধর্ম্মশূন্য, ভক্তিশূন্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া এক অপূর্ব্ব জীব হইয়া উঠে। এই শিক্ষায় লোককে অব্যবস্থিতচিত্ত, ব্যসনাশক্ত, বিলাসী স্বার্থান্ধ, অহঙ্কারী করে। বাঙ্গালী শিক্ষিতগণত বিষ খাইয়া অমৃত পানের ফল খাইবেন না, যেমন শিখাইয়াছে, তেমনি হইয়াছেন। কেবল এইটুকু হইলেও উপায় থাকিত, ইহার উপর পাশ্চাত্য সাম্যবাদ, স্বাধীনতা বাদ বিকৃতাঙ্গ হইয়া দেশে প্রচারিত হইয়াছে। সমাজ ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে সংযম শূন্য হইয়াছে এবং সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রীর আশীর্ব্বাদে শাসন শূন্য হইয়াছে। বুদ্ধিমান্, বিবেচক হইয়াও লোকে বিলাসী, সংযম শূন্য, দেখিয়া শুনিয়া পরিণাম জানিয়াও সকলেই শাসন শূন্য উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল উদ্‌ভ্রান্ত, উন্মত্ত। যে দুটি না থাকিলে সমাজ থাকে না, যাহা না হইলে মনুষ্য সমাজ পশুর সমাজে পরিণত হয়, আমাদের সেই দুইটি নাই। এই ত সে দিন এত ধূম ধাম করিয়া ব্রাহ্ম সমাজ প্রচারিত হইল, শাসন ও সংযম অভাবে তাহা সার্দ্ধ তিন খণ্ডে বিভক্ত এবং ইহারও মধ্যে জনে জনে ভিন্ন ভিন্ন বিরুদ্ধ মতবাদী। কিন্তু নদীর এত তেজ যে পথে পথে প্রলম্ব কেশ, দীর্ঘ নখ, গৈরিক বসন নব্য যুবক দলকে দেখিতে পাওয়া যাইত, এখন তাহাও কম পড়িয়াছে। যে শিক্ষায় হৃদয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার প্রভাব না থাকে, যাহাতে সহিষ্ণুতা, তেজস্বিতা অপহৃত করে, যাহাদ্বারা লোককে বিলাসী, সৌখীন, খোস খেয়ালী করে, সেই অপূর্ব্ব শিখিয়া শিক্ষিতগণ কি কখনও এক নিষ্ঠাযুক্ত হইতে পারেন, যাহাতে গোড়া খারাপ হইয়াছে, শিশুহৃদয় মলীন ও বিষাক্ত হইয়াছে, তাহার দোষ কি সহজে প্রক্ষালিত হয়?

শিক্ষার উপর শাসন ও সংযম নির্ভর করে, আবার শাসন শূন্য শিক্ষা হয় না। আমাদের বর্ত্তমান শাসন শূন্য শিক্ষার কি ফল ফলিতেছে, তাহা বলিলাম। অনিষ্ট সংবরণ জন্য কি উপায় হইতেছে, তাহার

বিচার করা আবশ্যক। কারণ ব্যালের বিষ ছাড়াইবার উপায় কি ?—সভা সমিতি। যেখানে সাজিয়া গুছাইয়া গিয়া, হেলিয়া দুলিয়া বক্তৃতা দিতে হইবে, বড় বড় প্রবন্ধ পাঠ করিতে হইবে, মুখের আলাপ করিয়া আপ্যায়িত করিয়া বাটী ফিরিয়া আসিতে হইবে, সেইসব সভা সমিতি। আজ কাল সভা শূন্য পল্লী নাই, সভা শূন্য গ্রাম নাই। যদি সভাদ্বারা ভারত উদ্ধার হইত, তাহা হইলে এতদিনে ভারতমাতার অগ্নি পরীক্ষা সমাপ্ত হইয়া তিনি অযোধ্যার পাঠ রাণী হইয়া বসিতেন। ছোট খাট সভার কথা বলিব, রাজ উৎসাহে প্রবর্দ্ধিত শিক্ষিতগণ পরিপূরিত, হিন্দু খৃষ্টান ব্রাহ্ম ত্রিধারায় অভিসিঞ্চিত, কাব্য-নীতি-শক্তি ত্রয়ী বিমণ্ডিত, সুরুচির চিক্কণ কিরণে সম্যক্ উদ্ভাসিত, পাশ্চাত্য প্রভাব পরিপুষ্ট, বাল-বোধার্থ এক যে নূতন সভা প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে, যাহার উপর অনেক আশা, ভরসা ন্যস্ত আছে, তাহারই বিষয় একটু আলোচনা নিতান্ত আবশ্যক। সভা স্কুল কলেজ সংশ্লিষ্ট, সুতরাং ধর্ম্ম শিক্ষা শূন্য, নৈতিক শিক্ষক পাশ্চাত্য ব্যবহার পক্ষপাতী সুশিক্ষিত ব্রাহ্ম ভ্রাতা, সুতরাং হিন্দু নীতি কতদূর কে শিখিবে, তাহা জানিতে বাকি রহিল না, সাহিত্য কাব্য শিক্ষক স্বদেশীয়তা মাখান স্বধর্ম্মনিষ্ঠ. বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্য সমাজের নেতা ও অধীশ্বর, সুতরাং তাঁহার শিক্ষায় ও তাঁহার ইঙ্গিতে লোকে কোন দিকে দৌড়িবে, তাহারও ইয়ত্তা রহিল না ; ব্যায়াম শিক্ষক ইংরাজ তিনি শরীর রক্ষার জন্য, শরীর পুষ্টির, বল, সহিষ্ণুতা বৃদ্ধির জন্য যাহা করিতে, যাহা খাইতে উপদেশ দিবেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন ; কাজেই বলিতে হয় সভার ব্রাহস্পর্শে গণ্ডে জন্ম হইয়াছে। নীতির শিক্ষার জন্য শাসন দণ্ডের ব্যবহার নাই। স্বাধীনচেতা, উন্নত শিক্ষিত যুবকগণের সভা, আচার্য্যকে খোসামুদীর ভাবে নৈতিক গাথা গাঠ করিতে হয়, মনোহর, সুমধুর, সুশ্রাব্য কথায় বুঝাইতে হয়, বাবু বাছা বলিয়া আদর করিতে হয়, সুতরাং বলিতে হইবে সভ্যগণ সাধনা শূন্য। যে নীতি শিখাও যে ব্যবহার বুঝাও, তাহার সাধনা না করিলে স্বভাব যুক্ত হয় না। স্বভাব যুক্ত ব্যবহার যোগ্য না হইলে উহা সূত্রাকারে কেবল স্মৃতিস্থ থাকে মাত্র, কার্য্যকালে সাহায্য করে না। যাহাতে অনু

শাসন বাক্য নাই, হুকুম নাই, তাড়না নাই, প্রহার নাই, তাহাতে সাধনা নাই, তপস্যা নাই সুতরাং সকলেই সংযম শূন্য। নীতি শিখাইতে হইলে, ব্যবহার শুদ্ধ করিতে হইলে ভিতর ও বাহির রাখিলে চলিবে না, এবং রাখিলে হইবে না। গুরু অন্তরের অন্তর দেখিয়া হৃদয়ের গুপ্ত দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া সকল আবর্জনা রাশি দূর করিবেন। তাঁহার শিক্ষায়, তাঁহার প্রভাবে, তাঁহার শাসনে বুদ্ধি নির্ম্মল হইবে, স্বভাব বিমল হইবে। আমরা যতদূর জানি তাহাতে আচার্য্যের এ ক্ষমতা টুকু নাই। তাঁহার সহিত তাঁহার শিষ্যগণ সমপদস্থ, এটিকেট বজায় রাখিয়া কথা বলিতে হয়। তবে গোটাকতক কড়া কড়া আইন কানুন খাড়া করা হইয়াছে। সে গুলি দেখিতে শুনিতে মন্দ না হইলেও ব্যবহার যোগ্য নহে, এবং শাসন শক্তি শূন্য কাজেই পরিণামে ফল শূন্য। আমরা অনেক সভা সম্মিলনীর সভ্য ছিলাম, মাতৃ স্তন্য পরিত্যাগ করিয়াই সভার সম্পাদক, সভার উপাচার্য্য আদি কত কার্য্য করিয়াছি। ফলে বাক্‌পটুতা হইয়াছে আর ব্যবহারে ওস্তাদী প্রবেশ করিয়াছে, জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়াও আচার ভ্রষ্ট এবং দৃঢ়তা শূন্য। কারণ সভাদিতে উচ্চ কথা, উচ্চাদর্শ শুনিলেও সাধনা হীন হওয়াতে ব্রহ্মচর্য্য শূন্য থাকাতে সে সকল কথার কথাই দাঁড়াইয়াছে। আমরা সংযমী স্থির বুদ্ধি নহি, কাজেই কাহারও বশ্যতা স্বীকার করিয়া কোন কার্য্যে কিছু দিনের জন্য সংযত থাকিতে পারি না। যাহা নূতন, যাহা মুখরোচক আপাততঃ মনোহর তাহাই ভাল লাগে—কাজেই আমরা মহাহুজুগে। যতদিন স্বর্গীয় কেশবচন্দ্রের মন ভুলান কথা বাঙ্গলার গৃহে গৃহে প্রতিধ্বনিত হইত, ততদিন শিক্ষিতগণ সমক্ষে অথবা পরোক্ষে, প্রকাশে অথবা অপ্রকাশ্যে ব্রাহ্ম ছিলেন, সে শব্দ এখন অনন্ত সাগরের অনন্ত প্রতিধ্বনিতে মিশিয়া গিয়াছে, তাই বাঙ্গালী আর কেহ বড় ব্রাহ্ম হয় না, সে মোহ গিয়াছে, সে খেয়াল ছুটিয়াছে। এখন শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নের মোহিণ মন্ত্র সঞ্চালিত হইয়াছে, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির যুক্তি জাল বিস্তারিত হইয়াছে, আর সাড়ে পনের আনা বাঙ্গালী হিন্দু, গোঁড়া হিন্দু। কিন্তু কয়জন যুবক আচারী। এই যে শত শত

কিশোর কণ্ঠ হইতে হিন্দু ধর্ম্মের জয় গীতি সমুত্থিত হইতেছে, শত শত যুবক প্রৌঢ় নত শিরে হিন্দু ধর্ম্ম মন্দিরে বশ্যতা স্বীকার করিতেছেন, ইহার মধ্যে কয়জন আচারবান্, নিষ্ঠাবান্, এবং সাধনা যুক্ত। যাঁহারা সাধক, যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ, তাঁহারা তেজস্বী, তাঁহারা এক নিষ্ঠা যুক্ত। কিন্তু সে কয়জন? তাই বলিতে ছিলাম, সভা সমিতিদ্বারা কার্য্য হইবে না, কখনও কোথাও হয় নাই। মনুষ্য লইয়া সভা—সে মানুষ কৈ? মানুষ তৈয়ারী করিতে হইলে গৃহে, বাহিরে, অন্তরে, ব্যবহারে গুরুর শাসন আবশ্যক, তপস্যা কঠোর দুশ্চর হৃদয় বিদারী, তপস্যা আবশ্যক। যেমন ইংরাজী শিখিবার জন্য ঘরে পাঠশালায় শাসন আছে প্রলোভন আছে, তেমনি ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে হইলে গৃহে, সমাজে, রাজদ্বারে শাসন আবশ্যক, উৎসাহ আবশ্যক, উত্তেজনা আবশ্যক, প্রলোভন আবশ্যক।

এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মশূন্য নীতি শিক্ষা আমাদের চক্ষে ঠিক যেমন মাথা নাই তাহার মাথা ব্যথা বলিয়াই বোধ হয়। ধর্ম্ম নীতির ভিত্তি, পৃষ্ঠ-পোষক এবং উহার মূল। যে নীতি কার্য্যকরী, যে নীতি শত প্রলোভন প্রবঞ্চনায় আদর্শচ্যুত হইবে না, তাহা ধর্ম্মের আশা-বাক্যের উপর নির্ভর করিবে, তাহা ধর্ম্মের কঠোর সাধনাদ্বারা দৃঢ়ীকৃত হইবে। শুদ্ধ opinion লইয়া কার্য্য হয় না, যে ধারণা মস্তিষ্কের পরতে পরতে বিন্যস্ত, যে ধারণা শীরায় শীরায় গাঁথা, যাহা স্বভাবের সহিত ওতপ্রোত ভাবে বিমিশ্রিত, তাহাই কার্য্যকালে সহায়ক ও ফলপ্রসূ। ধর্ম্মের তীব্রতা না থাকিলে এই টুকু হয় না। নাস্তিক তুমি জান পরদারাভিমর্ষণ অন্যায়, সমাজ ব্যবহার বিরুদ্ধ, অথবা বলিব কি সমাজের Public বিরুদ্ধ—কিন্তু যদি কোন সুরসুন্দরী ষোড়শী উপযাচিকা হইয়া তোমার শরণাগত হয়, বল দেখি নব্য যুবক সে প্রলোভন হইতে ধর্ম্মের তীব্র প্রভাব ব্যতীত, সাধনার পাপহন্ত্রী বিদ্যুচ্ছটা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে রক্ষা পাওয়া যায় কি না? কেবল মস্তিষ্কের চালনায় কার্য্য হয় না; কেবল মেধাবী হইলে ধার্ম্মিক তেজস্বী হয় না। যখন শত শত বৎসরের আবর্জ্জনা রাশি দূরে ফেলিতে হইবে, যখন তোমার পবিত্রাদর্শে পাপী, বিপথ-গামীকে সন্ত্রাস্ত, ব্যস্ত, চকিত করিয়া সুপথে পরিচালিত করিতে হইবে,

তখন ধর্ম্ম বল চাই, তেজস্বীতা চাই, উন্মত্ততা গোঁড়ামি Savaticism আবশ্যক। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ না পাইলে, ভক্তিমান্ সাধক না হইলে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সর্ব্বত্যাগী—কষ্ট সহিষ্ণু না হইলে এখন সাত রাজার ধন অপূর্ব্ব স্পর্শমণি কখনই পাওয়া যায় না। মিল, বেন স্পেনসরাদি যে কর্ম্মশূন্য নীতি কথা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের এ অবস্থার উপযোগী নহে, তাহার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র, ব্যবহার স্বতন্ত্র। জগৎ মাতাইতে হইলে, ত্রিভুবন ঘুরাইতে হইলে চৈতন্যের অপূর্ব্ব ভক্তি শক্তি আবশ্যক। ভক্তের নয়ন জলে পাপ বিধৌত হইবে, ভক্তের অঙ্গের বাতাসে পাপ উড়িয়া যাইবে, ভক্তের মুখে ভক্ত বাঞ্ছাকল্পতরুর নামোচ্চারণের গভীর নিনাদের সহিত পাপ বধীর হইবে। যিনি জীবনের জীবন, যিনি সর্ব্বাধার, সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি পুণ্য শিক্ষার কখনও কি কোন কার্য্য হইয়াছে। যাঁহার ইঙ্গিতে সৃজন পালন প্রলয় হইতেছে, তাঁহার আশীর্ব্বাদ ব্যতীত, তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত কবে কোন দেশে কোন কার্য্য সাধিত হইয়াছে। তাঁহার কথা লোককে শুনাও, তাঁহার গুণগান দেশে দেশে করিয়া বেড়াও, তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে থাক, তাঁহার সেবায়, তাঁহার আলোচনায় দিবা নিশা অতিবাহিত কর, দেখিবে লোকে স্বার্থত্যাগী হইবে, কোমল মধুর ভাবাপন্ন হইবে, তেজস্বী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইবে। ভালবাসা না থাকিলে শাসন নিষ্ক্রিয়, সংযম নিষ্ফল। পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র আমার বড় ভালবাসার, তাই তাহাদের নিকট হইতে দূরে কারাগারে থাকিতে ভয় হয়, তাহারা কষ্ট পাইলে বুক ফাটিয়া যায়, তাহারা অপমানিত হইবে শুনিলে পাগল হইয়া উঠি। শাসন তাই ভালবাসার সাহায্যে ভয়ের বিভীষিকা খাড়া করিয়া লোককে সৎপথে রাখিয়াছে, তেমি ভগবানের ভক্ত হইলে, সেবক হইলে, তাঁহার দাসানুদাস, কৃপাপ্রার্থী হইলে গুরু যাহা তাঁহার ইচ্ছা বিরুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা কিছুতেই করিব না। তাঁহার প্রেমের খাতিরে লোকে অরণ্যচারী সন্ন্যাসী হয়, আবার তাহার ইঙ্গিতে তাঁহার আদেশে সর্ব্বহন্তা, সর্ব্বশাস্তা মহাবীর হয়। শুধু তাই কি সে নাম করিলে কি জানি আত্ম-জগতে কি এক বিপ্লব উপস্থিত হয়, কি আন্দোলন—আলোড়ন হইয়া কি এক

অপূর্ব্ব শক্তি উদ্ভূত হয়, যাহার দ্বারা নিমেষের মধ্যে অপূর্ব্ব কার্য্য সাধিত হয় তাঁহার প্রেমকে নির্ভর করিয়া ধর্ম্মের প্রচণ্ড শাসন দণ্ড সর্ব্বদা উদ্দণ্ড রহিয়াছে। তিনি আছেন বলিয়াই লোকে বাক্ মনে পবিত্র হইতে পারে। মূঢ় আমরা ভগবত্ প্রভাব শূণ্য শিক্ষায় দেশে দানবের বৃদ্ধি করিতেছি, পবিত্রতা তেজস্বীতা হারাইতেছি, স্বার্থান্দ, বিলাসপ্রিয় হইয়া নরকের কৃমী কীটে পরিণত হইতেছি। ধর্ম্মের শাসন শয়নে, স্বপনে ভিতরে, বাহিরে, শৈশবে, যৌবনে, প্রৌঢ়ে বার্দ্ধক্যে, জন্ম জন্মান্তরে কার্য্যকরী।

উহার প্রতাপে পিশাচ মানুষ হয়, মনুষ্য দেবতা হয়, উহাতে লুকাচুরি নাই, ফাঁকী নাই, মন বুঝান অসার যুক্তি নাই। সুতরাং যদি দেশের দায়িত্ব বোধ থাকে, দেশের কর্ম্ম কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বোধ থাকে, যদি ধর্ম্মজ্ঞান থাকে, সাধুতা সত্যনিষ্ঠা থাকে ত সাবধান—দেখিও নাস্তিক্য শিক্ষায় এই অধঃপতিত দেশকে নরকের পথে আরও ঠেলিয়া দিও না। যেমন আছে, তেমনি থাকুক, যাঁহার কর্ম্ম তিনি করিবেন। তুমি তোমার পৈশাচিক বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া বাহবা লইবার জন্য ভগবত্ কথা শূন্য নীতি শিক্ষায় দেশ ভুলাইও না। হিন্দু মূর্খ হউক, অন্ধ বিশ্বাস পূর্ণ হউক, অজ্ঞানান্ধ হউক, কদাচারী, কুব্যবহারী হউক, কিন্তু এখনও হিন্দুই আছে, এখনও ভগবানের দোহাই দিয়া কার্য্য করে, এখনও হিন্দু ভাবাপন্ন আছে। আবার শুভদিন হইলে, সুবাতাস বহিলে, হিন্দু মানুষের মত মানুষ হইতে পারিবে, হিন্দু হইয়া হিন্দুর নাম রক্ষা করিতে পারিবে। কিন্তু তোমার সম্মোহন মায়াবী মন্ত্রে আমরা আত্মহারা হইব, আমরা দেশের কথা দেশের প্রথা ভুলিব, দেশকে ঘৃণা করিব। ক্ষমা কর, এ শিক্ষা দিও না, এমন উন্নতির জন্য চেষ্টা করিও না।

শাস্ত্রব্যাখ্যা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এখন আর একটী জিজ্ঞাস্য এই,—"সত্ত্বং রজস্তমইতি প্রকৃতেরভবন্ গুণাঃ" অর্থ,—সত্ত, রজ ও তম এই গুণত্রয় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়। ইত্যাদি শাস্ত্রদ্বারা সত্ত্বাদি গুণত্রয়, প্রকৃতির কার্য্য ইহাই প্রতিপন্ন হয়, অর্থাৎ পূর্ব্ব ব্যাখ্যার দ্বারা গুণত্রয়কেই প্রকৃতি বলিয়া অবধারিত করা হইয়াছে। আর এখনকার বচনের দ্বারা প্রকৃতি হইতে গুণত্রয় উৎপন্ন, ইহা বুঝিতে পারিলাম, সুতরাং পরস্পর অতি গুরুতর বৈষম্য হইল। পিতা হইতে পুত্র উৎপন্ন হয়, এখানে পিতা আর পুত্র কখনই এক হইতে পারেন না। সর্ব্বত্রই কার্য্য ও কারণ ভিন্ন বস্তু বলিয়া জানা যায়। সুতরাং প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন গুণত্রয় কদাচ প্রকৃতি হইতে পারেনা। একথা অতীব অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়, অতএব ইহার রহস্য উদ্‌ঘাটন করা আবশ্যক।

আমরা পূর্ব্বে যে সত্ত্বাদি গুণত্রয়কে প্রকৃতি বলিয়াছি, তাহাই প্রকৃত রহস্য, সত্ত্বাদি গুণত্রয় প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন বা প্রকৃতি ধর্ম্ম নহে। ইহা সর্ব্ব শাস্ত্র প্রসিদ্ধ। তাই ভগবান্ কপিল দেব বলিয়াছেন, "সত্ত্বাদীনামতদ্ধর্ম্মত্বং তদ্রূপত্বাৎ।" সত্ত্বাদিগুণ প্রকৃতির ধর্ম্ম নহে, কেননা সত্ত্বঃ রজ, তমোগুণস্বরূপই প্রকৃতি, ইহা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার প্রকৃতির লক্ষণ কোন শাস্ত্রেই দৃষ্ট হয় না। স্মৃতিও বলিতেছেন,—সত্ত্বং রজস্তম ইতি এষৈব প্রকৃতিঃ সদা" সত্ত্বাদি গুণ ত্রয়ই প্রকৃতি। অতএব গুণত্রয়ই যে প্রকৃতি তদ্বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ হইতে পারেনা। তবে যে প্রকৃতি হইতে গুণত্রয়ের উৎপত্তি কথা আছে, তাহার রহস্য অন্য প্রকার বুঝিতে হইবে। "গুণক্ষোভে জায়মানে মহান্ প্রাদুর্ব্বভুব হ" গুণত্রয়ের পরস্পর ভবাভিভব চেষ্টার দ্বারা মহত্তত্ত্বাদি (বুদ্ধিতত্ত্ব) উৎপন্ন হয়, সুতরাং বুঝিতে পারা গেল গুণত্রয় হইতেই বুদ্ধিতত্ত্বাদির বিকাশ হইয়াছে। অতএব গুণত্রয়স্বরূপ প্রকৃতির যে যে সত্ত্বাদি অংশ হইতে বুদ্ধিতত্ত্বাদির বিস্ফুরণ হইয়াছে,

তাহা প্রকৃতি হইতেই সমুৎপন্ন, অর্থাৎ বিজাতীয় প্রকৃতি হইতে যে বিজাতীয় গুণত্রয় উৎপন্ন হইল, ইহা "প্রকৃতেরভবন্ গুণা' এই শ্লোকের অর্থ নহে, কিন্তু সমষ্টিগুণত্রয় স্বরূপ প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বাদি নির্ম্মাণের উপকরণীভূত সত্ত্বাদি গুণ বিকাশিত হইল, ইহাই সর্ব্ববাদি সম্মত, নতুবা গুণত্রয়ের নিত্যতা প্রতিপাদক শ্রুতি স্মৃতির অপলাপ করিতে হয়। শ্রুতি স্মৃতিতে সত্ত্বাদি গুণত্রয়কে নিত্য বলিয়াছেন, যদি প্রকৃতি হইতে গুণত্রয় উৎপন্ন হয়, তাঁহা হইলে গুণের নিত্যতা কখনই প্রতিপাদিত হইতে পারে না. সুতরাং শাস্ত্র আপনাদ্বারাই আপনি বাধিত হইতে পারে, আর একটী কথা এখানে বলা আবশ্যক। তাহা এই,—"সত্ত্বাদীনামতদ্ধর্ম্মত্বং তদ্রূপত্বাৎ" এই সাংখ্য সূত্রের দ্বারা সত্ত্বাদিগুণ যে প্রকৃতিগুণ বা ধর্ম্ম নহে, ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তবে "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রে যে সত্ত্বাদিকে প্রকৃতির গুণ বলা হইয়াছে, তাহা ব্যবহারিক কথা মাত্র, যেমন ব্যবহার জগতে "বনের বৃক্ষ" কথাটী ব্যবহৃত হইয়া থাকে, প্রকৃত পক্ষে বৃক্ষ সমষ্টিই বন, বৃক্ষ গুলি বাদ দিলে সতন্ত্রভাবে আর বনের সত্তা থাকে না, সুতরাং বনের বৃক্ষ, ইহা ব্যবহারিক বাক্য মাত্র, অথবা ব্যবহার জগতে "যেমন ভিত্তির গাত্র" কথাটী ব্যবহার হয়, বস্তুতঃ ভিত্তি আর তাহার গাত্র একই জিনিষ, তথাপি আধারাধেয় ভাব কল্পনা করিয়া ব্যবহার হয়, ভিত্তিকে আধার কল্পনা করিয়া গাত্রকে আধেয় কল্পনা করা হয়, তেমনি প্রকৃতির গুণ বলিতেও আধার আধেয় কল্পনা বুঝিতে হইবে, প্রকৃতিকে আধার, গুণকে আধেয় ভাবে ধরিতে হইবে, সম্পূর্ণ পক্ষে প্রকৃতি আর তাহার গুণ একই পদার্থ, ধর্ম্ম ধর্ম্মী ভাব নাই। অথবা এখানে প্রকৃতির গুণ বলিতে প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন মহতত্ত্বাদি (বুদ্ধি হইতে ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সমস্ত) বুঝাইয়াছে, সুতরাং কোন আপত্তিই আদৌ হইতে পারে না। এখানে প্রকৃতির গুণ বলিতে সত্ত্বাদি গুণ বুঝায় নাই। সুতরাং প্রকৃতি হইতে কখনই গুণত্রয় উৎপন্ন হয় নাই এবং গুণত্রয় প্রকৃতির ধর্ম্ম নহে, ইহাই সিদ্ধান্তিত হইল।

• এই প্রকৃতি চিদানন্দ স্বরূপ পরম ব্রহ্মেতে প্রতিবিম্বিত হইলেই, অর্থাৎ

স্ব প্রকাশ পরমাত্মার প্রকাশে প্রকাশিত হইলেই ব্যবহার জগৎ সৃষ্টি করিতে পারে, এবং জড়াত্মিকা প্রকৃতি নিজেও প্রকাশ পায়। ইহা বুঝাইবার নিমিত্তই চিদানন্দ ব্রহ্মেতে প্রতিবিম্বিত" এই বিশেষণ দিয়াছেন উহা প্রকৃতির লক্ষণের পরিচায়ক নহে, গুণত্রয় স্বরূপ প্রকৃতি, ইহাই প্রকৃতির স্বরূপ। ইহার অন্যথা ব্যাখ্যা করিলে পূর্ব্বোদাহৃত সাংখ্যাদি শাস্ত্রের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়।'

বেদান্ত শাস্ত্রে এবং সাংখ্যাদি শাস্ত্রে এই প্রকৃতি আর অনেকগুলি নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন প্রকৃতি বলিলে প্রকৃতিকে বুঝায়, তেমনি ব্রাহ্মী, বিদ্যা, অবিদ্যা, মায়া, পরা, শক্তি, অজা, প্রধান, অব্যক্ত, তম, গুণসাম্য প্রভৃতি শব্দগুলি ও প্রকৃতি অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং ইহার কোন কোনটী স্থান বিশেষে কিছু কিছু অর্থান্তরিত হইয়াও প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা। আমরাও ইতঃপর এই স্থানেই ব্যবহার করিব। কিন্তু অবিদ্যাদি শব্দ স্থানে স্থানে প্রকৃতির অবস্থা বিশেষে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, একেবারে প্রকৃত্যর্থ পরিত্যাগ করিয়া কুত্রাপি ব্যবহৃত হয় না। এখন আমরা প্রকৃতির স্বরূপ বুঝিতে পারিলাম। এই প্রকৃতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়, অর্থাৎ এক প্রকৃতিরই এক অবস্থায় মায়া এবং আর এক অবস্থায় অবিদ্যা নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতিকে মায়া এবং মলিনসত্ত্বা প্রকৃতিকে অবিদ্যা বলে। মায়াতে সর্ব্বদাই সত্ত্বগুণ প্রধান হইয়া অনন্তভাবে প্রকাশিত থাকে, সুতরাং রজঃ আর, তমোগুণ ক্ষীণাবস্থায় বিদ্যমান থাকে, তাই মায়া বিজ্ঞানরূপিনী, প্রকাশময়ী, তমোগুণ মায়াকে কখনই আবৃত করিয়া রাখিতে পারে না। অবিদ্যা ইহার বিপরীত, অবিদ্যাতে রজঃ ও তমোগুণ প্রবল, সুতরাং সত্ব এত ক্ষীণাবস্থাপন্ন যে, আপন সত্বায়ও প্রকাশিত হইতে পারে না।

আমরা সংক্ষেপে মায়া ও অবিদ্যার ব্যাখ্যা করিলাম। ইহার সহিত আমাদের পূর্ব্বেকার কথার কিছু বিরোধ হইল, কারণ পূর্ব্বে অবিদ্যাদিকে প্রকৃতির নামান্তর বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে, কিন্তু এখন মায়া ও অবিদ্যাকে প্রকৃতি হইতে কিছু বিসদৃশ অর্থে ব্যবহার করা

হইল। বস্তুতঃ এখানেও মায়া ও অবিদ্যাশব্দ একবারে প্রকৃতি অর্থ পরিত্যাগ করে নাই, কেবলমাত্র প্রকৃতির অবস্থা বিষেয়ে প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্ব বাক্যের সহিত পরের কথার কোনই বিরোধ নাই। এরূপ কিছু কিছু বিসদৃশ অর্থে অনেক স্থানেই মায়া ও অবিদ্যা শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে যে আমরা প্রকৃতির পর্য্যায় বলিয়াছি, উহার উদ্দেশ্য এই যে, প্রায়শই অবিদ্যাদিশব্দ প্রকৃতি অর্থে ব্যবহার হইবে।

পূর্ব্ব ব্যাখ্যাত মায়োপহিত পরিপূর্ণ চৈতন্য বা আত্মাকে (আত্মার বিবরণ পূর্ব্ব প্রস্তাবে বলা হইয়াছে) ঈশ্বর বলা যায়। মায়োপহিত চৈতন্য, প্রকৃত্যুপহিত চৈতন্য এবং প্রকৃতপুরুষাত্মক এই কথা তিনটীর একই অর্থ, সুতরাং মায়োপহিত চৈতন্য ঈশ্বর, প্রকৃত্যুপহিত চৈতন্য ঈশ্বর, প্রকৃতি পুরুষাত্মক ঈশ্বর। এ তিনটীরও একই অর্থ। মায়োপহিত বা প্রকৃতি-পুরুষাত্মক কথাটির দ্বারা ঈশ্বরের লক্ষণটি আমরা পরিস্ফুটরূপে বুঝিতে পারি না, তাই আর একটু বিস্তৃতভাবে বলা আবশ্যক। যেমন একখণ্ড লৌহ নিরতিশয় উত্তপ্ত করিলে লৌহ এবং অগ্নিতে একটা মাথামাখি ভাব হয়, একটী অভিন্ন ভাব হয়, লৌহের গুণ অগ্নিতে অগ্নির গুণ লৌহে আরোপিত হয়, অর্থাৎ লৌহ হাতে ঠেকিলে যেমন বলা হয় যে, লৌহে হাত পুড়িল, বস্তুতঃ দাহিকা শক্তি কখনই লৌহের নহে, উহা অগ্নির, অথচ একীভাব হওয়ায় অগ্নির দাহিকা শক্তি লৌহে আরোপিত হইয়াছে, আবার লৌহখণ্ডকে হাতে তুলিলে যেমন বলা হয়, "এ অগ্নি পিণ্ডটা অতিশয় ভারি' এখানেও প্রকৃত পক্ষে ভারিত্ব গুণটী কদাচ অগ্নির নহে, উহা লৌহ খণ্ডের, অথচ পরস্পর অভিন্ন ভাবে লৌহের ভারিত্ব অগ্নিতে অধ্যস্ত হইয়া থাকে। তেমনি প্রকৃতি ও পুরুষের মাথামাখি ভাব হওয়ায়,—পরস্পর সন্নিধান থাকায় প্রকৃতির গুণ সৃষ্ট্যাদি পুরুষে আরোপিত হয়, তখন নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় আত্মা আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করেন, আবার জড়াত্মিকা প্রকৃতিতেও পুরুষের ভোক্তৃত্বাদি আরোপিত হইয়া থাকে, তাই প্রকৃতি আপনাকে প্রকাশশীলা কর্ত্রী বলিয়া অভিমান করে। ফল পক্ষে পুরুষের কোন

সৃষ্টিত্বাদি শক্তি, এবং প্রকৃতিরও ভোক্তৃত্বাদি শক্তি নাই। যেমন পঙ্গুব্যক্তি সমস্ত দেখিতে পাইয়াও চলাচল করিতে পারেনা, এবং অন্ধ লোক পৃথিবীর কিছুই দেখিতে পায় না, সুতরাং তাহার গমনাগমন ক্ষমতা থাকিয়াও না থাকার মধ্যেই গণ্য; কিন্তু যদি অন্ধ ও পঙ্গু উভয়ে চেষ্টা করে, তবে তাহারা গমনাগমন করিতে পারে। অন্ধের স্কন্ধে পঙ্গু আরোহণ করিয়া পথ প্রদর্শক হইলে অন্ধ হাটিয়া যাইতে পারে। নতুবা একাকী কেহই গমনাগমন করিতে পারেনা, তেমনি প্রকৃতি ও পুরুষ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। জড়াত্মিকা প্রকৃতি অন্ধ স্থানীয়া, সুতরাং তাহার কার্য্যকারি থাকিলেও তাহা সুসম্পন্ন হইতে পারেনা, এবং পুরুষ সমস্ত পদার্থকে প্রকাশ করার ক্ষমতাশালী হইয়াও নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, সুতরাং পঙ্গু স্থানীয়, কিছুই করিতে পারেন না। কিন্তু এই উভয়ের সংযোগ হইলেই এই অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিত্যাদি নিখিল কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে, নতুবা প্রকৃতি বা পুরুষ একাএক কিছুই করিতে পারেন না, ইহা সর্ব্ব শাস্ত্র প্রসিদ্ধ। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"তস্মাৎ তত্ত সংযোগাদচেতনংচেতনাবদিব লিঙ্গং। গুণকর্ত্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ।" এতাদৃশ মাখামাখি ভাবাপন্ন প্রকৃতি পুরুষকেই প্রকৃত্যুপহিত বা প্রকৃতিপুরুষাত্মক বলা যায় এবং এই অবস্থাকেই লক্ষ্য করিয়া ঈশ্বর শব্দটী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইনিই সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্ব নিয়ন্তা, ইনিই স্রষ্টা, ইনিই পালয়িতা, ইনিই সংহর্ত্তা, এই পূর্ব্বোক্ত প্রকার ঈশ্বরই আমাদের শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত আর কোন রূপ ঈশ্বর বিষয়ক লক্ষণ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার দ্বারা আমরা ঈশ্বর শব্দের প্রকৃত অর্থটী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম। এখন জীব বলিলে কি বুঝিতে হইবে, তাহা একবার চিন্তা করা যাউক। আমরা পূর্ব্বেই অবিদ্যা শব্দের অর্থটী বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছি—এই অবিদ্যোপহিত চৈতন্য বা আত্মাকে জীব বলা যায়, অবিদ্যোপহিত বলিতেও পূর্ব্ববৎ অবিদ্যার সহিত মাখামাখি ভাব বুঝিতে হইবে। এই প্রকার জীব শব্দের অর্থই সর্ব্বশাস্ত্রাভিমত। ইহা ব্যতীত কোন প্রকার জীব শব্দের লক্ষণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। তাই শাস্ত্র বলেন,—"বিশিষ্টস্য জীবত্বমন্বয়ব্যতিরেকাৎ" (সাংখ্য) দর্শনং 'আত্মানং দ্বিবিধংপ্রাহুঃ পরাপর

বিভেদতঃ। পরন্তু নির্গুণঃ প্রোক্তঃ অহঙ্কারযুতোঽপর।” ইত্যাদি শাস্ত্রে পূর্ব্বোক্ত প্রকার জীবই স্থিরীকৃত হইয়াছে।

এই জীবই প্রত্যেক মনুষ্যাদিতে অবস্থিত থাকিয়া সুখ, দুঃখ, জন্ম ইত্যাদি নানা প্রকার অবস্থার ভোগ করিতেছে, আবার এই জীবের উপাধিগত সত্ত্বাদি গুণের তারতম্যানুসারে,—বিচিত্রতানুসারে দেব, যক্ষ, রক্ষ, মনুষ্য, পশু, পক্ষী ইত্যাদি অসংখ্য প্রকারে জীবের সৃষ্টি হইতেছে। (সত্ত্বাদি গুণের তারতম্যানুসারে কি প্রকারে বিচিত্র সৃষ্টি হয়, তাহা এ প্রস্তাবে আলোচ্য নহে, জগদম্বার ইচ্ছা থাকিলে পরে তাহা আলোচনা করা যাইবে)।

এখন আমরা বুঝিলাম যে, গুণত্রয়ের সাম্যাপন্থাপন্ন একই প্রকৃতি কিছু কিছু অবস্থার ইতর বিশেষ অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ নামে ব্যবহৃত হয়, বস্তুতঃ প্রকৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে কোনই ভিন্নতা নাই। আবার আত্মা, পুরুষ বা চৈতন্য একই পদার্থ, উপাধির ভিন্নতা অনুসারে কখন জীব, কখন ঈশ্বর ইত্যাদি নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন একটী মহাবন বলিলে কতকগুলি বৃক্ষ রাশি ব্যতীত আর কিছুই বুঝায় না, কিন্তু উহার প্রত্যেক্ বৃক্ষকে লক্ষ্য করিলে অনন্ত সংজ্ঞা দেওয়া যায়, যথা, আম্র, পনস, খর্জ্জুর, ইত্যাদি, আবার সমষ্টি বৃক্ষ একত্রে বলিতে হইলে “বন” এই কথাটী ব্যবহার করি, বস্তুতঃ প্রত্যেক বৃক্ষ বাদ দিয়া বন পদার্থের অস্তিত্বই থাকিতে পারে না; সুতরাং সমষ্টি বৃক্ষই বন শব্দের অর্থ, এবং আম্র পনসাদি ব্যষ্টি বৃক্ষগুলিও বনাতিরিক্ত নহে, কেবল ব্যবহারার্থই একটী একটী অবস্থা বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া এক একটী সংজ্ঞা দেওয়া হয় মাত্র। বাস্তবিক কল্পে সমষ্টি ব্যষ্টি অপেক্ষায় পৃথক্ বা নূতন্ পদার্থ নহে, এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টি হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নহে। তবে কেবল মাত্র অবস্থানুসারে ব্যবহারের ভিন্নতা হইয়া থাকে। বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই। তেমনি একই আত্মা আর একই প্রকৃতি- অবস্থার ব্যতিক্রম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় প্রকৃতি বলে, সত্ত্বগুণের প্রাবল্যে মায়া বলে, আবার রজস্তমের প্রাধান্যে সেই প্রকৃতিকেই অবিদ্যা নামে

ব্যবহার করা হয়, মূল পদার্থ একই। পুরুষ সম্বন্ধেও একই প্রণালী, একই পুরুষ মায়োপাধিতে উপহিত অবস্থায় ঈশ্বর আর অবিদ্যোপাধিতে উপহিত হইলে জীব। এই প্রকার আরও অনেক প্রকার ভেদ করা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতির পরিণামানুসারে ও অসংখ্য নাম হইয়াছে। পুরুষের তাহা কখনই হয় না, কেননা পুরুষ অপরিণামী, সুতরাং পরিণতাবস্থায় সংজ্ঞান্তর গ্রহণ অসম্ভব। তবে নানা প্রকারে পরিণত উপাধির আলম্বনে নানা সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইতে হয়। এখন আমরা আত্মার প্রকৃত স্বরূপাবস্থা ও উপাধি ভেদে ঈশ্বরাবস্থা ও জীবাবস্থা বুঝিতে পারিলাম। তন্মধ্যে পুরুষের স্বরূপাবস্থাই (পূর্ব্ব প্রস্তাব দেখুন) পরমাত্মাবস্থা বা তুরীয়াবস্থা। ইহাই গন্তব্য স্থান, মায়োপহিত অবস্থা ঈশ্বরাবস্থা আর অবিদ্যোপহিত অবস্থা জীবাবস্থা।

একটী জিজ্ঞাস্য এই,—ঈশ্বর আর জীব উভয়ই উপাধি সংসৃষ্ট বস্তু; এক চৈতন্য পদার্থই মায়োপহিত অবস্থায় ঈশ্বর এবং অবিদ্যোপহিত হইলে জীব সংজ্ঞায় ব্যবহৃত হইয়া থাকেন, বস্তুতঃ চৈতন্য পদার্থের কোনই বৈসাদৃশ্য নাই। স্বভাবতঃ কাহারও কোন গুণাদি নাই, তবে আর জীব আর ঈশ্বরের বিসদৃশভাব লক্ষিত হয় কেন? ঈশ্বর সর্ব্বদাই মুক্ত, সর্ব্বদাই ঈশ্বর এবং তাঁহার কখনই ক্লেশ, কর্ম্ম পরিণামাদি কিছুই নাই, তাই ভগবান্ পতঞ্জলি দেব বলিয়াছেন,—"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈর-পরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ"। আর জীব সর্ব্বদাই ক্লেশাদি সমন্বিত, ইহার কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তর বুঝিতে হইলে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে আর একটু জানা আবশ্যক, তবেই এই বিষয়টি বিশদরূপে বুঝিতে পারা যাইবে। আত্মা বা চৈতন্য সত্তামাত্র, স্ব প্রকাশ, নির্গুণ পদার্থ, কোন প্রকার ক্রিয়াতেই আত্মার কর্ত্তৃত্বাদি নাই, জড়াত্মিকা প্রকৃতিই নিখিল কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। পুরুষ সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিতি করিয়া সেই জড়াত্মিকা প্রকৃতিকে প্রকাশিতা করিতেছেন। যেমন স্ব প্রকাশ স্বরূপ সূর্য্য আমাদিগকে কোন কার্য্যই হাতে ধরিয়া করাইয়া দেন না, অথবা তিনি নিজেও কোন কার্য্য স্বহস্তদ্বারা সম্পাদন করেন না; কিন্তু সূর্য্যের সহিত আমাদের সম্বন্ধ থাকায় আমরা প্রকাশিত হইয়া সমস্ত

কার্য্য করিতে পারি। যদি সূর্য্যের আলোক মালার সাহায্য না পাইতাম, তাহা হইলে কথঞ্চিৎ রূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিলেও তাহা সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে পারিতাম না, কেননা আমি যতক্ষণ অন্ধ থাকিব, ততক্ষণ পরিস্ফুটভাবে কোন ক্রিয়াই করিতে পারি না। এই প্রকার প্রকৃতি যদি মৃত্তিকাদির ন্যায় অচেতন থাকিত, তাহা হইলে ব্যবহারোপযোগী এই সংসার বিচিত্রভাবে উৎপত্তি করিতে পারিত না। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন, "তৎসন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ" (সাংখ্য দর্শন) তস্মাৎ তৎ সংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গং। গুণকর্তৃত্বেপি তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ।" (সাংখ্য করিয়া) "নিরিচ্ছে সংস্থিতে রত্নে যথা লোহঃ প্রবর্ত্ততে। সত্তামাত্রেণ দেবেন তথাচায়ং জগজ্জনঃ। অত আত্মনি কর্তৃত্বমকর্তৃত্ব সংস্থিতং। নিরিচ্ছত্বাদকর্ত্তাসৌ কর্ত্তা সন্নিধিমাত্রতঃ॥" আত্মা সৃষ্টাদি কোন ক্রিয়াই ইচ্ছাপূর্ব্বক নিষ্পাদন করেন না। তাঁহার সন্নিধান বশতঃ জড়াত্মিকা প্রকৃতি বিচেষ্টমানা হইয়া অনন্ত জগতের প্রসবাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করে। আত্মা কেবলমাত্র সন্নিধিমাত্রের দ্বারাই কার্য্যেতে অধিষ্ঠাতৃত্ব করিয়া থাকেন। যেমন অয়স্কান্ত মণি লোহের সন্নিহিত থাকিলেই লৌহ আকৃষ্ট হয়, কিন্তু অয়স্কান্ত কখনই ইচ্ছাপূর্ব্বক বা যত্ন করিয়া, অথবা আপন ক্রিয়ার দ্বারা লোহকে আকৃষ্ট করে না। তেমনি আত্মার সহিত সম্মিলিত উপাধিই (প্রকৃতি) সমস্ত সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে। অচেতনা প্রকৃতি বা প্রধান আত্মার সহিত সংযোগ মাত্রেই চৈতন্যময়ী হইয়া যায়, বস্তুতঃ ঐ চৈতন্য আত্মারই ধর্ম্ম, উহা প্রকৃতির নহে। আবার নিখিল কার্য্যের কর্ত্রী প্রকৃতির সহিত আত্মার অভিন্ন ভাব থাকায়, উদাসীন, নির্লেপ আত্মাও যেন নিখিল কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করেন। বাস্তবিক এতাদৃশ কর্তৃত্বাদি অভিমানও প্রকৃতিরই ধর্ম্ম, উহা আত্মার নহে।" অতএব আত্মাকে এক ভাবে কর্ত্তা, আবার পক্ষান্তরে অকর্ত্তা এই উভয় রূপেই ব্যবহার করা যাইতে পারে। তাঁহার যখন কোন প্রকার ইচ্ছাদি নাই, তখন তিনি কোন কার্য্যেরই কর্ত্তা হইতে পারেন না। তাই আত্মা অকর্ত্তা। আবার যখন তাঁহার সন্নিধান থাকাতেই প্রকৃতি সমস্ত

কার্য্য নিষ্পাদন করে, তখন তাহাকে সন্নিধান বশতঃ কর্ত্তা বলিয়াও ব্যবহার হয়, বাস্তবিক, আত্মার ও কর্ত্তৃত্বাদি নাই, এবং প্রকৃতির ও চেতনত্ব নাই। ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত। এখন বুঝিতে পারিলাম, বন্ধ মোক্ষ, সুখ, দুঃখ, জরা, মরণাদি কিছুই আত্ম সমবেত নহে। উহারা সমস্তই প্রকৃতিস্থ পদার্থ, সুতরাং আত্মার, বন্ধ, মোক্ষাদি কিছুই নাই। তাই বলিতেছেন,—"বাঙ্‌মাত্রং নতু তত্ত্বং চিত্তস্থিতেঃ।" বন্ধ, মোক্ষাদি সমস্তই চিত্তের ধর্ম্ম, কিন্তু বন্ধ মোক্ষাদি আত্মার ধর্ম্ম, ইহা বাঙমাত্র,—একটা কথা মাত্র, বাস্তবিক তাহা নহে।" অন্যত্র ও বলিয়াছেন, "বন্ধমোক্ষৌ সুখং দুখং মোহাপত্তিশ্চ মায়য়া। স্বপ্নে যথাত্মনঃ খ্যাতিঃ সংস্থানতু বাস্তবী' বন্ধ মোক্ষাদি সমস্তই মায়াখ্য প্রকৃতির ধর্ম্ম, আত্মা সম্পূর্ণ উদাসীন বস্তু।' (সংক্ষিপ্ত অর্থ) আর একটা কথা বুঝিতে হইবে যে, ঈশ্বর চৈতন্য আর জীব চৈতন্যের কোন পার্থক্য আছে কি না? বস্তুতঃ ঈশ্বর চৈতন্য আর জীব চৈতন্যের কোনই পার্থক্য নাই। আত্মা বা চৈতন্য একই পদার্থ, তাঁহার কোন প্রকার বৈষম্য নাই। সুতরাং ঈশ্বর চৈতন্য ও জীব চৈতন্যে কোনই ভেদ নাই। তবে বুঝিতে হইবে যে, ঈশ্বর ও জীব-গত উপাধি গুণের তারতম্যানুসারেই জীব আর ঈশ্বরের পূর্ব্বোক্ত প্রকার বৈষম্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ ঈশ্বরের উপাধি মায়া আর জীবের উপাধি অবিদ্যা, এই উভয় উপাধির বৈলক্ষণ্য থাকাতে উপহিত বস্তুর ও পার্থক্য ভাব হইয়াছে। কেননা মায়া বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধানা, যাহাতে সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ থাকিবে, তাহা স্বভাবতই প্রকাশশীল হইবে; আর অবিদ্যাতে রজস্তমোগুণের প্রাধান্য, সুতরাং অবিদ্যা সর্ব্বদাই প্রকাশের বিরোধিনী। তাই শাস্ত্র বলেন, "সত্ত্বং লঘু প্রকাশক মিষ্টং মুপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ। গুরু বরণকমেব তমঃ প্রদীপবৎ চার্থতোবৃত্তিঃ।" সত্ত্বগুণ স্বভাবতই প্রকাশাত্মক, এবং লঘু, অর্থাৎ হালকা হালকা ভাব সম্পন্ন, রজোগুণ চঞ্চল, ক্রিয়াত্মক, সুতরাং সত্ত্ব ও তমোগুণের উপষ্টম্ভক, অর্থাৎ স্বয়ং অচঞ্চল সত্ত্ব ও তমোগুণকে আপন আপন কার্য্যে প্রযত্নবান করে, এবং তমোগুণ গুরু ও আবরণাত্মক" +++। গুণত্রয়ের স্বরূপ এবং উহা-দের কার্য্য প্রণালী গীতায় আরও সুস্পষ্টরূপে, নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাও এখানে

আমরা দেখাইতেছি। "তত্র সত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ং। সুখ-সঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ। রজোরাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গ-সমুদ্ভবং। তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনং॥ তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাং। প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥ সত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত। জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত"। সত্বগুণ নির্ম্মল বস্তু, সুতরাং প্রকাশক, অর্থাৎ সর্ব্বদাই চৈতন্যের আবরক তমোগুণকে অভিভূত করিয়া চৈতন্যের স্বরূপাভি-ব্যঞ্জক, এবং সুখস্বরূপ। এই সত্বগুণ সুখ ও জ্ঞানসঙ্গের দ্বারা জীবকে সম্বদ্ধ করে।" হে কৌন্তেয়! অপ্রাপ্ত বিষয়কে পাইবার অভিলাষণে তৃষ্ণা এবং প্রাপ্ত বস্তুর কোন কারণে বিনাশের সম্ভাবনা হইলে তাহা রক্ষার নিমিত্ত চেষ্টাকে আসঙ্গ বলে। এই তৃষ্ণা ও আসঙ্গের উৎপাদক রজোগুণ, এই রজোগুণই সমস্ত প্রকার অভিমানের কারণ। আমি ইহা করিব, আমি এই কর্ম্মের ফল ভোগ করিব, এই প্রকার অভি-নিবেশের দ্বারা দেহিকে নিবদ্ধ করে। হে ভারত। তমোগুণ আত্মার আবরক, অজ্ঞান হইতে প্রাদুর্ভূত হয় এবং ইহা সমস্ত প্রাণীর অবিবেক জন্মাইয়া প্রত্যেক জীবকে প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি দ্বারা অধোগত করে। ভারত! গুণত্রয়ের মধ্যে সত্বগুণ যখন প্রবল হয়, তখন জীবকে সুখ বিষয়ে সংযোজিত করে, তখন আর দুঃখ প্রাদুর্ভূত হইয়া জীবকে আকুলিত করিতে পারে না। রজোগুণ সংবৃদ্ধ হইলে মুখ্য কারণ অভিভূত করিয়া দেহিকে কষ্ট মার্গে সংসক্ত করে এবং তমোগুণ যখন প্রাদুর্ভূত হয়, তখন সত্বগুণের কার্য্য জ্ঞানাদিকে পরাভূত করিয়া প্রমাদাদি বিষয়ে জীবকে নিয়োজিত করে। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, ঈশ্বরের উপাধি মায়া, সত্ব প্রধানা, সুতরাং ঈশ্বরেতে সর্ব্বদাই সুখ, সর্ব্বদাই আনন্দ, সর্ব্বদাই শান্তি, বিরাজমান রহিয়াছে। তাই তিনি নিত্য মুক্ত' তাহাতে রজস্তমোগুণের কর্ম্ম ক্লেশ, কার্য্য, পরিণামবর্জ্জিতা প্রমাদ আলস্য অবসাদ প্রভৃতি কখনই স্থান পায় না। তাই শাস্ত্রে বলিয়াছেন, সর্ব্বজ্ঞতা তৃপ্তিরনাদিবোধঃ স্বতন্ত্রতনিত্য মমুপ্ত শক্তিঃ। অনন্ত শক্তিশ্চ প্রভোর্ব্বিধজ্ঞাঃ ষড়াহুরঙ্গানি মহেশ্বরস্য। জ্ঞানং বৈরাগ্য মৈশ্বর্য্যং তপঃ

সত্তাং ক্ষমা ধৃতিং। সৃষ্টিত্বমাত্মসংবোধো হ্যধিষ্ঠাতৃত্ব মেবচ। অব্যয়ানি দশৈতানি নিত্যং তিষ্ঠন্তি শঙ্করে। ঈশ্বরে সর্ব্বদাই সর্ব্বজ্ঞতা, তৃপ্তি, অনাদি আত্মবোধ, সৃষ্টি বিষয়ে স্বাধীনতা, অক্ষীণা শক্তি এবং অনন্ত শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহাতে কখনই ইহার কোনটীর অভাব হয় না এবং জ্ঞান বৈরাগ্য ঐশ্বর্য্য তপ সত্যভাব ক্ষমা ধৃতি জগৎ সৃষ্টিত্ব আত্মবোধ এবং প্রত্যেক কার্য্যেতে অধিষ্ঠাতৃত্ব প্রভৃতি গুণগুলি নিত্যই ঈশ্বরের প্রজ্জ্বলিতভাবে বিদ্যমান আছে।" এই নিমিত্তই ভগবান বেদব্যাস বলিয়াছেন, তত্র সাশ্বতিক সত্ত্বোৎকর্ষঃ" ভগবানেতে সর্ব্বদাই সত্ত্ব গুণের উৎকর্ষ থাকে। সেই নিমিত্ত রজঃ ও তমোগুণ সত্ত্বকে অভিভূত করিয়া আপন আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না। সেই জন্য ঈশ্বরে নিরন্তরই সত্ত্ব গুণের কার্য্য জ্ঞান, বৈরাগ্য বিবেকাদি বিরাজ করে, তাই ঈশ্বর নিত্য মুক্ত, নিত্যেশ্বর, কখনই তাহার প্রকৃতস্বরূপের আবরণ হইতে পারে না এবং জীবের ন্যায় ক্লেশ কষ্টাদিও নাই। আর জীবে নিয়তই রজ ও তমোগুণ আধিপত্য করিতেছে, সুতরাং সত্ত্বগুণ এত ক্ষীণ যে, আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিতে পারে না, এই জন্য জীব সর্ব্বদাই বদ্ধ, সর্ব্বদাই ক্লেশ, কষ্ট, বিকারাদির দ্বারা পরাভূত। কারণ জীবের উপাধি অধিক রজস্তম প্রধান, সুতরাং রজ ও তমোগুণের কার্য্য দুঃখ্যাদিই জীবেতে আধিপত্য করিতেছে। জ্ঞান, বৈরাগ, ঔদাসীন্য প্রভৃতি সত্ত্বগুণের কার্য্য প্রায়ই প্রকাশ পাইতে পারে না এবং রজ ও তমোগুণের প্রকাশ থাকা নিবন্ধন অবিদ্যা অস্মিতা, রাগ দ্বেষ অভিনিবেশ প্রভৃতি কুৎসিত গুণরাশি দ্বারা আত্মা সর্ব্বদাই আবৃত থাকেন, কদাচ আত্মার প্রকৃত স্বরূপের বিকাশ হইতে পারে না। তাই জীব সর্ব্বদাই দুঃখী।

এখন আমরা অতি সুস্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারিলাম যে, ঈশ্বর চৈতন্য এবং জীব চৈতন্যের কোনই পার্থক্য নাই, কিন্তু ইহাদের উপাধিগত মায়া ও অবিদ্যার গুণানুসারেই ঈশ্বর ও জীবের এতাদৃশ বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে। ঈশ্বর সর্ব্বদাই মুক্ত, নিয়তই ঈশ্বর এবং জীব সর্ব্বদাই অবিমুক্ত, অনীশ্বর ও দুঃখাদি পরামৃষ্ট। সুতরাং শাস্ত্র ও যুক্তির কোনই বৈষম্য বা বিরোধ হইতে পারে না।

ষষ্ঠ বর্ষ।
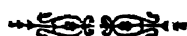
ষষ্ঠ ভাগ। অগ্রহায়ণ ও পৌষ সন ১২৯৮ সাল। ৮ম ও ৯ম খণ্ড।

দেবি! প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতে নিত্যং যথা সুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানি সর্ব্বগতাঞ্চ সমঃ নয়াশু, উৎপাত পাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্॥

কৃষ্ণাবতার কোন যুগে ?

যুধিষ্ঠিরের সময়।

"কৃষ্ণাবতার কোনযুগে ?" এই মুকুটার্পণ দেখিয়াই বোধ হয় পাঠকগণ, বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় কি, তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। বিষয়টি যে অতি গুরুতর ও আবশ্যকীয় তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। হিন্দু, অহিন্দু, ও অর্দ্ধ হিন্দু অথবা প্রাচীন, নব্য ও মধ্যবিত্ত সমাজের প্রত্যেকেরই রক্ষ্যমান বিষয়টি একবার আলোচনা করিয়া দেখা অতীব কর্ত্তব্য। কারণ, এবিষয়ে প্রাচীন ও নব্য উভয় সম্প্রাদায়েরই বিষম ভ্রম রহিয়াছে। নব্য সম্প্রদায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতকে বেদবাক্যতুল্য

অভ্রান্ত মনে করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ খৃঃ অঃ প্রায় ১২ শত বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। প্রাচীনসম্প্রদায় তাঁহাদের চিরপোষিত সংস্কারানুসারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পঞ্চ সহস্র বৎসরাপেক্ষাও অধিক প্রাচীনতমকালে অর্থাৎ দ্বাপরযুগের শেষভাগে টানিয়া লইয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই দুই মতই ভ্রান্ত। (১) বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা নব্যসম্প্রদায়ের ভ্রমপ্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব না। কারণ, তাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রকারগণের কথায় বিশ্বাস করেন না। সুতরাং তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইলে স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। এই নিমিত্ত বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সে বিষয়ের অবতারণা না করিয়া হিন্দুশাস্ত্রে আস্থাবান্ প্রাচীন সম্প্রদায়ের ভ্রমাপনোদন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সময় নির্দ্ধারিত করিতে হইলে প্রথমে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সময় নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। যুধিষ্ঠির কতদিনের লোক, মহাভারতে তাহার কোনও নির্দ্দিষ্ট কালসংখ্যার উল্লেখ নাই। সুতরাং অন্যত্র অনুসন্ধান আবশ্যক। বিষ্ণুপুরাণের ৪র্থ অংশের ২৪ অধ্যায়ে লিখিত আছে;———

(১) নব্যসমাজের এইরূপ পাশ্চাত্যমতাবলম্বিত্ব ও প্রাচীন সমাজের চিরপোষিত সংস্কারের দাসত্ব সম্বন্ধে মাননীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় যে সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি বলিয়াছেনঃ—

"দেশীয় শিক্ষার অভাব হইয়া কেবল বিদেশীয় শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মন ও মস্তিষ্ক বিদেশীয় ভাব, বিদেশীয় সংস্কার, বিদেশীয় দৃষ্টি ও বিদেশীয় প্রকৃতি দ্বারা সংগঠিত হইয়াছে;—এমন কি ভারতীয় মনুষ্যের পৃথক্ অস্তিত্বই বিলুপ্তপ্রায়! আজ ভারতবর্ষ মৃত, আজ আর্য্যভূমি ভারতবর্ষকে উপ-ইংলণ্ড বা ফিরিঙ্গিল্যাণ্ড বলিলেও অত্যুক্তিবোধ হয় না। আজ নব্য সমাজ, ভারতবর্ষে যাহা কিছু দেখেন, তাহাই বিদেশীয় দৃষ্টিদ্বারা, যাহা কিছু ধারণা করেন তাহাও বিদেশীয় ধারণা দ্বারা এবং যাহা কিছু ভাবেন তাহা বিদেশীয় ভাবনা দ্বারা। তাই বলি, আর্য্যভূমি ভারতবর্ষ, উপ-ইংলণ্ড হইয়া উঠিল! × × ৳

"যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম (রাজ্যং ?) যাবন্নন্দাভিষেচনং।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরং ॥ ৩২ ॥
সপ্তর্ষীণাঞ্চ যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে উদিতো দিবি।
তয়োস্তু মধ্য নক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি ॥ ৩৩ ॥
তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাং।
তেতু পরীক্ষিতেকালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম।
তদাপ্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দ শতাত্মকঃ ॥ ৩৪ ॥
প্রযাস্যন্তি যদাচৈতে পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়।
তদানন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলিবৃদ্ধিং গমিষ্যতি ৩৯। (১)

অনুবাদ—পরীক্ষিতের জন্ম (রাজ্য ?) কাল হইতে নন্দের অভিষেক পর্য্যন্ত কালের পরিমাণ এক সহস্র পঞ্চদশ বৎসর।* ৩২। আকাশে সপ্তর্ষিগণের মধ্যে প্রথমে যে দুইটি নক্ষত্র উদয় হয়, সেই নক্ষত্রদ্বয়ের ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী নক্ষত্রদ্বয়ের মধ্যে সমদেশে অবস্থিত যে একটি কস্থিয়া নক্ষত্র রাত্রিকালে দৃষ্টি হয়, ঐ এক, একটি নক্ষত্রের সহিত যুক্ত হইয়া সপ্তর্ষিগণ মনুষ্যদিগের পরিমাণের এক শত বৎসর কাল অবস্থিতি করেন। ৩৩। হে দ্বিজোত্তম (মৈত্রেয়!)

নব্য সমাজের অবস্থা বলিলাম। আবার আজকালের প্রাচীন-সমাজের অবস্থা আরও শোচনীয়। প্রাচীন সমাজ স্থূল, সূক্ষ্ম কোনও চিন্তার আবশ্যকতা মনে করেন না। তাঁহারা যাহা করিয়া আসিতেছেন, তাহাই করিবেন।* আর্য্যশাস্ত্রের নির্ম্মল সুযুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি যে তাঁহাদের ঘোর স্বেচ্ছাচার ও স্বার্থপরতায় বিমিশ্রিত হইয়া, এখন নিতান্ত মলিনবেশে পরিণত ও ঘোর কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, ইহা প্রাচীন-সমাজ ঈষৎ কটাক্ষ করিয়াও দেখেন না। প্রাচীন সমাজ স্তম্ভের সমাজ স্তম্ভ নিশ্চিন্ত ও অচল অটল।" ধর্ম্মব্যাখ্যা। ১ম খণ্ড ৩ পৃঃ × + +

(৩৫।৩৬।৩৭।৩৮) ॥

(১) ভাষার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া এই শ্লোক গুলি শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা (শুকদেব পরীক্ষিতকে বলিতেছেন—)

"আরভ্য ভবতো জন্ম যাবনন্দাভিষেচনং।
এতদ্বর্ষ সহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরং ॥ ২৬ ॥
সপ্তর্ষিণান্তু যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যতে উদিতৌ দিবি।

এই সপ্তর্ষিগণ পরীক্ষিতের রাজ্যকালে মধ্যবর্ত্তী মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। সেই সময় কলির দ্বাদশ শত বৎসর প্রবৃত্ত হয়। ৩৪॥ + + + (৩৫। ৩৬।৩৭।৩৮) এই মহর্ষিগণ (সপ্তর্ষিগণ) যৎকালে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে গমন করিবেন, সেই সময় নন্দের রাজত্বকাল হইতে কলি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে॥ ৩৯॥

উপরোদ্ধৃত অংশ পাঠে জানাগেল যে, পরীক্ষিতের রাজ্যকালে সপ্তর্ষি মণ্ডল মঘা নক্ষত্রে ছিল; এবং সেই সময় কলির দ্বাদশ শত বৎসর প্রবৃত্ত হইয়াছিল। পরীক্ষিতের রাজ্যকালের ১০১৫ বৎসর পরে (অর্থাৎ ২২১৫ কলিগতাব্দে) মহানন্দি (নন্দ) প্রাদুর্ভূত হন। মহানন্দির রাজ্যকালে সপ্তর্ষিগণ পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে ছিলেন। সপ্তর্ষিগণের এক এক নক্ষত্র ভোগের কাল এক শত বৎসর। মঘাও পূর্ব্বাষাঢ়ার মধ্যে ১০ নক্ষত্রের অন্তর থাকায় নিঃসন্দেহ রূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, দ্বাদশ শত কলিগতাব্দের প্রায় সহস্র বৎসর পরে অর্থাৎ ২২ শত কলিগতাব্দে মহানন্দি প্রাদুর্ভূত হন।

তয়োস্তু মধ্যে নক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি ॥ ২৭ ॥
তে নৈব ঋষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দ শতং নৃণাম্।
তে ত্বদীয়ে দ্বিজাঃ কালে অধুনা চাশ্রিতা মঘাঃ ॥ ২৮ ॥
+ + + + + (২৯। ৩০)
যদা দেবর্ষয়ঃ সপ্ত মঘাসু বিচরন্তি হি।
তদা প্রবৃত্তস্তু কলির্দ্বাদশাব্দ শতাত্মকঃ॥ ৩১ ॥
যদা মঘাভ্যো যাস্যন্তি পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি ।৩২।

* ভাগবতে ১২ শস্কন্ধে ২য় অধ্যায়ঃ। বঙ্গবাসী-শাস্ত্র প্রাকাশ হইতে প্রকাশিত বিষ্ণু পুরাণের অনুবাদে এই স্থলে একটি গুরুতর ভ্রম দৃষ্ট হয়। বঙ্গবাসীর অনুবাদকগণ ৩২শ্লোকের শেষার্দ্ধের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন যথা "পরীক্ষিতের জন্মকাল হইতে নন্দের অভিষেক পর্য্যন্ত কালের পরিমাণ "পঞ্চদশ সহস্র বৎসর," ইহা জানিবে।" অনুবাদকের দোষেই হউক অথবা মুদ্রাকর প্রমাদবশতই হউক এই অনুবাদ ভ্রমাত্মক। এক সহস্র পঞ্চদশ বৎসর পরিবর্ত্তে বঙ্গবাসীর অনুবাদে "পঞ্চদশ সহস্র বৎসর" লিখিত হইয়াছে।

উক্ত বিষ্ণু পুরাণের ২৩ ও ২৪ অধ্যায়ের বর্ণন মতে মহারাজ জরাসন্ধের পর তদীয় বংশধরগণ সহস্র বৎসর মগধ শাসন করেন। তৎপরে প্রদ্যোত বংশীয় ৫ জন নৃপতি ১৩৮ বৎসর রাজত্ব করেন। প্রদ্যোত বংশের পর শিশুনাগ বংশ। এই বংশে দশজন ভূপতি ৩৬২ বৎসর মগধে রাজত্ব করেন। তৎপরে মহানন্দি বা নন্দ মগধের রাজ্য ভার প্রাপ্ত হন। এতদনুসারে জরাসন্ধ ও মহানন্দির মধ্যে (২২+৫+১০) ৩৭ জন নৃপতি (১০০০+১৩৮+৩৬২) ১৫০০ বৎসর মগধে রাজত্ব করেন। ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, মহানন্দি (১২০০+১০১৫) ২২১৫ কলিগতাব্দে প্রাদুর্ভূত হন *। জরাসন্ধ মহানন্দির ১৫ শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী। ২২১৫ কলিগতাব্দ হইতে ১৫ শত বৎসর বিয়োগ করিলে ৭১৫ কলিগতাব্দ বাকী থাকে, তাহাই জরাসন্ধের কাল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা জরাসন্ধের সমসাময়িক, সুতরাং তাঁহারা যে কল্যব্দের অষ্টম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ইহার পর আরও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তাহার দ্বারা যুধিষ্ঠিরাদির বর্ত্তমান কাল নিশ্চয় রূপে নির্দ্ধারিত হয়। রাজতরঙ্গিনী নামক প্রাচীন (১১৪৮ খৃঃ অব্দে রচিত) ও প্রামাণিক গ্রন্থে লিখিত আছেঃ—

বিঃ পুঃ অনুসারে পরীক্ষিৎ ও নন্দের মধ্যে ১০১৫ বৎসরের অন্তর, কিন্তু ভাগবতানুসারে তাঁহাদের মধ্যে ১১১৫ বৎসরের অন্তর ছিল। (ভাঃ ১২।২।২৬)। বিঃ পুরাণে যে স্থানে "জ্ঞেয়ং" লিখিত আছে, ভাগবতে সেই স্থলে "শতং" লিখিত হইয়াছে। শ্রীধর স্বামী এই প্রভেদকে কল্প ভেদ মূলক বলিয়া স্বীকার করেন নাই। আমাদের বিবেচনায় প্রাচীনকালের লিপিকরগণের অসাবধানতা ও অনভিজ্ঞতা এই রূপ প্রভেদের প্রধান কারণ।

* মহানন্দির (নন্দের) একশত বৎসর পরে অর্থাৎ ২৩১৫ কলিগতাব্দে মৌর্য্যবংশের স্থাপন কর্ত্তা চন্দ্রগুপ্ত মগধের রাজা হন। এতদনুসারে চন্দ্রগুপ্তের আবির্ভাবকাল ২৩১৫ কলিগতাব্দ বা ৭৮৬ পূঃ খৃঃ অব্দ। মহাবংশমতে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল ৩৮১পূঃ খৃঃ হইতে ৩৭৬ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত। কর্ণেল উইলফোর্ডের মতে ৩৫০ পূঃ খৃঃ চন্দ্রগুপ্তের আবির্ভাব

"শতেষু ষট্সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণাং অভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ॥
রাজতরঙ্গিনী ১।৫১।

অর্থাৎ কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর অতীত হইলে পর কুরুপাণ্ডবের জন্ম হয়। মহাভারত মতে পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে পরং ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক যুধিষ্ঠিরকে লইয়া কুন্তী হস্তিনায় আগমন করেন। তাহার পর ২০ বৎসর অস্ত্রাদি শিক্ষায় অতিবাহিত হয়। তৎপরে জতু গৃহদাহ ও কুন্তীকে লইয়া যুধিষ্ঠিরাদির ১২ বৎসর লুক্কায়িত ভাবে বনে বনে ভ্রমণ। ইহার পর দ্রৌপদী লাভ ও ১৮ বৎসর রাজ্য ভোগ। এই সময় রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠিত ও জরাসন্ধ বধ হয়। সুতরাং (৬৫৩+১৬+২০+১২+১৮=) ৭১৯ কলিগতাব্দে জরাসন্ধ বধ হয়।

গর্গসংহিতা নামক (খৃঃ ২য় শতাব্দীতে রচিত) অতি প্রাচীন জ্যোতির্গ্রন্থে লিখিত আছে;—

"আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্দ্বিক্ পঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ"॥ (১)

অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালে সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে ছিল; এবং শকাব্দ প্রারম্ভের সময় যোধিষ্ঠীরাব্দের ২৫। ২৬ বৎসর গত হইয়াছিল (২) সম্প্রতি কলির ৪৯৯২ ও শকাব্দের ১৮১৩ বৎসর প্রবহমান। কলির ৪৯৯২ হইতে শকাব্দের ১৮১৩ ও যোধিষ্ঠিরাব্দের ২৫২৬ বৎসর বিয়োগ করিলে ৪৯৯২—(১৮১৩+২৫২৬) ৬৫৩ কলিগতাব্দ লব্ধ হয়; এই সময় যুধিষ্ঠি-

---

কাল। উইলসন ও মোক্ষমূলারাদি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ৩১৫ পূঃ খৃঃ তাঁহার সময় নিরূপিত করেন।

(১) সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বেত্তা মহামতি বরাহমিহির এই শ্লোকটি গর্গসংহিতা হইতে স্বীয় গ্রন্থে (বৃহৎসংহিতাতে) উদ্ধৃত করিয়াছেন। বরাহমিহির ৪২৭ শকাব্দে (৫০৫খৃঃ) জন্মগ্রহণ ও ৫০৯ শকাব্দে (৫৮৭খৃঃ) ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

(২) "যদাতু শালিবাহনস্য শকাব্দাঃ প্রচলিতুমারব্ধাস্তদা বৈ পাণ্ডুকুল নন্দন মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রবর্ত্তিতাব্দানাং ষড়বিংশাধিক সার্দ্ধ দ্বিসহস্রাণ্যেবাতীতানি।" স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শব্দকল্পদ্রুম, দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত সংস্করণের দ্বিতীয়কাণ্ডের ১৮৭ পৃষ্ঠা দেখ।

রের জন্ম হয়। এস্থলে বলা আবশ্যক, যুধিষ্ঠিরের জন্মকাল হইতে যৌধিষ্ঠিরাব্দ গণনা হইয়াছিল।

পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রমাণ সমূহের দ্বারা নিঃসন্দেহ রূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও তৎসমসাময়িক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকল্যব্দের অষ্টম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। মহাভারত ও ভাগবতানুসারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনসমবয়স্ক ছিলেন। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের অপেক্ষা ৪ বৎসরের ছোট ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের জন্ম ৬৫৩ কলিগতাব্দে। সুতরাং অর্জ্জুন ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ (৬৫৩+৪=) ৬৫৭ কলিগতাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন, সন্দেহ নাই। পাঠকগণ বোধ হয় এখন বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ভূতভাবন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর যুগে অবতীর্ণ হন নাই, বরং প্রকৃতপক্ষে তিনি কলিযুগেই এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

এখনও এবিষয়ে যাঁহাদের সন্দেহ আছে, তাহাদের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ আমরা এস্থলে স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শব্দকল্পদ্রুম হইতে আমাদের কথার পরিপোষক আরও কয়েকটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি। ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে :—

"অথ ভাদ্রপদে মাসি কৃষ্ণাষ্টম্যাংকলৌযুগে।
অষ্টাবিংশতিতমে জাতঃ কৃষ্ণোঽসৌ দেবকীসুতঃ॥

শব্দকল্পদ্রুমধৃত ব্রহ্মপুরাণবচনং।

অর্থাৎ এই দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অষ্টাবিংশতিতম কলিযুগের * ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ পক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে জন্ম গ্রহণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৮ম অধ্যায়ে মহামুনি গর্গ শ্রীকৃষ্ণের নাম করণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাদ্বারাও শ্রীকৃষ্ণের কলিযুগাবির্ভাব সূচিত হইয়াছে। গর্গের উক্তিটি এই:—

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লোরক্ত স্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাংগতঃ॥" ভাঃ ১০।৮।১৩

* "অষ্টাবিংশতিতম কলিযুগে" এই কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, অন্য কোন কলিযুগ নয়, বৈবস্বত মন্বন্তীর এই বর্ত্তমান অষ্টাবিংশতিতম কলিযুগেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অর্থাৎ ভগবান্ যুগে যুগে শরীর ধারণ করেন। পূর্ব্বে সত্যাদি যুগত্রয়ে তাঁহার বর্ণ শুক্ল, লোহিত ও পীত ছিল; ইদানীং কলিযুগে ভগবান্ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছেন। পুরাণান্তরেও এই গর্গোক্তির সমর্থন দেখিতে পাওয়া যায়। যথাঃ—

"কৃতে শুক্লং হরিং বিদ্যাৎ ত্রেতায়াং রক্তবর্ণকং ॥"
দ্বাপরে পীত বর্ণঞ্চ কলৌকৃষ্ণত্বমাগতঃ ॥"

অর্থাৎ সত্যযুগে ভগবান্ হরি শুক্লবর্ণ, ত্রেতায় রক্তবর্ণ, দ্বাপরে পীতবর্ণ ছিলেন, এবং কলিযুগে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছেন। আর আবশ্যক নাই। যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কলিযুগের ৭ম শতাব্দতে খৃঃ পূঃ ২৫শ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, একথা শাস্ত্র ও যুক্তি সঙ্গত। এখনও এবিষয়ে যাঁহাদের সন্দেহ আছে তাঁহারা দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত শব্দ কল্পদ্রুমের ২য় কাণ্ডের ১৮১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত এতদ্বিষয়ক অন্যান্য প্রমাণসমূহ * দেখিলেই স্ব স্ব ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। এক্ষণে পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, বিষ্ণুপুরাণে পরীক্ষিতের "জন্মকাল" হইতে ১০১৫ বৎসর পরে মহানন্দি প্রাদুর্ভূত হন, লিখিত আছে; কিন্তু আমরা এস্থলে তাঁহার "রাজ্যকাল' হইতে ১০১৫ বৎসর পরে মহানন্দির সময় ধরিলাম কেন? উত্তর—আমাদের বিবেচনায় এস্থলে মূলে "রাজ্যং" এই শব্দের পরিবর্ত্তে লিপিকর প্রমাদ বশতঃ "জন্ম" এই কথাটি লিখিত হইয়াছে; কারণ ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে জরাসন্ধ ও পরীক্ষিতের মধ্যে ৪৮৫ বৎসরের অন্তর (১) ছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় পরীক্ষিৎ গর্ভস্থ ছিলেন। সুতরাং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অব্যহিত পরেই পরীক্ষিৎ ভূমিষ্ঠ হন। এখন, বিষ্ণুপুরাণের উক্ত বর্ত্তমান পাঠ যদি শুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে জরাসন্ধের মৃত্যুর ৪৮৫ বৎসর পরে পরীক্ষিতের জন্ম হয়, একথা ও

* স্থানাভাবে শব্দকল্পদ্রুমধৃত সমস্ত প্রমাণ এস্থলে উদ্ধৃত হইল না।

(১) পরীক্ষিৎ ও মহানন্দির মধ্যে ১০১৫ বৎসরের এবং জরাসন্ধ ও মহানন্দির মধ্যে ১৫শতবৎসরের অন্তর। সুতরাং জরাসন্ধ ও পরীক্ষিতের মধ্যে ১৫০০—১০১৫—৪৮৫ বৎসরের অন্তর।

স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু জরাসন্ধের মৃত্যু ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এই দুই প্রসিদ্ধ ঘটনার মধ্যে ৪৮৫ বৎসরের অন্তর থাকা মহাভারত বিরুদ্ধ। মহাভারত পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন, জরাসন্ধবধ ও রাজসূয় যজ্ঞের অব্যবহিত পরেই পাশাক্রীড়া হয় এবং যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা পাশায় পরাজিত হইয়া ত্রয়োদশ বৎসরের জন্য বন গমন করেন। বনবাস হইতে প্রত্যাগমনের পর প্রায় ১ বৎসর যুদ্ধের আয়োজন ও যুদ্ধ হয়। সুতরাং জরাসন্ধ বধের প্রায় ১৪।১৫ বৎসর পরেই কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সংগ্রাম হয়। এই বিরোধ নিরাকরণার্থ আমরা উক্ত বর্ত্তমান "পাঠকে" অশুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। আমাদের বিবেচনায় পূর্ব্বোদ্ধৃত ৩২ শ্লোকোক্ত "জন্মে' পদের পরিবর্ত্তে "রাজ্যং" এই পদ বসাইলে সমস্ত বিরোধের নিরাস হয়।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর যুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এই ভ্রমাত্মক সংস্কার কোথা হইতে আসিল? আমাদের বিবেচনায় বৈষ্ণবগণই এই ভ্রমপূর্ণ মতের প্রচারক। বৈষ্ণবগণের মতে শকাব্দের ৩১৭৯ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ বর্ত্তমান কালের (৩১৭৯+১৮১৩) ৪৯৯২ বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের অব্দ আরম্ভ হয়। তাঁহাদের বিশ্বাস, যে দিন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই ধরাধাম পরিত্যাগ করেন, সেই দিন হইতে কলিযুগ ও যৌধিষ্ঠিরাব্দ আরম্ভ হইয়াছে। কারণ ভূতভাবন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে এই অধম কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এ কথা তাঁহারা স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক। এই নিমিত্ত তাঁহারা উক্ত মর্ম্মের একটী শ্লোক রচনা করিয়া বরাহমিহির প্রণীত বৃহৎ সংহিতার (বোম্বাই প্রদেশীয়) কোন কোন পুস্তকের ১৩শ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন। সে শ্লোকটি এইঃ—

"বর্ষসহস্র ত্রিতয়ং (৩০০০) শতমেকং (+১০০) সপ্ততি (+৭০) নবাগ্রা (+৯=৩১৭৯) চ। শককালযাত মিশ্রং কলের্গতঃ ধর্ম্ম পুত্রাস্ত॥

কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, বৃহৎ সংহিতার সেই ১৩শ অধ্যায়ের "ষড়দ্বিক্ পঞ্চ দ্বিযুক্তঃ এই সর্ব্ববাদী সম্মত শ্লোকের সহিত উক্ত শ্লোকের

কোন ঐক্য নাই—গর্গ সংহিতা, জ্যোতির্বিদাভরণ ও রাজতরঙ্গিনী * প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ প্রামানিক প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে, এমন কি বৃহৎ সংহিতার অন্য কোনও দেশের কোন পুস্তকে উক্ত শ্লোকটী দৃষ্ট হয় না, তখন বলিতে হইতেছে যে, ঐ শ্লোকটী নিশ্চয়ই প্রক্ষিপ্ত। অতএব শকাব্দের ২৫২৬ বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠীর জন্ম গ্রহণ করেন এ কথাই ঠিক। এই রূপে বৈষ্ণবগণ কলিযুগের প্রারম্ভ হইতে বিক্রমাব্দ আরম্ভ পর্য্যন্ত ৩০৪৪ বৎসর যুধিষ্ঠীরের অব্দ প্রচলিত ছিল, ধরিয়া লইয়াছেন। এই নিমিত্তই বোম্বাই প্রদেশস্থ পঞ্জিকাতে যুধিষ্ঠীরের অব্দ ৩০৪৪ বৎসর প্রচলিত ছিল, লিখিত থাকে।—

শুধু তাহাই নহে। বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের উপাস্যদেবতার মাহাত্ম্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিবিধ গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের দ্বাপর যুগাবির্ভাবসূচক বচন সমূহ প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন। ইতি পূর্ব্বে বিষ্ণুপুরাণের যে সকল বচন অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগের ১ম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন প্রমাণ করা হইয়াছে, দুর্ভাগ্য ক্রমে সেই সকল বচনের সহিত নিম্নলিখিত বচনগুলিও দৃষ্ট হয়। যথাঃ।—

"যদৈব ভগবদ্ বিষ্ণোরংশো যাতো দিবংদ্বিজ।
বসুদেবকুলোদ্ভূতস্তদৈব কলিরাগতঃ ।৩৫॥
যাবৎস পাদপদ্মাভ্যাং স্পর্শেমাং বসুন্ধরাং।
তাবৎ পৃথ্বীপরিষঙ্গে সমর্থো নাভবৎ কলিঃ॥ ৩৬॥

\+ + + + + + + + + + (৩৭।৩৮।৩৯)

যস্মিনকৃষ্ণোদিবং যাতস্তস্মিন্নেবতদাহনি।
প্রতিপন্নং কলিযুগমিত্যাদি॥ ৪০॥"

অনুবাদ——যে সময় ভগবান বিষ্ণুর অংশ বাসুদেব স্বর্গেগমন করেন, সেই সময়ই কলি আগমন করিয়াছে। ৩৫। ভগবান বাসুদেব যতদিন পাদ পদ্ম দ্বারা এই পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়াছিলেন ততদিন

* জ্যোতির্বিদাভরণ ও রাজতরঙ্গিনীতে লিখিত আছে যে, শকাব্দ আরম্ভের ২৫২৬ বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরাব্দ প্রচলিত হয়।

কলি পৃথিবীকে স্পর্শকরিতে সমর্থ হয় নাই। ৩৬। + + +
(৩৭।৩৮.৩৯) শ্রীকৃষ্ণ যেদিন স্বর্গে গমন করেন, সেই দিনই কলি উপস্থিত হইয়াছে। ৪০। এই বচনগুলি প্রক্ষিপ্ত। এক লেখনী হইতে এরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ বচনাবলী প্রসূত হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। বিষ্ণুপুরাণকারি পূর্ব্বোদ্ধৃত ৩৩ ও ৩৪ শ্লোকদ্বারা প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের কলিযুগাবির্ভাব নির্দ্দেশ করিয়া পরে পশ্চাদুদ্ধৃত ৩৫, ৩৬, ও ৪০ শ্লোকের দ্বারা তাঁহার দ্বাপর যুগাবির্ভাব সূচনা করত কি স্বীয় বাতুলতার পরিচয় দিবেন? টীকাকার শ্রীধরস্বামী এই শ্লোকের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে যদি কোন কষ্ট কল্পনা না থাকে তবে ঐ শ্লোক গুলিকে একবার প্রক্ষিপ্ত বলিতে পারা যায় না। ৩৬ শ্লোকের টীকায় তিনি বলিয়াছেনঃ—

"পৃথ্বীপরিষ্বঙ্গে ভুমে পরিভবে সমর্থ ইত্যুক্তেঃ পূর্ব্বমপি কলি প্রবিষ্ট ইতি গম্যতে।" তিনি এই শ্লোকগুলির দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের কলিযুগাবির্ভাব প্রমাণিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন*।

আবার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া ভাগবতের ১২ স্কন্ধের ২য় অধ্যায়ে উক্ত শ্লোক গুলির অর্থ বোধক কয়েকটী বচন দৃষ্ট হয়। সেগুলি এইঃ—

"বিষ্ণোর্ভগবতোভানুঃ কৃষ্ণাখ্যোঽসৌদিবংগতঃ।
তদাবিশৎ কলিলোকং পাপেযদ্রমতে জনঃ॥ ২৯॥
যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং স্পৃশন্নাস্তে রমাপতিঃ।
তাবৎ কলির্বৈ পৃথিবীং পরাক্রন্তুং নবাশকৎ॥ ৩০॥
যস্মিন্ কৃষ্ণোদিবং যাতঃ তস্মিন্নেব তদাহনি।
প্রতিপন্নং কলিযুগ মিতিপ্রাহুপুরাবিদঃ॥ ৩৩॥

এ শ্লোক গুলিও প্রক্ষিপ্ত। কারণ, এগুলির সহিত ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৮ম অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোকের সহিত ঐক্য নাই। এতদ্ব্যতীত ১২শ স্কন্ধের ২য় অধ্যায়ের ২৭, ২৮ ৩১ শ্লোকের * সহিত উক্ত শ্লোকগুলির বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে। যাহা হউক, শ্রীধরস্বামী উক্ত শ্লোক গুলির টীকায় যাহা বলিয়াছেন, তাহাদ্বারাও শ্রীকৃষ্ণের দ্বাপর যুগাবির্ভাব স্বীকৃত হইয়াছে। ৩০ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেনঃ—

* এই শ্লোকগুলি আমরা ইতি পূর্ব্বে টীকায় উদ্ধৃত করিয়াছি।

"নমু শ্রীকৃষ্ণে পৃথিব্যাং বর্ত্তমানেপি সন্ধ্যারূপেন কলিঃ প্রবিষ্ট এবং আসীৎ সত্যম্। তথাপি তাবৎ তস্য পরাক্রমো নাভবৎ।" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বর্ত্তমানকালে কলি সন্ধ্যারূপে প্রবিষ্টছিল সত্য, কিন্তু তৎকালে তাহার পরাক্রম বেশী হয় নাই। ৩৩ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন "ততঃ পূর্ব্বমেব প্রবেশস্ততঃ পরংবৃদ্ধিরিতি।" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই কলি প্রবিষ্ট হইয়াছিল, এবং তাহার ইহলোক ত্যাগের পর হইতে কলিবৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এস্থলে আরও একটী বিচার উপস্থিত হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে বিষ্ণু-পুরাণ হইতে আমরা যে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার সহিত মহাভারতোক্তির ঐক্য সম্পাদন করিয়া সূক্ষ্মরূপে বিচার করিলে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্টির ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আমাদের পূর্ব্বনির্দ্দেশিত সময়াপেক্ষা আরও একটু আধুনিক কালে টানিয়া আনিতে হয়। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বোদ্ধৃত "যাবৎ পরীক্ষিতোজন্ম" এই শ্লোকটিকে ভ্রমাত্মক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়।

মহাভারত বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতাপেক্ষা সমধিক প্রাচীন গ্রন্থ। মহাভারতের স্ত্রী পর্ব্বের পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে ও মৌষলপর্ব্বের প্রথমাধ্যায়ে লিখিত আছে যে, ভারত সমরের ৩৬ বৎসর পরে যদুবংশ ধ্বংশ হয়। * এই ঘটনার পর এক বৎসরের মধ্যেই যুধিষ্টির অভিমন্যু তনয় পরীক্ষিৎকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করণ মানসে মহা প্রস্থান করেন। ভারত সমরের ১৪ বৎসর পূর্ব্বে (যুধিষ্ঠিরের ৬৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে) রাজসূয় যজ্ঞ ও জরাসন্ধ বধ হয়। সৌপ্তিক পর্ব্বের ১৬শ অধ্যায়ানুসারে

(*) বঙ্গবাসী-শাস্ত্র প্রকাশ হইতে প্রকাশিত মহাভারতের অনুবাদে এই স্থলে একটি ভ্রমদৃষ্ট হয়। তাহাতে মৌষল পর্ব্বের ১ম অধ্যায়ের প্রারম্ভে লিখিত আছে যে, যুধিষ্টিরের রাজ্যকালের "ষড়বিংশ' বৎসরে যদুবংশ ধ্বংশ হয়। কিন্তু উক্ত সংস্করণের উক্ত পর্ব্বের ১ম অধ্যায়ের শেষে ও স্ত্রী পর্ব্বের ২৫ অধ্যায়ের শেষে "ষড়বিংশ" এর পরিবর্ত্তে "ষট্ত্রিংশ" বৎসর লিখিত আছে। বলা বাহুল্য। মূলে সর্ব্বত্র "ষট্ত্রিংশ" বৎসরই লিখিত আছে

পরীক্ষিত ৬০ বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া লোকান্তরিত হন। সুতরাং মহাভারতানুসারে জরাসন্ধ বধ ও পরীক্ষিতের মৃত্যু এই দুই ঘটনার মধ্যে ১৪+৩৬+৬০=১১০ বৎসরের অন্তর। কিন্তু, ইতি পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, বিষ্ণু পুরাণানুসারে জরাসন্ধ বধ ও পরীক্ষিতের (জন্মের) মধ্যে ৪৮৫ বৎসরের অন্তর ছিল। এখানে পূর্ব্ব প্রসূত মহাভারতের সহিত পরপ্রসূত বিষ্ণু পুরাণের বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে। এই দুই পরস্পরের বিরুদ্ধ মতের মধ্যে কোনটী প্রামাণিক ? আমাদের বিবেচনায় মহাভারতের উক্তিই সমধিক প্রামাণিক। শ্রীমদ্ভাগবতের ৯ম স্কন্ধানুসারে মগধাধিপতি জরাসন্ধের পৌত্র মার্জ্জারি বা মেঘসন্ধি মহারাজ পরীক্ষিতের সমসাময়িক। মহাভারতে দেখা যায়, জরাসন্ধের পুত্র সহদেব কুরুক্ষেত্রের সমরে অভিমন্যু হস্তে প্রাণত্যাগ করেন। ভীষ্মপর্ব্ব আশ্বমেধিক অশ্বের পশ্চাদ্ধাবনকালে সহদেব তনয় মেঘসন্ধি বা মার্জ্জারির সহিত পাণ্ডু কুলধুরন্ধর অর্জ্জুনের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই মেঘসন্ধি পরীক্ষিতের সমসাময়িক, এমন কি তিনি পরীক্ষিতের মৃত্যুর সময়েও জীবিত ছিলেন। বিষ্ণুপুরাণোক্তি সত্য হইলে, মেঘসন্ধির রাজত্বকাল অস্বাভাবিক রূপে দীর্ঘ হইয়া পড়ে। অর্থাৎ তিনি প্রায় ৪৮৫—১৪=৪৭১ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। অপর পক্ষে, মহাভারতের উক্তি গুলি সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। * এই নিমিত্ত আমরা মহাভারতের

---

* মহাভারতীয় স্ত্রীপর্ব্বের ১৬ অধ্যায়ের শেষে গান্ধারী শ্রীকৃষ্ণকে অভিশাপ দিতেছেন যে, অদ্য হইতে ৩৬ বৎসর পরে যদুবংশ ধ্বংশ হইবে।' মৌষল পর্ব্বের প্রথমাধ্যায়ের প্রারম্ভে লিখিত আছে যে, যুধিষ্ঠিরের রাজ্য কালের ষটত্রিংশ বৎসরে যুধিষ্ঠীর নানাবিধ অমঙ্গল দেখিতে পাইয়া চিন্তিত আছেন, এমন সময় সংবাদ আসিল যে, যদুবংশ ধ্বংশ হইয়াছে। আবার উক্ত অধ্যায়ের শেষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গান্ধারীর শাপ বাক্য স্মরণ করিয়া চিন্তা করিতেছেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ৩৬ বৎসর অতীত হইয়াছে, সুতরাং এক্ষণ যদুবংশ বিনাশ অনিবার্য্য।

উক্তিকেই সমধিক প্রামাণিক ও যুক্তি সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। আমাদের বিবেচনায় বিষ্ণুপুরাণের যাবত্ত পরীক্ষিতো জন্ম যাবৎ নন্দাভিষেচনং। এতদ্বর্ষ সহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরং। এই শ্লোকটী ভ্রমাত্মক। শ্রীধর স্বামী এ স্থলে টীকায় বলিয়াছেন;—বস্তুতস্তু পরীক্ষিন্নন্দয়োরন্তরং দ্বাভ্যান্যূনং বর্ষানাং সার্দ্ধ সহস্রং ভবতি। অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে পরীক্ষিৎ নন্দের মধ্যে ১৫ শত বৎসরের অন্তর। বিষ্ণুপুরাণে এই ভ্রমাত্মক শ্লোকটি কি রূপে প্রবেশ করিল? আমাদের বিবেচনায় প্রাচীন কালের অনভিজ্ঞ লিপিকরগণের প্রমাদ ও অনবধানতাই এইরূপ ভ্রমের কারণ হওয়া সম্ভব।

পঞ্চদশোত্তরং এই পাঠের পরিবর্ত্তে পঞ্চশতোত্তরং এই পাঠ যদি বিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সব গোলযোগ মিটিয়া যায়। * পঞ্চশতোত্তরং এই পাঠের পরিবর্ত্তে ভ্রম ক্রমে পঞ্চদশোত্তরং লিখিত হওয়া অসম্ভব নহে।

বিষ্ণু ও ভাগবতাদি পুরাণানুসারে পরীক্ষিতের রাজ্য কালে কলির ১২ শত বৎসর প্রবৃত্ত হইয়াছিল। মহাবংশ নামক সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থানুসারে ২৭২০ কলিগতাব্দে (৩৮১ পূঃ খ্রীঃ) চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। পৌরাণিক বংশ তালিকানুসারে চন্দ্রগুপ্তের ১৬ শত বৎসর পূর্ব্বে জরাসন্ধ বধ হয়। চন্দ্রগুপ্তের সময় ২৭২০ কলিগতাব্দ হইলে (২৭২০—১৬০০) ১১২০ কলিগতাব্দে জরাসন্ধ বধ হয়। এই ঘটনার (১৪+৩৬) ৫০ বৎসর পরে অর্থাৎ ১১৭০ কলি

* তাহাহইলে সমস্ত শ্লোকটি এইরূপ হয়; যথা :—

'যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনং
এতদ্বর্ষ সহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চশতোত্তরং॥'

অর্থাৎ পরীক্ষিতের জন্ম ও নন্দের অভিষেক পর্য্যন্ত কালের পরিমাণ ১৫ শত বৎসর (১) ১০৫৮ কলিগতাব্দ ২০৪২ পূঃ খৃঃ এবং ১১৭০ কলিগতাব্দ ১৯৩০ পূঃ খৃঃ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের কাল ২০৪২ পূঃ খৃঃ হইতে ১৯৩০ পূঃ খৃঃ পর্য্যন্ত। স্বর্গীয় ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় পাণ্ডবগণের কাল খৃঃ পূঃ ১৬ শত হইতে খৃঃ পূঃ দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

গতাব্দে পরীক্ষিতের রাজ্যারম্ভ হয়। ইহার ৬০ বৎসর পরে অর্থাৎ ১২৩০ কলিগতাব্দে পরীক্ষিতের দেহোপরম হয়। এইরূপে বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণের সহিত মহাভারত ও মহাবংশের এক বাক্যতা করিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাল (১১২০—৬৬+৪) ১০৫৮ কলিগতাব্দ ও তাঁহার ইহলোক পরিত্যাগের কাল ১১৭০ কলিগতাব্দে নিরূপিত করিতে হয়। (১)

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ও ভূতভাবন্ শ্রীকৃষ্ণের সময় নিরূপণ সম্বন্ধে এক্ষণে যে সকল উপকরণ পাওয়া যায়, তাহা অবলম্বন করিলে দুই বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া যায়। (১ম) বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণের সহিত রাজতরঙ্গিণী ও গর্গসংহিতার গণনার ঐক্য করিলে যুধিষ্ঠিরাদি কল্যব্দের ৭ম ও ৮ম শতাব্দীতে বর্ত্তমানছিলেন, সিদ্ধান্ত করিতে হয়। (২য়) আবার উক্ত পুরাণদ্বয়ের সহিত মহাভারত ও মহাবংশের গণনায় এক বাক্যতা করিলে তাঁহাদিগকে কল্যব্দের ১১শ ও ১২শ শতাব্দীর লোক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু যে গণনাই অবলম্বন করুণ না কেন, "যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম" এই শ্লোকটির বর্ত্তমান পাঠের বিশুদ্ধতা কোন ক্রমেই স্বীকার করা যাইতে পারে না। কেন স্বীকার করা যাইতে পারেনা, তাহার কারণ ইতি পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা রাজতরঙ্গিনীধৃত ও পৌরাণিক উভয়বিধ প্রমাণই উদ্ধৃত করিয়াছি। পাঠকমহাশয়গণ উভয় প্রমাণের বলাবল বুঝিয়া যাহা ইচ্ছা অবলম্বন করিতে পারেন। ফলকথা, কৃষ্ণবতার যে এই কলিযুগেই হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই।

মহাপীঠম্।

তন্ত্রচূড়ামণৌ—

ঈশ্বরউবাচ। মাতঃ পরাৎপরে দেবি সর্ব্বজ্ঞানময়ীশ্বরি।
কথ্যতাং মে সর্ব্বপীঠং শক্তীর্ভৈরব দেবতাঃ॥
দেব্যুবাচ। শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি দয়ালো ভক্তবৎসল।
যাভির্ব্বিনা ন সিধ্যন্তি জপসাধনতৎক্রিয়াঃ॥
একপঞ্চাশতং পীঠং শক্তীর্ভৈরব দেবতাঃ।
অঙ্গপ্রত্যঙ্গপাতেন বিষ্ণুচক্রক্ষতেন চ॥
মমাস্ত বপুষো দেব হিতায় ত্বয়ি কথ্যতে।
ব্রহ্মরন্ধ্রং হিঙ্গুলায়াং ভৈরবো ভীমলোচনঃ।
কোট্টরী সা মহাদেব ত্রিগুণা বা দিগম্বরী॥ ১॥
করবীরে ত্রিনেত্রং মে দেবী মহিষমর্দ্দিনী।
ক্রোধীশো ভৈরব স্তত্র॥ ২॥ সুগন্ধায়াঞ্চ নাসিকা
দেব স্ত্র্যম্বক নামা চ সুনন্দা তত্র দেবতা॥ ৩॥
কাশ্মীরে কণ্ঠদেশশ্চ ত্রিসন্ধ্যেশ্বর ভৈরবঃ।
মহামায়া ভগবতী গুণাতীতা বরপ্রদা॥ ৪॥
জ্বালামুখ্যাং মহাজিহ্বা দেব উন্মত্তভৈরবঃ।
অম্বিকা সিদ্ধিদা নাম্নী॥ ৫॥ স্তনং জালন্ধরে মম
ভীষণো ভৈরব স্তত্র দেবী ত্রিপুরমালিনী॥ ৬॥
হৃদ্যপীঠং বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথস্ত ভৈরবঃ।
দেবতা জয়দুর্গাখ্যা॥ ৭॥ নেপালে জানু মে শিব।
কপালী ভৈরবঃ শ্রীমান্ মহামায়া চ দেবতা॥ ৮॥
মানবে দক্ষহস্তং মে দেবী দাক্ষায়ণী হর।
অমরো ভৈরব স্তত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ॥ ৯॥
উৎকলে নাভিদেশস্ত বিরজা ক্ষেত্র মুচ্যতে।

বিমলা সা মহাদেবী জগন্নাথ স্তু ভৈরবঃ ॥ ১০ ॥
গণ্ডক্যাং গণ্ডপাতশ্চ তত্র সিদ্ধি র্ন সংশয়ঃ।
তত্র সা গণ্ডকী চণ্ডী চক্রপাণি স্তু ভৈরবঃ ॥ ১১ ॥
বহুলায়াং বামবাহু র্বহুলাখ্যা চ দেবতা।
ভীরুকো ভৈরব স্তত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ ॥ ১২ ॥
উজ্জয়িন্যাং কূর্পরঞ্চ মাঙ্গল্যঃ কপিলাম্বরঃ।
ভৈরবঃ সিদ্ধিদঃ সাক্ষা দ্দেবী মঙ্গল চণ্ডিকা ॥ ১৩ ॥
চট্টলে দক্ষ বাহু র্মে ভৈরবশ্চন্দ্রশেখরঃ।
ব্যক্তরূপা ভগবতী ভবানী তত্র দেবতা ॥
বিশেষতঃ কলিযুগে বসামি চন্দ্রশেখরে ॥ ১৪ ॥
ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবী ত্রিপুর সুন্দরী।
ভৈরব স্ত্রিপুরেশ শ্চ সর্ব্বাভীষ্ট প্রদায়কঃ ॥ ১৫ ॥
ত্রিস্রোতায়াং বামপাদো ভ্রামরী ভৈরবেশ্বরঃ ॥ ১৬ ॥
যোনিপীঠং কামগিরৌ কামাখ্যা তত্র দেবতা।
যত্রাস্তে মাধবঃ সাক্ষাদুমানন্দোথ ভৈরবঃ।
সর্ব্বদা বিরহে দেবী তত্র মুক্তি র্ন সংশয়ঃ।
তত্র শ্রীভৈরবী দেবী তত্র নক্ষত্রদেবতা।
প্রচণ্ডচণ্ডিকা তত্র মাতঙ্গী ত্রিপুরাম্বিকা।
বগলা কমলা তত্র ভুবনেশী সধূমিনী।
এতানি নবপীঠানি সংশন্তি বরভৈরবাঃ ॥
সর্ব্বত্র বিরলা চাহং কামরূপে গৃহে গৃহে।
গৌরীশিখর মারুহ্য পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥
করতোয়াং সমারভ্য যাবদ্দিক্করবাসিনী।
শতযোজনবিস্তারং ত্রিকোণং সর্ব্বসিদ্ধিদং।
দেবা মরণ মিচ্ছন্তি কিং পুন র্মানবাদয়ঃ ॥ ১৭ ॥
অঙ্গুলীবৃন্দং হস্তস্য প্রয়াগে ললিতা ভবঃ ॥ ১৮
জয়ন্ত্যাং বামজঙ্ঘাচ জয়ন্তী ক্রমদীশ্বরঃ ॥ ১৯
ভূতধাত্রী মহামায়া ভৈরবঃ ক্ষীরকণ্ঠকঃ।

যুগাদ্যা সা মহামায়া দক্ষাঙ্গুষ্ঠঃ পদোমম॥ ২০ ॥
নকুলীশঃ কালীপীঠে দক্ষপাদাঙ্গুলী যুচ॥ ২১ ॥
ভুবনেশী সিদ্ধিরূপা কিরীটস্থা কিরীটতঃ।
দেবতা বিমলা নাম্নী সম্বর্ত্তো ভৈরব স্তথা॥ ২২ ॥
বারাণস্যাং বিশালাক্ষী দেবতা কালভৈরবঃ।
মণিকর্ণীতি বিখ্যাতা কুণ্ডলঞ্চ মম শ্রুতেঃ॥ ২৩ ॥
কাল্যাশ্রমে চ মে পৃষ্ঠং নিমিষো ভৈরব স্তথা।
শর্ব্বাণী দেবতা তত্র॥ ২৪ ॥ কুরুক্ষেত্রে চ গুলফতঃ।
স্থাণু নাম্নী চ সাবিত্রী অশ্বনাথস্তু ভৈরবঃ॥ ২৫ ॥
মণিবন্ধে চ গায়ত্রী সর্ব্বানন্দ স্তু ভৈরবঃ॥ ২৬ ॥
শ্রীশৈলে চ মম গ্রীবা মহালক্ষী স্তু দেবতা।
ভৈরবঃ সম্বরানন্দো দেশে দেশে ব্যবস্থিতঃ॥ ২৭ ॥
কাঞ্চী দেশে চ কঙ্কালো ভৈরবো রুরু নামকঃ।
দেবতা দেবগর্ভাখ্যা॥ ২৮ ॥ নিতম্বঃ কালমাধবে।
ভৈরব শ্চাসিতাঙ্গ শ্চ দেবী কালী সুসিদ্ধিদা।
দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা নমস্কৃত্বা মন্ত্র সিদ্ধি মবাপ্নুয়াৎ॥ ২৯ ॥
শোণাখ্যে ভদ্রসেনস্তু নর্ম্মদাখ্যা নিতম্বকে॥ ৩০ ॥
রামগিরৌ তথা নালা শিবানী চণ্ডভৈরবঃ॥ ৩১ ॥
বৃন্দাবনে কেশজাল উমানাম্নী চ দেবতা।
ভূতেশো ভৈরব স্তত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ॥ ৩২ ॥
সংহারাখ্য ঊর্দ্ধদন্তে দেবী নারায়ণী শুচৌ॥ ৩৩ ॥
অধোদন্তে মহারুদ্রো বারাহী পঞ্চসাগরে॥ ৩৪ ॥
করতোয়াতটে তল্পং বামে বামন ভৈরবঃ।
অপর্ণা দেবতা তত্র ব্রহ্মরূপা করোদ্ভবা॥ ৩৫ ॥
শ্রীপর্ব্বতে দক্ষগুলফং তত্র শ্রীসুন্দরী পরা।
সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরা সর্ব্বা সুনন্দানন্দ ভৈরবঃ॥ ৩৬ ॥
কপালিনী ভীমরূপা বামগুলফং বিভাসকে।
ভৈরবশ্চ মহাদেব। সর্ব্বানন্দঃ শুভপ্রদঃ॥ ৩৭ ॥

উদরঞ্চ প্রভাসে মে চন্দ্রভাগা যশস্বিনী।
বক্রতুণ্ডোভৈরবশ্চো॥ ৩৭ ॥ র্দ্ধোষ্ঠে ভৈরবপর্ব্বতে।
অবন্ত্যাঞ্চ মহাদেবী লম্বকর্ণস্তু ভৈরবঃ॥ ৩৮ ॥
চিবুকে ভ্রামরী দেবী চিবুকাখ্যা জলে স্থলে।
ভৈরবঃ সর্ব্বসিদ্ধীশ স্তত্র সিদ্ধিরনুত্তমা॥ ৩৯ ॥
গণ্ডো গোদাবরীতীরে বিশ্বেশী বিশ্বমাতৃকা।
দণ্ডপাণি র্ভৈরবঞ্চ॥ ৪০ ॥ বামগণ্ডেতু রাকিনী।
ভৈরবো বৎসনাভশ্চ তত্র সিদ্ধিনসংশয়ঃ॥ ৪১ ॥
রত্নাবল্যাং দক্ষস্কন্ধে কুমারী ভৈরবঃ শিবঃ॥ ৪২ ॥
মিথিলায়াং মহাদেবী বামস্কন্ধে মহোদরঃ॥ ৪৩ ॥
নলহট্ট্যাং নলাপাতো যোগীশো ভৈরবস্তথা।
তত্র সা কালিকা দেবী সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িকা॥ ৪৪ ॥
কালীঘট্টে মুণ্ডপাতঃ ক্রোধীশো ভৈরবস্তথা।
দেবতা জয়দুর্গাখ্যা নানাভোগপ্রদায়িনী॥ ৪৫ ॥
বক্রেশ্বরে মনঃপাতো বক্রনাথস্তু ভৈরবঃ।
নদীপাপহরা তত্র দেবী মহিষমর্দ্দিনী॥ ৪৬ ॥
যশোরে পাণিপদ্মঞ্চ দেবতা যশোরেশ্বরী।
চণ্ডশ্চ ভৈরবস্তত্র যত্র সিদ্ধি মবাপ্নুয়াৎ॥ ৪৭ ॥
অট্টহাসে চৌষ্ঠপাতো দেবী সা ফুল্লরা স্মৃতা।
বিশ্বেশো ভৈরবস্তত্র সর্ব্বাভীষ্ট প্রদায়কঃ॥ ৪৮ ॥
হারপাতো নন্দিপুরে ভৈরবো নন্দিকেশ্বরঃ।
নন্দিনী সা মহাদেবী তত্র সিদ্ধি র্ন সংশয়ঃ॥ ৪৯ ॥
লঙ্কায়াং নূপুরঞ্চৈব ভৈরবো রাক্ষসেশ্বরঃ।
ইন্দ্রাক্ষী দেবতা তত্র ইন্দ্রেনোপাসিতা পুরা॥ ৫০ ॥
বিরাটদেশমধ্যেতু পাদাঙ্গুলিনিপাতনং।
ভৈরবশ্চামৃতাখ্যশ্চ দেবী তত্রাম্বিকা স্মৃতা॥ ৫১ ॥
অন্যান্তে কল্পিতাঃপুত্র পীঠনাথাদি দেবতাঃ।
পুত্রক্ষেত্রাধীশং বিনা দেব মেচ্ছাস্বদেবতাং।

ভৈরবৈ হ্রিয়তে সর্ব্বং জপপূজাদিসাধনং।।
অজ্ঞাত্বা ভৈরবং পীঠং পীঠশক্তিঞ্চ শঙ্কর।
প্রাণনাথ ন সিধ্যেত্তু কল্পকোটি জপাদিভিঃ।।

মহাদেব বলিলেন——পরাৎপরে দেবি সর্ব্বজ্ঞানময়ি ঈশ্বরি মাতঃ! সমস্ত পীঠ এবং সেই সমস্ত পীঠের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি ও তাঁহাদিগের ভৈরবগণের বিবরণ আমাকে বল।

দেবি বলিলেন——বৎস! তুমি ভক্তবৎসল ও দয়ালু অতএব তোমাকে সবিশেষ বলিতেছি শ্রবণ কর। যে সকল দেবতার অভিজ্ঞান ব্যতীত জপ সাধনাদি ক্রিয়া সিদ্ধ হয় না, একপঞ্চাশত মহাপীঠ, সেই সকল পীঠের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি একপঞ্চাশত এবং তাঁহাদিগের ভৈরবও এক এক পঞ্চাশত। দেব! বিষ্ণুচক্র পরিকৃত্ত আমার এই (নিত্যচিন্ময়) দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গপাতে যেরূপে মহাপীঠের সৃষ্টি হইয়াছে, ত্রৈলোক্য কল্যাণবিধান জন্য আমি তোমার নিকটে তাহা সবিশেষ কীর্ত্তন করিতেছি।

হিঙ্গুলায় আমার ব্রহ্মরন্ধ্রপাত হইয়াছে, তথাতে ভীমলোচন নামে ভৈরব অধিষ্ঠিত, ত্রিগুণময়ী দিগাম্বরী দেবী তথাতে কোট্টরী নামে প্রসিদ্ধ।। ১।। করবীরপুরে আমার ত্রিনেত্রপাত হয়, তথাতে দেবীর নাম মহিষমর্দ্দিনী ও ভৈরবের নাম ক্রোধীশ ।। ২।। সুগন্ধা নগরীতে আমার নাসিকা পাত হয়; তথাতে ভৈরবের নাম ত্র্যম্বক, দেবীর নাম সুনন্দা।। ৩। কাশ্মীরে আমার কণ্ঠদেশ পতিত হয়, তথায় ভৈরবের নাম ত্রিসন্ধ্যেশ্বর; গুণাতীতা হইয়াও মহামায়া বরদা, তথাতে ভগবতী নামে অভিহিতা। ৪। জ্বালামুখীতে আমার জিহ্বা পাত হয়; তথাতে দেবের নাম উন্মত্তভৈরব, অম্বিকার নাম সিদ্ধিদা। ৫। জালন্ধরে আমার স্তন পাত হয়, তথাতে ভীষণ নামে ভৈরব অধিষ্ঠিত, দেবীর নাম ত্রিপুরমালিনী।৬। বৈদ্যনাথক্ষেত্র আমার হৃদয়পীঠ; তথাতে ভৈরব বৈদ্যনাথ, দেবী জয়দুর্গা। ৭। নেপালে আমার জানু পাত হয়; তথাতে কপালী নামে ভৈরব অবস্থিত; দেবীর নাম মহামায়া। ৮। মানবক্ষেত্রে আমার দক্ষিণ হস্ত পাত হয়, তথাতে দেবী দাক্ষায়ণী নামে অধিষ্ঠিতা এবং

অমর নামক ভৈরব তথাতে সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়ক। ৯। উৎকলে আমার নাভীদেশ পতিত হয়, সেই ক্ষেত্রের নাম বিরজা ক্ষেত্র; মহাদেবী তথাতে বিমলা নামে অধিষ্ঠীতা, জগন্নাথ তাঁহার ভৈরব। ১০। গণ্ডকী নদীতে আমার গণ্ডপাত হয়, তথাতে সাধকের সিদ্ধি নিঃসংশয়। চণ্ডী তথাতে গণ্ডকী নামে অধিষ্ঠিতা, ভৈরবের নাম চক্রপাণি। ১১। বহুলায় আমার বামবাহুপাত হয়; তথায় দেবীর নাম বহুলা, ভীরুক নামে ভৈরব তথাতে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক। ১২। উজ্জয়িনীতে আমার কূর্পর [বাহু সন্ধির নিম্ন হইতে করতল পর্য্যন্ত] পতিত হয়, কপিলাম্বর নামে ভৈরব তথাতে মঙ্গলপ্রদ ও সাক্ষাৎ সিদ্ধিদায়ক, দেবীর নাম মঙ্গলচণ্ডিকা। ১৩। চট্টলে আমার দক্ষবাহু পাত হয়; চন্দ্রশেখর তথাতে ভৈরব, ভবানী নামে ভগবতী তথাতে ব্যক্তরূপা. বিশেষতঃ কলিযুগে আমি চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে নিয়ত বাস করি। ১৪। ত্রিপুরা ক্ষেত্রে আমার দক্ষিণপাদ পতিত হয়; তথাতে দেবীর নাম ত্রিপুরসুন্দরী, ভৈরব তথাতে ত্রিপুরেশ্বর নামে সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়ক। ১৫। ত্রিস্রোতা নদীতে আমার বামপাদ পতিত হয়; তথাতে দেবীর নাম ভ্রামরী, ভৈরবের নাম ঈশ্বর। ১৬। কামপর্ব্বতে আমার যোনিপীঠ পতিত হয়, তথাতে দেবীর নাম কামাখ্যা; যে পর্ব্বতে ত্রিগুণাতীতা হইয়াও আমি রক্তপাষাণরূপিণী. যে স্থানে সাক্ষাৎ হয়গ্রীব মাধব এবং উমানন্দ নামে ভৈরব অবস্থিত, যে ক্ষেত্রে দেবী মোক্ষদার নিত্যবিহার, সেই নিত্য-প্রত্যক্ষ প্রভাবময় ক্ষেত্রে জীবের মুক্তি নিঃসংশয়. তথাতে শ্রীভৈরবী, নক্ষত্র, দেবতা প্রচণ্ডচণ্ডিকা, (ছিন্নমস্তা) মাতঙ্গী ত্রিপুরাম্বিকা, [ষোড়শী] বগলা, কমলাম্বিকা, ভুবনেশ্বরী এবং ধুমাবতী, বটুভৈরবগণ এই নবপীঠের কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আমি সর্ব্বত্র বিরলা হইলেও কামরূপ ক্ষেত্রে গৃহে গৃহে [শক্তিরূপে] অধিষ্ঠিতা। একবার এই গৌরীশিখর আরোহণ করিলে জীবের আর পুনর্জ্জন্ম নাই। করতোয়া হইতে আরম্ভ করিয়া দিকরবাসিনী দেবীর অধিষ্ঠান স্থান পর্য্যন্ত এই শতযোজন বিস্তৃত ত্রিকোণ-ক্ষেত্রে সাধকের সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ। এই স্থানে স্বয়ং দেবগণও মুক্তি কামনায় মৃত্যু ইচ্ছা করেন, মানবাদি জীব যে ক্ষেত্রে মৃত্যু প্রার্থনা করিবে, ইহার আর বলিবার কি আছে? । ২৭।

প্রয়াগে আমার হস্তের অঙ্গুল বৃন্দ পতিত হয়; তথাতে দেবীর নাম ললিতা, ভৈরবের নাম ভব। ১৮। জয়ন্তীক্ষেত্রে আমার বামজঙ্ঘা পতিত হয়, তথাতে দেবীর নাম জয়ন্তী ভৈরবের নাম ক্রমদীশ্বর। ১৯। যে স্থানে আমার দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠ পতিত হয়, (ক্ষীরগ্রাম); তথাতে ভৈরবের নাম ক্ষীরকণ্ঠ এবং দেবীর নাম যুগাদ্যা। ২০। কালীপীঠে (কালীঘাটে) আমার দক্ষিণচরণের অঙ্গুলিদল নিপতিত হয়; তথাতে ভৈরব নকুলেশ্বর, দেবীর নাম কালী। ২১। কিরীটদেশে আমার কিরীট পাত হয়; সিদ্ধিরূপিণী ভুবনেশ্বরী তথাতে বিমলা নামে অধিষ্ঠিতা, ভৈরবের নাম সম্বর্ত্ত। ২২। বারাণসীতে যে স্থলে আমার কর্ণ হইতে মণিময় কুণ্ডল পতিত হয়, সেই স্থানের নাম মনিকর্ণিকা। তথাতে দেবীর নাম বিশালাক্ষী, ভৈরবের নাম কালভৈরব। ২৩। কালিকাশ্রমে আমার পৃষ্ঠদেশ পতিত হয়, তথাতে ভৈরবের নাম নিমিষ, দেবীর নাম শর্ব্বাণী। ২৪। কুরুক্ষেত্রে আমার গুল্‌ফ পাত হয়; তথাতে সাবিত্রীরূপা দেবীর নাম স্থাণু, ভৈরবের নাম অশ্বনাথ। ২৫। মণিবন্ধে আমার মণিবন্ধ পাত হয়; তথাতে দেবীর নাম গায়ত্রী, ভৈরবের নাম সর্ব্বানন্দ। ২৬। শ্রীপর্ব্বতে আমার গ্রীবা পাত হয়; তথাতে দেবীর নাম মহালক্ষ্মী, ভৈরবের নাম সুন্দরানন্দ। কাঞ্চীদেশে আমার কঙ্কাল পাত হয় তথাতে ভৈরবের নাম রুরু, দেবীর নাম দেবগর্ভা। ২৮। কালমাধবে আমার নিতম্ব পাত হয়, তথাতে ভৈরবের নাম অসিতাঙ্গ, সিদ্ধিদায়িনী দেবীর নাম কালী। দেবীকে সেই স্থানে পুনঃ পুনঃ দর্শন এবং প্রণাম করিয়া সাধক মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিবেন। ২৯। শোণনদে আমার নিতম্ব পাত হয়। তথাতে ভৈরবের নাম ভদ্রসেন, দেবীর নাম নর্ম্মদা। ৩০। রামগিরিতে (চিত্রকূট পর্ব্বতে) আমার নালা (স্তনাস্থি) পতিত হয়, তথাতে দেবীর নাম শিবানী, ভৈরবের নাম চণ্ডভৈরব। ৩১। বৃন্দাবনে আমার কেশজাল পতিত হয়; তথাতে দেবী উমানামে অধিষ্ঠিতা এবং ভূতেশ নামে ভৈরব তথাতে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক। ৩২। শুচিনামক দেশে আমার উৰ্দ্ধদন্ত পাত হয়, তথাতে দেবীর নাম নারায়ণী, ভৈরবের নাম সংহারভৈরব। ৩৩। পঞ্চসাগরে আমার অধোদন্ত পতিত হয়, তথাতে ভৈরবের নাম মহারুদ্র।

দেবীর নাম বারাহী। ৩৪। করতোয়ানদীর বামতটে আমার তল্প [শয্যা; এস্থলে তল্প বা শয্যা শব্দে পরিধেয়, উত্তরীয় অথবা আসনাদি ই বুঝিতে হইবে] পতিত হয়; তথাতে ভৈরবের নাম বামন, দেবীর নাম অপর্ণা এবং তথাতে করতোয়া নদীও ব্রহ্মরূপিণী। ৩৫। শ্রীপর্ব্বতে আমার দক্ষিণগুলফ পতিত হয়; তথাতে সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরী সর্ব্বেশ্বরী পরাৎপরা শ্রীসুন্দরীর নাম সুনন্দা, ভৈরবের নাম নন্দভৈরব। ৩৬। বিভাসে আমার বামগুলফ পতিত হয়, তথাতে ভীমরূপা দেবীর নাম কপালিনী, সর্ব্বমঙ্গল প্রদ ভৈরবের নাম সর্ব্বানন্দ। ৩৭। প্রভাসে আমার উদরদেশ পতিত হয়; তথাতে দেবীর নাম চন্দ্রভাগা ও যশস্বিনী, ভৈরবের নাম বক্রতুণ্ড। ৩৮। অবন্তীদেশে ভৈরব পর্ব্বতে আমার উর্দ্ধওষ্ঠ পতিত হয়; তথাতে দেবীর নাম মহাদেবী, ভৈরবের নাম লম্বকর্ণ।৩৯। চিবুকদেশে জলে স্থলে উভয় ভাগে আমার চিবুক পাত হয়; তথাতে দেবী ভ্রামরীর নাম [illegible]চুকা, ভৈরবের নাম সর্ব্বসিদ্ধীশ। এই মহাপীঠে সাধক সর্ব্বোত্তম সিদ্ধি লাভ করেন। ৪০। গোদাবরী নদীতীরে যেস্থানে আমার দক্ষিণ গণ্ডপাত হয়,তথাতে দেবীর নাম বিশ্বেশ্বরী ও বিশ্বমাতৃকা,ভৈরবের নাম দণ্ডপাণি। যেস্থানে আমার বামগণ্ড পাত হয়, তথাতে দেবীর নাম রাকিণী ভৈরবের বৎস-নাভ। সাধক তথাতে নিঃসংশয় সিদ্ধিলাভ করেন।৪১ ১।৪১-২ রত্নাবলী প্রদেশে আমার দক্ষিণস্কন্ধ পতিত হয়; তথাতে দেবীর নাম কুমারী, ভৈরবের নাম শিব। ৪২। মিথিলায় আমার বামস্কন্ধ পাত হয়; তথাতে দেবীর নাম মহাদেবী, ভৈরবের নাম মহোদর। ৪৩। নলহাটীতে আমার নলা পাত হয়, তথাতে ভৈরবের নাম যোগীশ এবং সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়িনী দেবীর নাম কালিকা। ৪৪। কালীঘাটে আমার মস্তক পতিত হয়, তথাতে ভৈরবের নাম ক্রোধীশ, দেবীর নাম জয়দুর্গা। ৪৫। বক্রেশ্বরে আমার মনঃ (ভ্রূমধ্য) পতিত হয়, তথাতে ভৈরবের নাম বক্রনাথ, দেবীর নাম [illegible] বমর্দিনী এবং তত্রত্য নদী পাপহরা। ৪৬। যশোরে আমার পানিপদ্ম পতিত হয়, তথাতে দেবীর নাম যশোরেশ্বরী এবং ভৈরবের নাম চণ্ড। সেই মহাপীঠে সাধক অবশ্য সিদ্ধি লাভ করেন। ৪৭। অট্টহাসে আমার ওষ্ঠ পাত হয়, তথাতে দেবীর নাম ফুল্লরা

এবং সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়ক ভৈরবের নাম বিশ্বেশ্বর। ৪৮। নন্দিপুরে আমার কণ্ঠহার পতিত হয়, তথাতে ভৈরবের নাম নন্দিকেশ্বর এবং দেবীর নাম নন্দিনী এই স্থানে সিদ্ধি নিঃসংশয়। ৪৯। লঙ্কায় আমার নূপুর পতিত হয়; তথাতে ভৈরবের নাম রাক্ষসেশ্বর এবং দেবীর নাম ইন্দ্রাক্ষী। ইনি পূর্ব্বকালে ইন্দ্র কর্ত্তৃক উপাসিতা হইয়াছিলেন। ৫০। বিরাট দেশের মধ্যস্থলে আমার পদাঙ্গুলিসকল নিপতিত হয়; সেস্থানে ভৈরবের নাম অমৃত এবং দেবীর নাম অম্বিকা। ৫১। পুত্র! এই সকল মহাপীঠে যাহারা পীঠের অধিনাথ ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, তাঁহারা কথিত হইলেন॥ দেব! এই সকল পীঠক্ষেত্রের অধীশ্বর ও অধীশ্বরীকে পূজা না করিয়া পীঠক্ষেত্রে অন্য দেবতার [পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্যতীত অন্যমূর্ত্ত দেবতার] যিনি পূজা করেন, তাঁহার জপ পূজাদি সমস্ত সাধনই ভৈরবগণকর্ত্তৃক অপহৃত হয়। পীঠ, পীঠের অধিষ্ঠাতা ভৈরব এবং পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম ও তত্ত্ব না জানিয়া সেই পীঠে নিজ ইষ্ট দেবতার উপাসনা করিলে, প্রাণনাথ! কোটিকল্প কাল ব্যাপিয়া জপাদির অনুষ্ঠান করিলেও সাধকের সিদ্ধি হইবে না॥

পতির প্রতি পত্নীর ব্যবহার।

স্ত্রীলোকের পতি অপেক্ষা প্রিয়তর ও গুরুতর আর কেহই নাই।

স্বামী কর্ত্তাচ হর্ত্তাচ শাস্তা পোষ্টাচ রক্ষিতা।
অভীষ্ট দেব পূজ্যশ্চ নগুরুঃ স্বামিনঃ পরঃ॥

স্ত্রীলোকের স্বামীই কর্ত্তা, হর্ত্তা, শাস্তা, পোষ্টা ও রক্ষিতা এবং স্বামীর তুল্য অভিষ্টদেব ও পূজনীয় কেহনাই এবং স্বামী অপেক্ষে গুরুও কেহ নাই।

ব্র বৈ পু ৯।১৫।১৫।

ভরণাদেব ভর্ত্তারং পালনাৎ পতিরুচ্যতে।
শরীরেশাচ্চ সঃ স্বামী কামদাৎ কান্তএবচ॥

বন্ধুশ্চ সুখবর্দ্ধাচ্চ প্রীতিদানাৎ প্রিয়ঃ পরঃ।
ঐশ্বর্য্য দানদীশশ্চ প্রাণেশাৎ প্রাণ নাথকঃ॥
রতিদানাচ্চ রমণঃ প্রিয়োনাস্তি প্রিয়াৎ পরঃ।
পুত্রস্ত স্বামিনঃ শুক্রাজ্জায়তে তেন সপ্রিয়ঃ॥

পতি ভরণ কর্ত্তা, বলিয়া ভর্ত্তা, পালন কর্ত্তা বলিয়া পতি, শরীরের ঈশ্বর বলিয়া স্বামী, কামদাতা বলিয়া কান্ত, সুখবর্দ্ধন বলিয়া বন্ধু, প্রীতি দাতা বলিয়া প্রিয়, ঐশ্বর্য্যদাতা বলিয়া ঈশ, প্রাণের ঈশ্বর বলিয়া প্রাননাথ এবং রতিদাতা বলিয়া রমণ নামে কীর্ত্তিত হয়। পতিভিন্ন নারীর প্রিয়তম কেহই নাই এবং পুত্র পতির শুক্র হইতে উৎপন্ন হয়, এই কারণে পুত্রই প্রিয়বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়॥

ব্র—বৈ—পু—২।৫৭।২৪-২৬।

শতপুত্রাৎ পরঃস্বামী কুলজানাং প্রিয়ঃসদা।
অসৎকুলপ্রসূতা যা কান্তং বিজ্ঞাতু মক্ষমা॥

কুলস্ত্রীগণের পতি শতপুত্র অপেক্ষা সর্ব্বদা পরম প্রিয় বলিয়া উক্তহয়েন, কিন্তু যে নারী অসৎ কুলোদ্ভবা, সে পতি যে অমূল্যরত্ন তাহা কোন ক্রমেই পরিজ্ঞাত হইতে সক্ষম হয় না।

ব্র—বৈ—পু—২।৪২।২৭।

শতন্ত্রী বিদ্যতেবীণা নাচক্রোবিদ্যতে রথঃ।
নাপতিঃসুখমেধেত যা স্যাদপি শতাত্মজা॥

তন্ত্রীশূন্য বীণা যেমন বাজিতে পারেনা, এবং চক্রশূন্য রথও যেমন চলিতেপারে না, তেমনি স্বামী যদি না থাকেন, শত পুত্রের জননী হইলেও স্ত্রীলোকের সুখোৎপত্তি হইতে পারে না।

বা—রা—২।৩৯।২৯।

মিতংদদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ।
অমিতস্য তু দাতারং ভর্ত্তারং কা ন পূজয়েৎ॥

কি পিতা, কি ভ্রাতা, কি পুত্র, সকলেই পরিমিত দান করেন; একমাত্র স্বামীই অপরিমিত দান করিয়া থাকেন; অতএব কোন রমনী স্বামীর পূজা না করিবেন।

ভর্ত্তা হি পরমং নার্য্যা ভূষণং ভূষণৈর্ব্বিনা।
এষাবিরহিতা তেনশোভনাপি ন শোভনা॥

অলঙ্কার বিহীনা নারী গণের পতিই উৎকৃষ্টাভরণ, কিন্তু পতি বিরহিত নারী শোভনা হইলেও শোভনা নহে।

হি—উ।

যা স্ত্রী ভর্ত্তুরসৌভাগ্যা মন্দাভাগ্যা চ সর্ব্বতঃ।
শয়নে ভোজনেতস্যা ন সুখং জীবনং বৃথা॥

যে নারী পতির সৌভাগ্যলাভে বঞ্চিতা, সে সর্ব্বোতভাবে অভাগ্যবতী তাহার শয়নে ভোজনে কিছুমাত্র সুখনাই, সুতরাং তাহার জীবন ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র।

ব্র—বৈ—পু—৪।৫৭।৭।

যস্যা নাস্তি প্রিয়প্রেম তস্যা জন্ম নিরর্থকং।
তৎকিংপুত্রে ধনেরূপে সম্পত্তৌ যৌবনেঽথবা॥

যেনারী প্রিয়পতির প্রেমলাভ করিতে না পারে, তাহার জন্ম বিফল পুত্রধন রূপ সম্পত্তি, অথবা যৌবনে তাহার কোন সুখ নাই।

ঐ ৮।

কাচিদেবহি জানাতি মহা সাধ্বী চ স্বামিনং।
অতিশস্তাংশ জাতা চ সুশীলা কুলপালিকা॥

কুলপালিকা সুশীলা মঙ্গলদায়িনী, অতি শক্তিতা সাধ্বীনারীর সংখ্যা অতি স্বল্প, যে কেহ আছেন তিনিই পতির মহিমা জানেন॥

ঐ ১২।

অসত্যংশ প্রসূতা যা দুঃশীলা ধর্ম্ম বর্জ্জিতাঃ।
মুখদুষ্টা যোনী দুষ্টা পতিং নিন্দন্তি কোপতঃ॥

যে নারীগণ অসত্যংশজাতা, দুঃশীলা, ধর্ম্মবর্জ্জিতা, মুখদুষ্টা যোনীদুষ্টা সুতরাং অমঙ্গল দায়িনী, তাহারাই কোপবশতঃ পতিনিন্দা করে॥

ব্র-বৈ-পু-৪।৫৭।১৩।

অসদ্বংশ প্রজাতাহ্যা দুঃশীলা জ্ঞানবর্জ্জিতা।
স্বামিনং মন্যতেনাসৌ পিত্রোর্দ্দোষেণ কুৎসিতা॥

যে সকল রমণী অসদ্বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ব্যাভিচারিণী, ধর্ম্মজ্ঞান-বর্জ্জিত ও পিতৃ মাতৃ দোষে নিতান্ত ঘৃণিত হয়, তাহারাই পতির অবমাননা করিয়া থাকে ॥

ব্র-বৈ-পু ৩।৪৪।১২।

কুৎসিতং পতিতং মূঢ় দরিদ্রং রোগিনং জড়ং।
কুলজা বিষ্ণুতুল্যঞ্চ কান্তং পশ্যতি সন্ততং ॥

যে সকল কামিনী সদ্বংশজাতা, তাহারা স্বামী কুৎসিত হউক, পতিত হউক, মূঢ় হউক, দরিদ্র হউক, রোগী হউক বা জড়ই হউক, কথনই পতির অবমাননা করেন না। প্রত্যুত তাহারা পতিকে সততবিষ্ণু তুল্য মোহনমূর্ত্তি জ্ঞান করিয়া থাকেন।

ঐ ১৩।

বিশীলঃকামবৃত্তোবা গুণৈর্বা পরিবর্জ্জিতঃ।
উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎপতিঃ ॥

পতি দুঃশীল বা কামুক বা গুণহীন হইলেও সাধ্বী স্ত্রীলোক কর্তৃক সতত দেববৎ আরাধনীয় হয়।

ম-সং ৫।১৫৪

(পতি সেবাভিন্ন স্ত্রীলোকের অন্য কোন সৎকার্য্য নাই)

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষণং।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে ॥

স্বামী ব্যতিরিক্ত স্ত্রীলোকের পৃথগ্ রূপ কোন যজ্ঞ নাই, ব্রত নাই এবং উপবাসও নাই, কিন্তু কেবল পতি শুশ্রূষা দ্বারা স্ত্রীলোক স্বর্গে পূজনীয়া হয়।

ম-সং ৫।১৫৫।

ন তীর্থসেবা নারীণাং নোপবাসাদিকাঃ ক্রিয়া
নৈব ব্রতানাং নিয়মোভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং বিনা ॥

রমণীগণের পক্ষে পতি শুশ্রূষা ব্যতিরেকে তীর্থ যাত্রার বিধান স্নান উপবাসাদি ক্রিয়ার বিধান নাই এবং ব্রতানুষ্ঠানেরও নিয়ম নাই ॥

ম নি-ত ৮।১০০।

ভর্ত্তৈব যোষিতাং তীর্থং তপোদানং ব্রতং গুরুঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা নারী পতি সেবাং সমাচরেৎ ॥

নারীগণের স্বামীই তীর্থ, স্বামীই তপস্যা, স্বামীই দান, স্বামীই ব্রত ও স্বামীই গুরু, অতএব নারীগণ সর্ব্বতোভাবে স্বামীর সেবা করিবে।

ঐ ৮।১০১।

জপস্তপস্তীর্থযাত্রা প্রব্রজ্যা মন্ত্রসাধনং।
দেবতারাধনঞ্চৈব স্ত্রীশূদ্র পতনানি ষট্ ॥

জপ, তপস্যা, তীর্থযাত্রা, সন্ন্যাস, মন্ত্রসাধন, ও দেবতারাধনা, এই ষট্ কর্ম্মদ্বারা স্ত্রী ও শূদ্রজাতি পতিত হয়।

অত্রি সং।

তীর্থ স্নানার্থিনী নারী পতি পাদোদকং পিবেৎ।
শঙ্করস্যাপি বিষ্ণোর্ব্বা প্রয়াতি পরমং পদং ॥

তীর্থস্নানাকাঙ্খা নারী নিজপতির পাদোদক পান করিবেন, তাহাতে তিনি শিবলোক অথবা বিষ্ণুলোকে পরমপদ প্রাপ্ত হইবেন ॥

সর্ব্বপুণ্যস্বরূপশ্চ পতিরূপী জনার্দ্দনঃ।
যা সতী ভর্ত্তুরুচ্ছিষ্টং ভুংক্তে পাদোদকং সদা।
তস্যা দর্শনমুস্পর্শং নিত্যং বাঞ্ছতি দেবতা।
ততঃ সর্ব্বাণিতীর্থানি পুনন্তি পাপিনো ভয়াৎ ॥

যে সাধ্বী রমণী পতিকে সর্ব্বপুণ্য ও জনার্দ্দন স্বরূপ জ্ঞানকরতঃ নিত্য তাঁহার উচ্ছিষ্ট ও চরণোদক পানকরে, দেবগণ সর্ব্বদা তাহার দর্শন ও স্পর্শ করিবার বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। আর সেই পবিত্রা রমণীর স্পর্শে তীর্থ সমুদায় পাপীগণের স্পর্শভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকে।

ব্র বৈ পু ৪.৫৭।২০-২১।

স্নানঞ্চ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্ব যজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
প্রাদক্ষিণ্যং পৃথিব্যাশ্চ সর্ব্বাণি চ তপাংসি চ

সর্ব্বাণ্যেব ব্রতানীতি মহাদানানি যানি চ।
উপোষণানি পুণ্যানি যান্যন্যানি চ বিশ্বতঃ।
গুরুসেবা বিপ্রসেবা দেবসেবাদিকঞ্চ যৎ।
স্বামীনঃ পদসেবায়াঃ কলাং ন্যা ইতি ষোড়শীং॥

নারী পতির চরণ সেবারদ্বারা যে ফললাভকরে, সর্ব্বতীর্থে স্নান, সর্ব্ব যজ্ঞেদীক্ষা, পৃথিবী প্রদক্ষিণ, সর্ব্বতপস্যা, সমস্ত ব্রত, মহাদানাদি, পবিত্র-দিনে উপবাস, গুরুসেবা বিপ্রসেবা এবং দেবাদি সেবাদ্বারা তাহার ষোড়শাংশের একাংশ ফলও লাভ করিতে পারে না।

ব্র—বৈ—পু—৭।৪২।২৮ ৩০।

হুতাশনো বা সূর্য্যো বা সর্ব্বতেজস্বীনাং পরঃ।
পতিব্রতা তেজসশ্চ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং॥

এই জগতে সূর্য্য ও হুতাশন, ইঁহারা তেজস্বীগণের মধ্যে অগ্রগণ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন বটে, কিন্তু তুলনা করিলে, তাঁহারা পতিব্রতা তেজের ষোড়শাংশের ও একাংশ হইতে পারে না।

ঐ ৪৪। ১৪।

ব্রতোপবাসনিরতা যা নারী পরমোত্তমা।
ভর্ত্তারং নানুবর্ত্তেত সাচ পাপ গতির্ভবেৎ॥

যে রমণী, সকলের শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বদাই ব্রত ও উপবাস করিয়া থাকে স্বামীর অনুগতা না হইলে তাহারও নরক লাভ হয়।

বা—রা—২।২৪ ২৬।

ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষয়ানারী লভতে গতিমুত্তমম্।
অপি বা নির্নমস্কারা নিবৃত্তা দেবপূজনাৎ॥

আবার, দেবপূজা ও দেবতাদিগে নমস্কার না করিলেও, একমাত্র স্বামী সেবাদ্বারা স্ত্রীলোক উৎকৃষ্ট গতিলাভ করে।

বা—রা—২।২৪।২৭

শুশ্রূষামেব কুর্ব্বীত ভর্ত্তুঃপ্রিয়হিতেরতা।
এষ ধর্ম্মঃ পুরাদৃষ্টো বেদে লোকে শ্রুতঃ স্মৃতঃ॥

স্ত্রী স্বামীর প্রিয় ও হিত অনুষ্ঠান করিয়া সেবা করিবে, ইহা অতি

প্রাচীন ধর্ম্ম,বেদে ও লোকে সর্ব্বত্রই ইহা শ্রুত ও পরিগণিত হইয়া থাকে।

অত্রি—২৮।

জীবদ্ভর্ত্তরি যা নারী উপোষ্য ব্রতচারিণী।

আয়ুষ্যং হরতে ভর্ত্তুঃ সা নারী নরকং ব্রজেৎ॥

পতি জীবিত থাকিলে যেনারী পতির অননুমতিতে উপবাস করিয়া ব্রতাচরণ করে, সে ভর্ত্তার আয়ুহরণ করে এবং সে স্বয়ং নরকে গমন করে।

অত্রি—সং।

পাণিগ্রাহস্য সাধ্বীস্ত্রী জীবিতো বা মৃতস্য বা।

পতি লোকমভীপ্সন্তী নাচরেৎ কিঞ্চিদপ্রিয়ং॥

যে সাধ্বী স্ত্রী স্বর্গাদি লোকাকাঙ্ক্ষা করে, সে পতির জীবদ্দশায় বা মরণান্তে তাহার কিঞ্চিতমাত্রও অপ্রিয়াচরণ করিবে না।

ম—সং—৫।১৫৬।

বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।

পতিসেবাগুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নি পরিস্ক্রিয়া॥

স্ত্রীলোকদিগের বিবাহ সংস্কারই (উপনয়নাদিরূপ) বৈদিক সংস্কার, পতিসেবাই গুরুকুলে বাস এবং গৃহ কর্ম্মই (হোমাদিরূপ) অগ্নিসেবা।

ম—সং—২।৬৭।

ন ব্রতং তীর্থ যাত্রা নো নচ কাচিৎ শুভাক্রিয়া।

কর্ত্তব্যা তু তয়া রাজন্ শমঃ কার্য্যো ন সংশয়ঃ।

শীলভঙ্গেন নারীণাং দোষাস্তু বহবঃ স্মৃতাঃ॥

ব্রত, তীর্থগমন ও পুণ্য কর্ম্ম কিছু হউক আর না হউক, হে রাজন্! ইন্দ্রিয় নিগ্রহকরা নারীজাতির সর্ব্বোতভাবে বিধেয় সন্দেহ নাই। চরিত্র ভঙ্গে নারীজাতির বহুদোষ সমুদ্ভূত হয়।

দেব—ভা—৮।২০।

ব্রতং পতিব্রতানাঞ্চ পতিসেবা পরং তপঃ।

যথা পুরঃ পরপতিরেষ ধর্ম্মঃ সোষিতাং॥

পতিব্রতা নারীগণের পতিসেবাই পরম ব্রত ও পরম তপস্যা। বোবিকোণ পরপতিকে পুত্রবৎ দর্শন করিবে, ইহাই নারীজাতীর ধর্ম্ম।

ব্র—বৈ—পু—৪।৫৯।৭৭।

(সদ্ভার্য্যার লক্ষণ।)

অন্যং যদ্যন্যমাকাঙ্ক্ষেদন্যচেতসি রোচতে।
পুরুষাণামলাভেন তেননারী পতিব্রতা॥

স্ত্রী ও পুরুষের চিত্ত যদি পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত থাকে, তাহা হইলে স্ত্রীকে পতিব্রতা বলা যাইতে পারে।

গ—পু—১।১১৪.১১।

সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্য্যা যা প্রিয়ম্বদা।
সা ভার্য্যা যা প্রিয়প্রাণা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা॥

যিনি গৃহ কার্য্যে দক্ষা, তিনিই প্রকৃত ভার্য্যা, যিনি প্রিয়বাদিনী তিনিই প্রকৃত ভার্য্যা; যিনি পতিপ্রাণা তিনিই প্রকৃত ভার্য্যা, এবং যিনি পতিব্রতা তিনিই প্রকৃত ভার্য্যা।

গ—পু—১।১০৮।১৯।

আর্ত্তার্ত্তে মুদিতে হৃষ্টা প্রোষিতেমলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সাধ্বীজ্ঞেয়া পতিব্রতা॥

যে নারী পতির দুঃখে দুঃখী, পতির আনন্দে আনন্দিতা, ও পতি প্রবাসী হইলে মলিনা ও কৃশা হন, তিনিই সাধ্বী ও পতিব্রতা এবং সেই শ্রীরাই পতির মরণে সহগামিনী হইতে পারেন।

ক—বা।

ক্রোধেহক্রোধবতীনারী ভোজনে জননী সমা।
বিপদে মধুভাষীচ সা ভার্য্যা প্রাণবল্লভা॥

যে ভার্য্যা স্বামীর ক্রোধাবস্থায় শান্তচিত্তা, ভোজনকালে জননীতুল্যা ও বিপদাবস্থায় মিষ্ট ভাষিনী হয়, সেই ভার্য্যা প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা।

ক—বা।

সা পত্নী যা বিনীতা স্যাচ্চিত্তজ্ঞা বশবর্ত্তিনী।
দুঃখাম্বিকা কশিৎকশ্চিত্ত ভেদঃ পরস্পরম্॥

যে পত্নী বিনীতা, চিত্তজ্ঞা ও বশবর্ত্তিনী, তিনিই যথার্থ পত্নী, আর যে পত্নী হইতে পরস্পরের কলহ বিচ্ছেদ ও মনস্তাপ জন্মায়, সে দুঃখ রূপিনী মাত্র।

দ—সং—৪।৫।

(অসদ্ভার্য্যার লক্ষণ।)

প্রতিকূল কলত্রস্তুদ্বিদারস্তু বিশেষতঃ।
জলৌকাইব তাঃ সর্ব্বাভূষণাচ্ছানাহশনৈঃ॥
সুভৃত্তাপি কৃতানিত্যং পুরুষং হ্যপকর্ষতি।
জলৌকা রক্তমাদত্তে কেবলং সা তপস্বিনী॥

প্রতিকূল ভার্য্যা বিশেষতঃ দ্বিভার্য্যা জলৌকারন্যায়। তাহাদিগকে সর্ব্বাভরণে ভূষিতা ও অতি উত্তমরূপে ভরণ পোষণ করিলেও তাহারা দিন দিন পুরুষকে অপকর্ষকরে। বরং জলৌকাকে তপস্বিনী বলা যায় কেননা সে কেবল রক্তই ভক্ষণ করে।

দ—সং—৪।৬৭।

ক্রমশঃ

নিবেদন।

সম্পাদকের বহুদিনব্যাপী শারীরিক পীড়া বশতঃ এবং অকস্মাৎ তাঁহার মায়ের কাশীলাভ হওয়ায় মাসাবধি তাঁহাকে কাশীধামে থাকিতে বাধ্য করায় বেদব্যাস প্রকাশে বিলম্ব হইল। বিলম্বের কারণ বুঝিয়া গ্রাহকগণ ক্ষমা করেন এই প্রার্থনা। কার্য্যাধ্যক্ষ।

বেদব্যাস।

ষষ্ঠ বর্ষ।

১২৯৮ সাল। মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র।

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

Printed by Kalidas Surma at the Gyanoday Press, No. 8 Tamers Lane, Calcutta.

বেদব্যাস।

ষষ্ঠ বর্ষ।

ষষ্ঠ ভাগ। মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র ১২৯৮। ১০ম, ১১শ, ১২শ খণ্ড।

দেবি! প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতে নিত্যং যথা সুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানি সর্ব্বগতাঞ্চ সমং নয়াশু, উৎপাত পাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্॥

"বৈরাগ্য"

ও

সভ্যতা বিবেক।

প্রথম প্রস্তাব।

যাহা থাকিবার নহে, যুগ যুগান্তব্যাপি আলোচনায়, কোটীকোটী বর্ষের তীব্র অধ্যবসায়, অনন্ত কালের সমগ্র অনুষ্ঠানে যাহার স্থিরতা সম্পাদিত হয় নাই, হইবে না ও হইতেছে না, তাহাকে স্থির করিবার জন্য এত প্রযত্ন কেন? জড় প্রকৃতির জড় পরমাণুর ক্ষণস্থায়ী সংশ্লেষণ শক্তিতে যাহা উৎপন্ন হইয়াছিল, ক্ষণস্থায়ী স্থিতি-শক্তির উপর যাহার স্থিতি নির্ভর করিতেছে আবার অচিরেই অবশ্যম্ভাবি বিশ্লেষণ শক্তি যাহার ধ্বংস সাধন করিতে অনন্তবেগে ছুটিতেছে, বল দেখি, জ্ঞানাভিমানিন্ মানব সমাজ! সেই তুচ্ছবস্তুটী চিরস্থায়ী ভাবিয়া তাহারই জন্য এ সমগ্র জীবনব্যাপী দীর্ঘ পরিশ্রম কেন? শুধু

কি পরিশ্রম! এ পরিশ্রম যে জন করে না, এ ব্যর্থ পরিশ্রম করিতে যাহার ভাল লাগে না, তাহার প্রতি খড়্গ প্রহার করিতে কেন বল দেখি, তোমাদের ভীম বাহু সর্ব্বদাই উদ্যত! গালি বর্ষণ করিতে জিহ্বা অবিরত লালান্বিত! একবার মুক্তকণ্ঠে বল দেখি, তাহাকে ধরিয়া গিলিবার জন্য কেন তোমরা এত ভীম ভাবে পরিচালিত?

ধরনা কেন এই যে দেহ, যাহাতে রৌদ্রের আঁচটীও লাগিতে না দিবার জন্য সমগ্র মানব সমাজ, না জানি কত সহস্রবর্ষের অসীম পরিশ্রমে এমন সুরম্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে শিখিয়াছে, হিম মারুতের ক্লেশ জনক স্পর্শ হইতে যাহাকে রক্ষা করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ বর্ষের নিবিড় অধ্যবসায়ে এমন সুকোমল বস্ত্রাবলী নির্ম্মাণ করিবার কৌশল আবিষ্কার করিয়াছে, যাহার দিন দিন বৃদ্ধির জন্য যুগযুগান্তব্যাপী পরিশ্রমে সুকোমল আস্বাদময় অন্ন নিচয় প্রস্তুত করিবার সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে, রোগের ভীষণ ক্লেশ হইতে যাহাকে রক্ষা করিবার জন্য কত কত সর্ব্বতত্ত্বোন্মেষশালিনী বুদ্ধিবৃত্তির অনন্ত কাল ব্যাপী পরিচালনায় রসায়ন শাস্ত্র, উদ্ভিদ বিজ্ঞান প্রভৃতি অনন্ত বিস্ময়জনক বিষয় সকল আবিষ্কার করিয়াছে, অধিক কি বলিব! যাহার নাম মানব জাতির বর্ত্তমান সভ্যতা! যাহার জন্য মানবের অভিমান, সমগ্র জীব জগৎকে তৃণের ন্যায় বোধ করায়—সে সভ্যতাও কেবল মাত্র যে শরীরের জন্য সাধিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, সেই শরীর তোমাদের কয় দিনের জন্য? বাতাসে যাহা পীড়িত হয়, জলে যাহা পচিয়া যায়, রৌদ্রে যাহা শুকাইয়া যায়! ভবিষ্যতের প্রত্যেক ক্রিয়া যাহাকে ধ্বংস করিবার জন্য আবহমানকাল অবিরাম স্রোতে দৌড়িতেছে, কালের করাল বক্ত্রকুহর যাহাকে গ্রাস করিবার জন্য অনন্তকালের জন্য অনাবৃত রহিয়াছে, সেই তুচ্ছ বস্তুটীর জন্য, সভ্যতাভিমানিন্ মানব সমাজ! এত আগ্রহ কেন? অচিন্তনীয় শক্তির প্রভাবে যাহা উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, অভাবনীয় ব্যাপারে যাহার স্থিতি দেখা যাইতেছে, অনিবার্য্য-শক্তি যাহার ধ্বংস সাধন করিতে সর্ব্বদা উদ্যত, তাহার জন্য এত চিন্তা কেন? শুধু কি চিন্তা? চিন্তা মাত্রেই যদি বিশ্রাম থাকিত তা হলে ত বড় একটা ক্ষতি ছিল না!

তাহার জন্য কি অকার্য্যস্রোত জগতে অদ্য প্রবাহিত হইতেছে না?

চৌর্য্য, দস্যুতা, নরহত্যা, প্রবঞ্চনা, শাঠ্য, কি না হইতেছে? কি বিড়ম্বনা! শরীরের মোহে মানব সমাজের কি ভয়ানক অবিমৃষ্যকারিতা! যে দস্যুতা, যে নরহত্যা, যে প্রবঞ্চনার নাম শুনিলে সভ্যতার খাতিরে তোমরা কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান কর, সেই দস্যুতা, সেই নরহত্যা ও সেই প্রবঞ্চনায় যিনি বড় পণ্ডিত! সেই সকল লোমহর্ষণ ব্যাপারে যিনি অক্ষুণ্ণভাবে সর্ব্বদা প্রস্তুত! তিনিই অদ্য মানব সমাজের বরণীয় সিংহাসনে সমুপবিষ্ট! ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তাঁহারই নাম অদ্য স্বর্ণাক্ষরে দেদীপ্যমান! তাঁহারই যশোরাশি গান করিতে বর্ত্তমান কবিকুল অদ্য লালায়িত! সভ্যতাভিমানিন্ জীব! ধিক্ তোমাদের বরণীয় সিংহাসনে! ধিক্ তোমাদের ইতিহাসে! সভ্য সমাজের কবিকুল! শত ধিক্ তোমাদের ঐ নির্গুণ রসনাকে!!

ভাল কথা, একবার বিচার করিয়া দেখা যাক্, এই সভ্যতা জিনিসটা কি? প্রাচীন ভারতের প্রাচীন সভ্যতার কথা তুলিয়া প্রয়োজন নাই, কারণ বর্ত্তমান কালে তাহার উৎকর্ষ স্বীকার করিতে সুসভ্যগণ! একান্ত নারাজ। তাহার উপর সে সভ্যতা ছিল কি না? এখনকার সভ্য সমাজ তাহাই মীমাংসা করিতে অনিচ্ছুক। সুতরাং সে অতীত বর্ত্তমান যুগে আকাশ-কুসুমপ্রায় জীর্ণ সভ্যতাকে লইয়া এখানে টানাটানি নিষ্প্রয়োজন।

যে সভ্যতা আজ জগতের চক্ষে জাজ্বল্যমান! যে সভ্যতার খনি ইউরোপ-ভূমি আজ পৃথিবীর রত্নমুকুটায়মান—সে সভ্যতার উদ্ভাবক ও সেবকগণ অদ্য পৃথিবীর বড় আদরের বস্তু। বিজ্ঞান যে সভ্যতার গৌরবোজ্জ্বলিত সিংহাসন, স্বাবলম্বন, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, জাতীয় একতা যাহার চির সহচর, মনুষ্য সমাজের সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব ও সর্ব্বোৎকৃষ্টতা প্রতিপাদনই যাহার অদ্বিতীয় লক্ষ্য! যে সভ্যতা ধনের অধিকারী মানব দ্বারা এই বিশাল ভূমণ্ডলকেও করতলামলকবৎ বোধ করিতেছে, সেই ভুবনভুলানা বিবেকহারিণী সভ্যতাখানা কি একবার বিচার করিয়া লও দেখি?

মানবীয় সভ্যতার স্তাবক জীবগণের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গীকার্য্য বিষয় ইহাই বলিতে হইবে, বর্ত্তমান সভ্যতায় মানবজাতির সুখ বৃদ্ধি করিয়াছে, মানবের পশুভাব বিদূরিত করিয়া জীব জগতের মধ্যে মানবের সর্ব্বোৎকৃষ্টতা প্রমাণিত করিয়াছে ও উত্তরোত্তর করিবে। তাহা হইলে এক প্রকার বলা হইতেছে,

সভ্যতার ফল অভাব নিরাকরণ পূর্ব্বক সুখ বৃদ্ধি ও পশুভাব বিদূরণ দ্বারা জীব জগতের মধ্যে মানব জাতির শ্রেষ্ঠতা সম্পাদন। প্রথমেই আমরা বিচার করিব যে বর্ত্তমান সভ্যতায় মানব জাতির কত অভাব বিদূরিত হইয়াছে ও কি পরিমাণে সুখ কিম্বা সুখের উপর প্রশস্ততর হইয়াছে।

দর্শন শাস্ত্রে ইহা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে, মানবের পার্থিব সুখ শব্দস্পর্শরূপ রস ও গন্ধ এই পাঁচটী গুণের মধ্যেই কোন না কোন একটীর অনুভবের ফল। অর্থাৎ শব্দস্পর্শরূপ রস ও গন্ধ এই কয়টী গুণের আস্বাদন করিতে মানব সমাজ (শুধু মানব সমাজ নহে, অনেকানেক জীব সমাজ) সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত। এক জাতীয় মনুষ্য, শব্দের জন্য পাগল, সেই অনাহত নাদ সমুদ্র হইতে উত্থিত খণ্ড খণ্ড ধ্বনি সকল তাহাদের হৃদয়ে সুখের স্রোত বহাইয়া দেয়, শুনিতে শুনিতে তাহাদের সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি কর্ণেন্দ্রিয়ের সহিত মিশিয়া যায়। এই শব্দ, সমুদ্রের তরঙ্গে যাহাদের জীবন অবিরত আন্দোলিত তাহারাই শব্দ বিজ্ঞানের পক্ষপাতী, সেই জাতীয় লোকের দ্বারায় শব্দবিজ্ঞান উন্নতির পথে আরূঢ় হইয়া থাকে। আর এক জাতীয় লোক আছে, যাহারা রূপের আস্বাদনে ব্যতিব্যস্ত। শরতের চন্দ্রিকায়, নবোদিত দিনকরের কিশোর কিরণচ্ছটায়, সুদূর বিস্তৃত সুধাধবল সৈকতরাজির একপ্রান্তে ক্ষুদ্রকায় লহরীরাজির কমনীয় ক্রীড়ায়, রমণীর রমণীয় বদন সুধাকরে, রূপের আস্বাদন করিতে তাহাদের অক্ষিযুগল সর্ব্বদা ব্যাকুলভাবে পরিভ্রমণ করিতেছে, রূপ দেখিলে তাহাদের সর্ব্বশরীরের শোণিত উষ্ণ হয়, রূপের কথা শুনিলে তাহাদের হৃদয়ে আবেশময়ী মদিরার সুতীব্র মদ ছাইয়া পড়ে, রূপের স্মরণে তাহাদের ভূত ভবিষ্যৎ ভুলাইয়া দেয়, রূপ! রূপ! রূপ! এজাতীয় মনুষ্য রূপের দাস, রূপসমুদ্র ইহাদের অনন্তকালের জন্য বহিয়া থাকে। এই জাতীয় মনুষ্যই রূপবিজ্ঞানের পক্ষপাতী, ইহাদের দ্বারাই রূপবিজ্ঞান প্রশস্ততা লাভ করিয়া থাকে। এইরূপ স্পর্শরস ও গন্ধের সেবায় যাহাদের সুখ উৎপন্ন হয় তাহারা তত্তদ্ বিষয়ের সংগ্রহে অধিকতর যত্ন করিয়া থাকে এবং সেই সকল বিষয়ের অর্জ্জন পথকে সমধিক প্রশস্ত করিবার জন্য অনবরত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে।

এইক্ষণে দেখিতে হইবে, সভ্যতায় মনুষ্যের সুখ বৃদ্ধি হয়, ইহার অর্থ

কি? ইহার দ্বারা এই প্রকারই বুঝিতে হইবে যে, যে জাতীয় জ্ঞানের সাহায্যে মনুষ্যের সুখের হেতু শব্দস্পর্শরূপ প্রভৃতি বিষয়ের অর্জ্জন পথ প্রশস্ত হইতে পারে সেই জাতীয় জ্ঞানের অধিকার যাহাদের আছে ও সেই জাতীয় জ্ঞান অর্জ্জন করিতে যাহারা উপযুক্ত তাহাদিগকেই বর্ত্তমান সভ্যতা-ধনের অধিকারী বলা গিয়া থাকে এবং তাহাদেরই প্রযত্নরাশি জগতে অসভ্য জাতি হইতে অধিক সুখ আস্বাদন করাইতেছে।

কিন্তু বাস্তবিক সভ্যতার সাহায্যে সভ্য মানব কি অধিক সুখের অধিকারী হয়?

সত্য সত্যই কি সভ্যতার অধিকারী মানবগণ অর্দ্ধ সভ্য বা অসভ্য জীবগণের জ্ঞানের অবিষয় বা তাহাদের সুখ হইতে অত্যধিকতর সুখ আস্বাদন করিতে সমর্থ? সুখরাজ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী রাজশক্তি কি তাহাদেরই হস্তে এক মাত্র নিয়ন্ত্রিত?—

প্রশ্নটী বড়ই গুরুতর, যে সভ্যতায় মনুষ্য অদ্য উন্মত্তপ্রায়—যে সভ্যতার অনধিকারী মনুষ্য অদ্য জগতে পশু বা পশু অপেক্ষা নীচ বলিয়া উদ্ঘোষিত—যে সভ্যতার আশ্রয়ে মনুষ্য দৈবীসম্পদের সহিত স্পর্দ্ধা করিতে অগ্রসর সে সভ্যতায় মনুষ্য জাতির অসভ্য সমাজ হইতে সুখ বৃদ্ধি করে নাই, এই প্রকার উত্তর দিতে হইলে আজ উত্তরদাতাকে কি সঙ্কটময় ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে হয়, তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নহে। অপর দিকে যদি সত্য সত্যই বলা যায় যে, সভ্যতায় পৃথিবীতে সুখের নন্দন—কাননের সৃষ্টি করিয়াছে, সুখ-সমুদ্রের তরঙ্গাবলীতে মানবসমাজকে অনবরত স্নান করাইতেছে; সুতরাং সভ্যতার তুল্য উপকারি ধন মানবের এ জগতে অন্য কিছুই নাই। তাহা হইলে বোধ হয় যেন মনসন্তোষ লাভ করে না। জিহ্বা যেন একথা সর্ব্বান্তঃকরণে বলিতে কিছু জড়তা ধারণ করে! সত্যের উজ্জ্বল আলোক যেন একটু হীনপ্রভের ন্যায় বোধ হয়!! এযে দেখি উভয় সঙ্কট! একদিকে সভ্য সমাজের উপহাস ঘৃণা দ্বেষ সকল—গিরিরাজ হিমালয়ের ন্যায় উন্নত মস্তক তুলিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে, অপর দিকে নিজের বিবেকশক্তি ও আত্মীয় ক্ষুদ্রকায়া প্রতিভা, অভিমান মিশ্রিত অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া নরমেই মিশিবার উপক্রম করিতেছে!

যাহা হউক না কেন, সত্য কথা কহা ভাল, আত্মপ্রতিভা আত্মবিবেক শক্তির পক্ষ ছাড়িলে ত আর চিরদিন চলিবেনা সুতরাং তাহাদের না চটানই সুযুক্তি সঙ্গত।

কথাটা হইতেছে বর্ত্তমান সভ্যতা সুখের সাধন বলিয়া যে আশ্রয়নীয়, একথা স্বীকার করা যায় না কেন? তাহা বলিতেছি।

সকলের ইহা বিদিত আছে যে এজগতে সুখ বস্তুটী যেমন সকলের প্রিয় দুঃখটী ও আবার তেমনি সকলেরই দ্বেষের বিষয়। বরং লোকে সুখ ছাড়িতেও প্রস্তুত হয় কিন্তু দুঃখের ভীষণ প্রহারের ভীমছায়া হৃদয়-গগনে ক্ষণেকের তরেও উদিত দেখিতে ভয় পায়। জন সাধারণের যত লক্ষ্য দুঃখা-ভাবের দিকে, সুখের দিকে সে পরিমাণে লক্ষ্যতা নাই, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভয়ঙ্কর দুঃখ বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়াই লোকে উদ্বন্ধনাদির সাহায্যে প্রাণনাশ পর্য্যন্ত করিতে উদ্যত হয়। প্রাণনাশ করিলে সুখী হইব না নিশ্চয় থাকিলেও অত্যন্ত দুঃখাতুর ব্যক্তি বিষপানাদি কার্য্যে বিরত হয় না। ইহা শুধু শাস্ত্রকারগণই যুক্তিবলে প্রমাণ করিয়াছেন তাহা নহে, শত সহস্রবার মানবের চক্ষে এমন ঘটনাজাল উপস্থিত হইয়াছে ও হইতেছে, যাহার সাহায্যে এই উজ্জ্বল সত্যটী সমাজের জ্ঞাননেত্রে অবিরত প্রতিভাসিত হইতেছে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে বর্ত্তমান সভ্যতা বৃদ্ধি যদি কেবল সুখার্জ্জনের দ্বার মাত্র প্রশস্ত করিয়া বিরত হয়, দুঃখরাশির কুসুমাবৃত বর্ত্মকে ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ করিতে সক্ষম না হয় তাঁহা হইলে দুঃখদ্বেষী জীব সমাজেও এসভ্যতার পূর্ণ আদর হওয়া কি উচিত? সুখের স্বর্গীয় অস্বাদন তুচ্ছ করিতে যাহারা কুণ্ঠিত হয় না কিন্তু দুঃখের বজ্র প্রহারে যাহারা বড় ভয় পায় তাহারা মুক্ত-কণ্ঠে কহিবে যে, যদি সভ্যতা দুঃখের পথে কণ্টক দিতে না পারে তাহা হইলে আমরা তাহা চাই না। এক্ষণে বিচার্য্য বিষয় যে বর্ত্তমান সভ্যতা সুখের পথ যেমন প্রশস্ত করিতেছে তেমনি কি দুঃখের পথে রাশি রাশি কণ্টক অর্পণ করিতেছে?

পাশ্চাত্য সভ্যতার চিরোপাসক সম্প্রদায়! পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রেমে উন্মত্ত নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়! একবার সত্যের বিমল কান্তি ছটায় অন্তরী-

স্থাকে আলোকিত করিয়া নিরপেক্ষভাবে বলদেখি, সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি, বুঝাইয়া দাও দেখি, তোমাদের ঐ বিজ্ঞানময়ী সভ্যতা, তোমাদের নশ্বর জগতের একমাত্র সাররত্ন ঐ পাশ্চাত্য সভ্যতা, ঐ ভুবনভুলানী সমাজ সংস্কার প্রসবিনী ঊনবিংশ শতাব্দীর সুসংস্কৃত পাশ্চাত্যসভ্যতা, জগতের সভ্যমানব সমাজের দুঃখরাশির পথকে আরও প্রশস্ততর করিয়াছে? কিম্বা রুদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছে? নরহত্যা, প্রবঞ্চনা, দস্যুতা, উদ্বন্ধন, বিষপান, ব্যভিচার, হিংসা, মাৎসর্য্য, ক্ষোভ, অভিমান, রোষ, অহঙ্কার, নির্দ্দয়তা, অক্ষমা, কৌটিল্য প্রভৃতি সংসারের মানব সমাজের একমাত্র দুঃখরাশির হেতুভূত বিষয় সমূহ কি? তোমাদের এই জাজ্বল্যমান সভ্যতা দহনে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে? অবিরত উদরের জন্য পরিশ্রমই যে সভ্যতায় সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়া থাকে ব্যক্তিনিষ্ঠ সম্প্রদায়গত অথবা এক একটী জাতিগত ঐহিক ঘৃণিত স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য যে সভ্যতা, প্রতিবেশী ভ্রাতৃগণের জাতীয় স্বার্থ বিধ্বস্ত করিয়া জাতীয় বিনাশ সাধন করিবার জন্য প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতেছে, যে সভ্যতা মানবজাতির হৃদয়ের ধন দানবীর, দয়াবীর, ধর্ম্মবীর ও যুদ্ধবীরগণের গৌরবোজ্জ্বলিত বরণীয় হেমসিংহাসনে স্বার্থপর প্রবঞ্চককে গৌরবের সহিত উপবেশন করাইয়া তাহারই জগদ্বঞ্চনা জনিত যশোগান করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া যায়। যে সভ্যতার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জগৎ হইতে দাম্পত্য প্রেম, ভ্রাতৃস্নেহ, পরস্পরে বিশ্বাস, সর্ব্বভূতদয়া, ঈশ্বরনিষ্ঠা, শনৈঃ শনৈঃ বিনাশ পথে অগ্রসর হইতেছে, যে সকল বৃত্তি হৃদয়ে পরিপুষ্ট থাকিলে দুঃখের অনন্ত দ্বার অবিরত উন্মুক্ত হইয়া থাকে, সেই সকল বৃত্তি যে সভ্যতার উদয়ে দিন দিন শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতেছে। বল দেখি সভ্য সম্প্রদায়! তোমাদের এ সভ্যতা মানব জাতির সুখ বাড়াইতেছে ও দুঃখ দূর করিতেছে, একথা কেমন করিয়া মুক্তকণ্ঠে সভ্য সমাজে বলা যায়?

যে সভ্যতার সকল অঙ্গই মনুষ্য সমাজের বাহ্য সৌন্দর্য্য সাধন করিতে কল্পিত হইয়াছে, যাহা লইয়া মানবের মানবত্ব, সেই অন্তের গুণনিচয়কে জগতের—মনুষ্য জাতির হৃদয় হইতে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য যে সভ্যতা অবিরাম স্রোতে বহমান সেই সভ্যতায় আবার মনুষ্যজাতির পরম

উপকার সাধিত হইতেছে। একথার প্রমাণ প্রবীণের মুখে কখনই শোভাপায় না।

হৃদয়ের মধ্যে অশান্তির দাবানল চিরদিনের জন্য হুহুস্বরে জলিতেছে, তাহার নিবারণের জন্য কোন উপায় সাধিত হইতেছে না. হইবারও ত কোন উপায় দেখি না। বলদেখি ভাই! সে দাবানলের তীব্রদাহ অনবরত অনুভব করিতে করিতে, দগ্ধ মানব ঐ বিজ্ঞানময়ী সভ্যতার কল কৌশল দেখিয়া কোন মুখে হাসিতে হাসিতে ধন্যবাদ প্রদান করিবে? নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ দাবাগ্নির ভীম জ্বালা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া যে মানব নিজের দেহ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে সর্ব্বদা উদ্যত. বাষ্পীয় শকটের কৌশলময় তীব্রগতি. বিদ্যুতের অচিন্তনীয় বার্ত্তাবাহিনী শক্তি, সংসার ভুলান প্রবঞ্চনাময় কৌশল রাশি, রাসায়নিক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার নিবহ, বেশ ভূষার অলৌকিক পারিপাট্য, মৌখিক সারল্য প্রকাশের অদ্বিতীয় মন্ত্রভূত বাক্‌কৌশল নিচয় এবং সভ্যতার অঙ্গ আরও পশুভাবব্যঞ্জক নূতন নূতন সংস্কার নিবহ, সেই দগ্ধ মানবের হৃদয়ে কতটুকু স্থান অধিকারে সমর্থ? কয় বিন্দু উত্তপ্ত অশ্রু তাহার নয়নে মুছাইতে তোমাদের এই সভ্যতা সমর্থ হয়? অবিরত সংসার যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া, অবিরল অশ্রুপ্রবাহে যাহার বক্ষঃ ভাসিয়া যাইতেছে। প্রাকৃতিক বৈষম্যের তীব্র প্রতিঘাতে যাহার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহার মলিন মুখে পুনরায় হাসির জ্যোৎস্না যে সভ্যতা ফুটাইতে পারে না; তাহার উষ্ণ অশ্রুজল যে সভ্যতায় শুকায় না। তাহার সন্তত-বাহী আর্ত্তনাদ যে সভ্যতার সাহায্যে অনন্ত আকাশে বিলীন হয় না। তাহার মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস হরণ করিতে যে সভ্যতা একান্ত অপারগ। সেই সভ্যতা মানব জাতির সারধন! একথা বলিতে বাস্তবিক কি জিহ্বা জড়ীভাব ধারণ করে না? যে সভ্যতার বিস্তারে দরিদ্রের অনন্তক্লেশ, যে সভ্যতার প্রমার্দিনী ছায়ায় ধনির ঐশ্বর্য্যমদ বাড়িতে থাকে, যে সভ্যতায় পদে পদে সাধুর লাঞ্ছনা, যাহার আশ্রয়ে প্রবঞ্চকের রাজসিংহাসন; সেই সভ্যতা জগতের সুখ বাড়াইতেছে। অনিবার্য্য দুঃখরাশির মস্তকে খড়্গাঘাত করিতেছে। বর্ত্তমান সভ্যতার উপাসকগণের মুখেই একথা শোভা পায়, কিন্তু এ সভ্যতাকে যাহারা চিনিয়াছে তাহারা দূর হইতে ইহাকে দণ্ডবৎ করিয়া থাকে।

যাহা উল্লিখিত হইল তাহাতেই অনেকে বুঝিয়া থাকিবেন যে, বর্ত্তমান সভ্যতা জগতে মানব জাতির সুখের পথ কি পরিমাণে সুপ্রশস্ত করিতেছে? ও অগ্রে করিবে! অতএব এবিষয়ে বিচারে আপাততঃ নিরস্ত হওয়া গেল।

এক্ষণে বিচার্য্য এই, যে বর্ত্তমান সভ্যতা, মানব জাতির পশুভাব বিদূরিত করিয়া জ্ঞানের উজ্জ্বলতা বর্দ্ধিত করতঃ মানবের পূর্ণতা সম্পাদন করিতে অগ্রসর হইতেছে, এই যে একটী কথা বর্ত্তমান সভ্যতার স্তাবকগণের মুখে সর্ব্বদা শুনা গিয়া থাকে, সে কথাটী কি পরিমাণে সত্য? এই বিষয়টী বারান্তরে সমালোচিত হইবে।

ভারত ধর্ম্মমহামণ্ডল কাশী।

(সংক্ষিপ্ত কার্য্য বিবরণ।)

শ্রীশ্রীশিবচতুর্দ্দশীর শুভদিন হইতে শিব-লীলাভূমি ভারত-তীর্থরাজ কাশীক্ষেত্রে "ভারত-ধর্ম্মমহামণ্ডলের" কার্য্য আরম্ভ হইয়া, ২রা চৈত্র (শ্রীশ্রী৺ শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রোৎসবের পরদিন) সমাপ্ত হয়। এই পক্ষাধিক-কালব্যাপী সভানুষ্ঠান নিম্নলিখিত মতে সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

১ম দিন। ১৫ই ফাল্গুন শুক্রবার।

আজ কি আনন্দের দিন! একে কাশীধাম আজ স্বভাবতই শিবচতুর্দ্দশীর ব্রতোৎসবে আনন্দোচ্ছ্বাসে উন্মত্ত, তাহাতে আবার কলি-কলুষ-কাতর হিন্দু-সমাজের শুভগ্রহাশ্রয় স্বরূপ "ভারত—ধর্ম্মমহামণ্ডলের" প্রথমানুষ্ঠান। প্রভাতে বিধি-বিহিত বিশুদ্ধ প্রণালীতে ষোড়শোপচারে ৺ গণেশাদি পঞ্চ-দেবতার পূজা ও চতুর্ব্বেদের যথাবিহিত অর্চ্চনা পূর্ব্বক "ভারত—ধর্ম্মমহামণ্ডলের" শুভ উদ্বোধন কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। কাশীরাজ প্রেরিত রজত-সিংহাসনে মহামহিমাময় বেদচতুষ্টয় সংস্থাপিত; তদুপরি সমাগত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত-মণ্ডলী, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সভার প্রতিনিধিবর্গ, মণ্ডলের স্থানীয় সদস্যগণ এবং

অপর বহুসংখ্যক ভদ্র দর্শক ও ধর্ম্মানুরাগী ভক্তবৃন্দ প্রগাঢ় ভক্তি ও আনন্দোৎসাহ সহকারে মাল্য-চন্দন ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। বেলা ২ ঘটিকার সময়ে আর্য্যাবর্ত্ত, দাক্ষিণাত্য ও ভারতের অন্যান্য স্থান হইতে সমাগত বেদ-পারদর্শী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহোদয়গণ একত্রে সমস্বরে উদাত্তাদিস্বর সংযোগে পরম পবিত্র বেদ-মন্ত্র উচ্চারণ পুরঃসর ধর্ম্মমহা-মণ্ডলের শুভ কামনায় শুভাশীর্ব্বাদ করিলেন। শ্রীশ্রীশালগ্রাম ও বেদচতুষ্টয়ের সম্মুখে বেদীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করতঃ, যে সময়ে বেদবিৎগণ কর্ত্তৃক উদাত্তাদি ত্রিবিধ মহাধ্বনিযোগে সামগান ও অপর ত্রিবিধ বেদমন্ত্র গীত হইল, তখন বোধ হইল, যেন বর্ত্তমান কলিযুগ ভেদ করিয়া বুঝি অকস্মাৎ সত্যযুগের আবির্ভাব হইল। এইরূপে প্রথম দিনের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।'

২য় দিন। ১৬ই ফাল্গুন শনিবার।

এই দিবস মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণাদির যথাবিহিত অর্চ্চনা হইয়া সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। পণ্ডিত হরিকিশোর ও শ্রীযুক্ত সোমনাথ ভাদুড়ী মহাশয় ধর্ম্মমণ্ডলের তত্ত্বাবধায়ক-সমিতির পক্ষ হইতে সমাগত পণ্ডিত মণ্ডলীকে পাদ্যার্ঘ পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা যথাবিহিতরূপ অর্চ্চনাদি করিলেন। এরূপ মনোহর অনুষ্ঠান ভারতে অনেকদিন হয় নাই। তৎপর বিগত বর্ষীয় ধর্ম্মমহামণ্ডলের আচার্য্য মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার শাস্ত্রী এক সংক্ষিপ্ত সংস্কৃত বক্তৃতা দ্বারা সমাগত পণ্ডিত মণ্ডলী ও ধর্ম্মসভা সমূহের প্রতিনিধিবর্গকে সাদর অভ্যর্থনা করিলেন; তৎপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীশ্রীমহিশূর মহারাজের প্রধান সেনাপতি ও তাঁহার অতি ঘনিষ্ট কুটুম্ব প্রিন্স শ্রীযুক্ত বাসবাপ্পাজী রাজা বাহাদুর "ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের" সভাপতি পদে বরিত হইলে, শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর সভাপতি মহাশয়কে যথাবিধানে সম্মান সূচক মাল্যচন্দন প্রদান করিলেন। অনন্তর সভাপতি মহোদয় কর্ত্তৃক ভারতের নানাস্থান হইতে সমাগত ধর্ম্মমহামণ্ডলের সহানুভূতিসূচক টেলিগ্রাম ও পত্রাদি পঠিত হইল। তৎপর বোম্বাই নিবাসী জনৈক সুকণ্ঠ পণ্ডিত কর্ত্তৃক সমগ্র সভাকে ভাব-মুগ্ধ করতঃ অতি মধুর কতিপয় সংস্কৃত ভজন-সঙ্গীত গীত হইয়া সেদিনকার কার্য্য শেষ হইল।

৩য় দিন। ১৭ই ফাল্গুন রবিবার।

প্রথমতঃ ৺নারায়ণদেবের অর্চ্চনা ও সংস্কৃত ভাষায় শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তন হইল। তৎপর বর্ত্তমান বর্ষের ভারত-ধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রধান উদ্যোগকর্ত্তা শ্রীযুক্ত রাজা শশীশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর ধর্ম্মমণ্ডলের উদ্দেশ্য সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইয়া দিলেন, তৎপর ভারত-বিখ্যাত বক্তা কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহোদয় ধর্ম্মমণ্ডলের উপকারিতা ও অবশ্য প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে রাজা বাহাদুর কর্ত্তৃক ব্যক্ত উদ্দেশ্য হিন্দি ভাষায় এক হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন। ক্রমে অপরাপর পণ্ডিতগণ ধর্ম্ম কি, ধর্ম্মের আবশ্যকতা কি, বর্ত্তমান সময়ে সনাতন আর্য্যধর্ম্মের অবনতির কারণ কি ও তৎপ্রতীকারের উপায় কি, ইত্যাদি বিষয়ে সংস্কৃত, হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষায় শাস্ত্র ও সুযুক্তি অনুযায়ী উপদেশ দিলেন। সর্ব্বশেষে ৺কাশীধামের খ্যাতনামা রেইস্ শ্রীযুক্ত বাবু প্রমোদাদাস মিত্র "ভারত ধর্ম্মমণ্ডলে গৃহীতব্য সংস্কৃত পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ ছাত্রগণকে যথোপযুক্ত পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং বঙ্গের জনৈক রাজার এইরূপ প্রতিশ্রুতি ঘোষিত হইল, যে সংস্কৃত ভাষায় যে ব্যক্তি ভারত ধর্ম্মমণ্ডলের উদ্দেশ্য সুসাধনোপযোগী উপায় সুচারু রূপে বর্ণন করিয়া গ্রন্থ লিখিবেন, তিনি সার্দ্ধদ্বিসহস্র মুদ্রা পারিতোষিক পাইবেন। অনন্তর সভা ভঙ্গ হইল।

৪র্থ দিন। ১৮ই ফাল্গুন সোমবার।

অদ্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শিবকুমার শাস্ত্রী, পণ্ডিত গঙ্গাধর শাস্ত্রী, পণ্ডিত প্রমথ নাথ, পণ্ডিত সীতারাম, পণ্ডিত অম্বিকা দত্ত ব্যাস (ভাগলপুর) পণ্ডিত মনোহর ঝাঁ (মিথিলা), পণ্ডিত হরিকৃষ্ণ, পণ্ডিত রামচন্দ্র (বেহার) পণ্ডিত হরিদত্ত এবং পণ্ডিত হরগোবিন্দ (সাজাহানপুর) ও পণ্ডিত ভূধর শর্ম্মা প্রভৃতি মহোদয়গণ বিশুদ্ধ আর্য্যরীতি অনুসারে ধর্ম্মব্যাখ্যা ও ধর্ম্মাবনতির হেতু ও তৎপ্রতিবিধানোপায় বিশদরূপে বিবৃত করতঃ স্থানীয় ও বিদেশীয় সভাস্থগণকে বিশেষ প্রীত ও চমৎকৃত করিলে, সুমধুর ভজন-সঙ্গীত হইয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

৫ম দিন। ১৯শে ফাল্গুণ মঙ্গলবার।

অদ্যকার সভা আরম্ভ সময়ে এই নিয়ম স্থিরীকৃত হইল যে, অদ্য হইতে বৃহৎ সভা বাটিকার উর্দ্ধতলে ৺কাশীধামস্থ ও অন্যত্র হইতে সমাগত নিম্নলিখিত প্রমুখ দণ্ডী ও স্বামী মহোদয়গণ এবং ভারত-বিখ্যাত সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ গঠিত মন্ত্রণা সমিতি, স্বধর্ম্ম রক্ষার বিহিত উপায় নির্দ্ধারণ বিষয়ে শান্ত সমাহিত ভাবে, নিভৃত মন্ত্রণা করিবেন এবং বেদ-বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সূক্ষ্মজ্ঞানমার্গীয় আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম-তত্ত্ব মীমাংসা করিবেন, আর নিম্নস্থ সুবিস্তীর্ণ অঙ্গনে সর্ব্বসাধারণের জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র ও তন্ত্র পুরাণাদি ব্যাখ্যা, ভজন-সঙ্গীত, নাম-সংকীর্ত্তন ও সুবক্তাগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মব্যাখ্যা হইবে। অদ্য হইতে শেষ মহাধিবেশনের পূর্ব্বপর্য্যন্ত অবশিষ্ট কয়েকদিন এই প্রণালী মতেই কার্য্য চলিয়াছিল।

মন্ত্রণা সমিতির সভ্যগণ—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবকুমার শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দামোদর শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সুধাকর শাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি, শ্রীযুক্ত যাগেশ পণ্ডিত, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তাঁতিয়া শাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিষ্ণু শাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়নারায়ণ তর্করত্ন, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ তত্ত্বরত্ন, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ বিদ্যাসাগর, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়দেব মিশ্র, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতারাম শাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দেবকৃষ্ণ জ্যোতিষী, শ্রীযুক্ত বিভমরাম পণ্ডিত, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মনোহর ঝাঁ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শীতল প্রসাদ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সঙ্গমনাথ ঝাঁ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীকর শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত সুবস্ত পণ্ডিত, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বামদেব শাস্ত্রী।

৬ষ্ঠ দিন। ২০শে ফাল্গুণ বুধবার।

অদ্য পূর্ব্বদিনের নিয়মানুসারে নিম্নস্থ সভা প্রাঙ্গনে পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইলে যখন সকলে ভজনানন্দ উপভোগ করিতেছেন, এমন সময় একটী অপূর্ব্ব ঘটনা হইল! প্রকাণ্ড সভাস্থলে সুমধুর হরিনাম সংকীর্ত্তন হইতেছে, এমন সময়ে জনৈক উন্মত্ত ভাবাপন্ন উগ্রস্বভাব সন্ন্যাসী তীব্রবেগে সভায় প্রবেশ পূর্ব্বক উষ্ণভাবে ও উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "ইয়ে ক্যা হ্যায়!

এহি বড়ী সভা মে বেদ-বেদান্তকা কুচ্ ব্যাখ্যান নেহি হোত্তা; খালিহি সংকীর্ত্তন! বড়া তাজ্জব!!" ইত্যাদি। তখন হরিনাম-সুধারস পানে সভ্যগণ বিভোর। এরূপ মধুর ভাব-ভঙ্গকর আকস্মিক বাক্য কয়েকটী উচ্চারিত হওয়া মাত্রেই সমস্ত সভা যেন কেমন এক বিষাদ-বিক্ষোভে চঞ্চল হইয়া উঠিল। আর অমনি, অহো ধন্য ভগবন্নাম-মহিমা! একটী অনধিক ৫ম বর্ষীয় বালক সভাস্থলে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মৃদু-কাতর অথচ অপূর্ব্ব ক্রোধ-মধুর-ভঙ্গিতে অপূর্ব্বকণ্ঠে বলিয়া উঠিল" আরে ক্যা কহো জী? হরিনামকে উপর ঔর ক্যা হ্যায়? জান্তেনেহি——

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

এই বলিয়া শিশু সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করিয়া কতই আক্ষেপ করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী তখন স্মিতমুখে ধীর গম্ভীরে বালককে আলিঙ্গন করিলেন। সভাস্থ লোক মোহিত-বিস্মিত-স্তম্ভিত! যাহা হউক এই দিবস নিয়মিত কার্য্যাদির পরে আর্য্যধর্ম্মাবনতির কারণ নির্ণয়ার্থ বিশেষ আলোচনার জন্য কতিপয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নির্ব্বাচিত হইয়া সভাবসান হইল।

৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম দিন। ২১শে, ২২শে, ২৩শে ও ২৪শে ফাল্গুণ।
বৃহস্পতি, শুক্র, শনি ও রবিবার।

পণ্ডিতগণ-গঠিত মন্ত্রণা সভায় যথা নিয়মে, কারণালোচনা হইতে লাগিল এবং সাধারণ সভায় শাস্ত্র-ব্যাখ্যা, পুরাণ পাঠ, ধর্ম্মোপদেশ, সংস্কৃত, হিন্দী ও বাঙ্গালা ধর্ম্ম-সংগীত ও হরিনাম সংকীর্ত্তনাদির যথাবিহিত সুসম্পাদন দ্বারা এই কয়েকদিনের কার্য্য শেষ হইল। ৺রামজীর মন্দির-ভঙ্গ-জনিত-হাঙ্গামার, পরিণামরূপ বিষম রাজনৈতিক আঘাত পাইয়া কিছুদিন ৺কাশীধাম সর্ব্ববিধ সাধারণ হিতকর বিষয়ে—বিশেষতঃ ধর্ম্মান্দোলনাদি বিষয়ে যেন নির্জীব ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু সনাতন আর্য্যধর্ম্মের এমনই অপূর্ব্ব মাহিমা, সুপণ্ডিত ও সুবক্তাগণের শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও ধর্ম্মোপদেশাদির এমনই আশ্চর্য্য প্রভাব, আর ভগবন্নাম কীর্ত্তনের এমনই মহিমাময়ী মাদকতা, যে এই কয়েকদিনের ধর্ম্মমহামণ্ডলের কার্য্যানুষ্ঠানেই সমগ্র কাশীধাম আনন্দোৎ-

সাহে যেন উচ্ছসিত হইয়া উঠিল। ১০ম দিন হইতে সভা-বাটিকায় আশাতীত জন-স্রোত ও উদ্দীপ্ত উল্লাস-স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল।

১১শ, ১২শ ও ১৩শ দিন। ২৫শে, ২৬শে ও ২৭শে ফাল্গুণ।

সোম, মঙ্গল ও বুধবার।

সভাপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত বাসবাপ্পাজী কোন অনিবার্য্য পারিবারিক কারণে মহীশূরাধিপ কর্ত্তৃক তাড়িতবার্ত্তাযোগে আহূত হইয়া, মহীশূর প্রতিগমনে বাধ্য হওয়ায়, তাঁহার কার্য্যভার রাজা শ্রীশশীশেখর রায় বাহাদুরকে অর্পণ করতঃ স্বদেশ গমন করেন। রাজা শশীশেখরও অতি সুচারুরূপে তৎকার্য্য নির্ব্বাহে ব্রতী ছিলেন। এই কয়েকদিন অন্যান্য বিবিধ নিয়মিত অনুষ্ঠানের সহিত ধর্ম্মাবনতির বিশেষ কারণ, সামাজিক শৈথিল্য ও বিশৃঙ্খলা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হইয়া, তন্নিরাকরণার্থ ভারতীয় হিন্দুজাতির ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় সমাজ বন্ধনের বিহিত উদ্যোগ করিবার মন্ত্রণা হইল। আর সমস্ত ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে "ধর্ম্মমহামণ্ডল" স্থাপন করতঃ শ্রীশ্রী৺ কাশীধামে তাহার কেন্দ্র মহামণ্ডল প্রতিষ্ঠা করা স্থিরীকৃত ও তদর্থে কাশীধামস্থ প্রধান প্রধান পণ্ডিত ও রেইস্‌গণের সমবায়ে এক কার্য্য-নির্ব্বাহ সভা গঠিত হওয়া সিদ্ধান্ত হইল।

---

১৪ শ, ১৫ শ, ও ১৬ শ, দিন। ২৮শে ২৯ শে ও ৩০ শে ফাল্গুণ।

বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার।

এই কয়দিবস স্থানীয় ও কতিপয় বিদেশীয় পণ্ডিত ও ধর্ম্মসভাসমূহের প্রতিনিধি বর্গ কর্ত্তৃক ধর্ম্মাবনতির কারণ ও তৎপ্রতীকারোপায় বিভিন্ন যুক্তি, প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত সহকারে বিশদ ও বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছিল। পণ্ডিত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন "(নবদ্বীপ)" পণ্ডিত জগচ্চন্দ্র সার্ব্বভৌম (বিক্রমপুর) পণ্ডিত রজনীকান্ত ন্যায়রত্ন (মূলাজোড়) পণ্ডিত গোপীনাথ (লাহোর), পণ্ডিত কুন্দনলাল (অযোধ্যা), পণ্ডিত সূর্য্যপ্রসাদ (এলাহাবাদ) পণ্ডিত জগন্নাথ পৌরাণিক (সিন্ধুপ্রদেশ) পণ্ডিত গোপীনাথ বেদপাঠী (পঞ্জাব), পণ্ডিত বদ্রিনারায়ণ চৌধুরী (মৃজাপুর) পণ্ডিত শঙ্করবাদী, পণ্ডিত ভূধর শর্ম্মা

(বেদব্যাস সম্পাদক, কলিকাতা) পণ্ডিত শম্ভুনাথ শুকুল (কাশীধাম) পণ্ডিত শ্রীনারায়ণ শাস্ত্রী (কাশীধাম) ডাক্তার কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঢাকা বিক্রমপুর) শ্রীযুক্ত শরদেন্দু মিত্র (ধর্ম্মরক্ষণী সভা, (বরিশাল) উক্ত বিষয়ে স্ব স্ব অভিমত বিশদ রূপে প্রদান করিলেন, এতদ্ব্যতীত এই সম্বন্ধে বিভিন্ন ধর্ম্ম-সভা-সমিতি হইতে যে সমস্ত লিখিত প্রবন্ধ প্রেরিত হইয়াছিল, বেদব্যাস সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূধর শর্ম্মা কর্ত্তৃক সভাস্থলে পঠিত ও স্থল বিশেষে ব্যাখ্যাত হইল। এই কয় দিবস সভার অন্যান্য কার্য্যান্তে মহারাষ্ট্র দেশ হইতে আগত অনেক পুরাণ পারদর্শী পণ্ডিত ও সুগায়ক, ভগবদ্ভক্তি ও অপর বিবিধ ধর্ম্মোপদেশ পূর্ণ সুমধুর কথকতার সহিত এমন অপূর্ব্ব ভজন সঙ্গীত গান করিয়াছিলেন যে, স্বকর্ণে শ্রবণ ব্যতীত কোনপ্রকার বর্ণনাতে তাহার সহস্রাংশের একাংশ মাধুর্য্যও অনুমেয় নহে। যেমন তাঁহার মূর্ত্তিখানির সৌন্দর্য্য মাখা গাম্ভীর্য্য, তেমনই তাঁহার কথকতার ভক্তি-রস-মন্থর-মোহন মাধুর্য্য। যেমন সুন্দর তাঁহার তান-লয়-বিশুদ্ধ সংগীত শক্তি, ততোঽধিক সুন্দর তাঁহার সংস্কৃত শ্লোকাবলীর স্বুর সংযুক্ত উচ্চারণ ভঙ্গি; ফলতঃ বোধ- করি সভায় এমন পাষাণ-হৃদয় শ্রোতা কেহ ছিলেন না, যিনি সে ভজন সঙ্গীত শ্রবণে বিগলিত চিত্ত ও ক্ষণে ক্ষণে আত্মবিস্মৃতপ্রায় না হইয়াছেন।

---

১৭ শ দিন। ১ লা চৈত্র। রবিবার। (দোলপূর্ণিমা)।

এ দিবস শ্রীশ্রী৺ কাশীধামে স্থানীয় দোলযাত্রা উৎসবের বিবিধ অনুষ্ঠান থাকায় প্রত্যাহিক সভাধিবেশন স্থগিত রহিল, এবং সমস্তদিন ভারত ধর্ম্মমহা- মণ্ডলের আগামী কল্যকার শেষ মহাধিবেশনের মহা আয়োজন হইতে লাগিল এবং মহাধিবেশন-স্থানসন্নিকটস্থ শ্রীশ্রী৺ বটুক ভৈরবজীর বেশ-সজ্জা উৎসব অদ্য মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইল।

---

১৮ শ দিন।

ভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের মহাধিবেশন।

২ রা চৈত্র, সোমবার। কৃষ্ণা প্রতিপদ।

আজ অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দকানন কাশীধামে মহামহোৎসবের মহা আয়োজন হইতে লাগিল। অদ্যকার মহাধিবেশন ক্ষেত্রে অধিকারী ভেদে

উপবেশন শৃঙ্খলা সম্পাদনার্থ যে "টিকিট" প্রস্তুত হইয়াছিল, তল্লাভার্থ ৺ সাক্ষীবিনায়ক গণেশ ভবনে প্রবল জনস্রোত প্রবাহ হইতে লাগিল। সকলেই আগ্রহ-চঞ্চল-চিত্তে মহাধিবেশন দর্শনার্থ নির্ণীতস্থান কাশীনরেশের বিস্তীর্ণ কামাখ্যাবাটীর প্রসিদ্ধ দেওয়ান খানায় গমনের সময় প্রতীক্ষায় রহিলেন। ক্রমে বেলাধিক্য সহকারে 'সমগ্র' কাশীধামে যেন কি এক বৈদ্যুতিক শক্তিযোগে আনন্দোৎসাহ সঞ্চারিত হইতে লাগিল। বেলা ২ টার সময়ে কামাখ্যাবাটী যাত্রাকাল সময় নির্ণীত হইয়াছিল, কিন্তু উৎসাহোন্মত্ত জন-সাধারণ বেলা ১০ টা হইতেই ধর্ম্ম মণ্ডলের কার্য্যকারকগণকে তদর্থে উত্তেজিত করিতে লাগিল। ক্রমে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডদেব মধ্যগগণ হইতে ঈষৎ পশ্চিমেহেলিতে না হেলিতেই সাক্ষী বিনায়ক ভবনের বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ও ক্রমশঃ সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকার ত্রিতল পর্য্যন্ত লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। বেলা ১টার সময়ে বাঙ্গালী টোলার ৮।১০টী সংকীর্ত্তন গায়কদল নানাবিধ হিন্দুচিত্ত সাজ সজ্জাসহ সুমধুর "হরিসংকীর্ত্তন গাইতে ২ ও তৎসহ ধর্ম্মোন্মত্তায় নৃত্য করিতে করিতে উক্ত ভবনে উপনীত হইলেন। তৎপর বিবিধ বাদিত্র সহযোগে শত শত বিদ্যার্থীগণ কর্ত্তৃক প্রায় শত সংখ্যাধিক শঙ্খ যুগপৎ নিনাদিত হওয়ায়, একেবারে গগন-মেদিনী কাঁপাইয়া সমুদ্র গর্জ্জনবৎ ভীম ভৈরব গম্ভীর মহাধ্বনি সমুত্থিত হইল। সঙ্গে ২ "জয় নারায়ণজী কি জয়!" "জয় সনাতনধর্ম্ম কি জয়!" "জয় বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণাজী কি জয়!" "জয় ভারত ধর্ম্মমহামণ্ডল কি জয়!" ইত্যাদি বাক্যে চতুর্দ্দিকে মহোচ্চ জয় ধ্বনি হইতে লাগিল। আহা! সে দৃশ্য দেবদুর্ল্লভ! ৺কাশীধাম হিন্দুমাত্রেই সেই সময়ে যেন স্বধর্ম্মানুরাগের প্রবলতম উৎসাহে উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিয়াছিলেন। ক্রমে বেলা ৩ ঘটিকা উত্তীর্ণ হইল। তখন সুসজ্জিত রজত-সিংহাসনোপরি শ্রীশ্রী৺ শালগ্রামশীলা ও বেদ চতুষ্টয় বেদজ্ঞ বিদ্যার্থীগণ কর্ত্তৃক বাহিত, ও হরি সংকীর্ত্তন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া ক্রোশাধিক দূরবর্ত্তী পূর্ব্ব কথিত কামাখ্যা বাটীর দেওয়ান খানার সভা মণ্ডপাভিমুখে চলিলেন; সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ বাদ্যাদি, বিবিধ ধর্ম্ম-বাক্যাঙ্কিত নিশান, বিবিধ দেব মূর্ত্তি অঙ্কিত পটাবলী, ভেরী, ডঙ্কা, বহুবিধ মণিমুক্তা খচিত ছত্রদণ্ড ও আশা—সোটা, মহারাজ কাশীনরেশ প্রেরিত বহু অশ্বারোহী ও পদাতিক সিপাহী ইত্যাদি চলিল,

আর কাশীবাসী ও অপর বিবিধস্থানাগত অসংখ্য ব্যক্তিবৃন্দ মহোৎসাহে পশ্চাৎ ২ চলিতে লাগিলেন। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত-প্রতিনিধি ও স্থানীয় রেইসগণ বিবিধ জানবাহনারোহণে চলিলেন। রাজপথ লোকে লোকারণ্য। প্রায় অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় সেই অতি বিস্তারিত পুণ্যঃ তীর্থক্ষেত্রবৎ সভাক্ষেত্রে যাত্রীগণ সমবেত হইলেন। তখন একেবারে "নস্থানং তিলধারণে।" সভাস্থলে ৺কাশীধামস্থ সহস্রাধিক স্বামী দণ্ডী ও সন্ন্যাসী মহাত্মাগণের শুভ সমবায়ে যে অপূর্ব্ব দৃশ্য বিকশিত হইয়াছিল, তাহাতে বোধ হইতে লাগিল, যেন সত্য-ত্রেতাদি যুগের কোন মহাযজ্ঞ নির্ব্বাহার্থ ঋষিগণ তপোবন হইতে সমাগত হইয়াছেন। প্রথম স্তরে প্রায় সহস্রাধিক কষায় বস্ত্র-পরিহিত সাধু সন্ন্যাসী উপবিষ্ট, দ্বিতীয় স্তরেও প্রায় সহস্রাধিক পণ্ডিত ও বিদেশাগত প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক সুশোভিত, তৃতীয় স্তর কাশীস্থ ধনী মহাজন ও রেইসগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত, চতুর্থ স্তরে আপামর সাধারণ সহস্র হিন্দু সোৎসাহে উৎকর্ণে সমাসিত। লোকসংখ্যা আশাতীত হইয়াছিল, দশ হইতে পনের হাজার লোকসংখ্যা সকলে অনুমান করিয়াছিলেন। মহাজনতায় মহাভীড় ও কোলাহলে শান্তিস্থাপন অসাধ্য হইয়া উঠিল। টিকিট বিতরণের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিফল ও বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। যাহাহউক, বহু যত্নে ও বহু কষ্টে উদ্বেলিত লোক-সিন্ধু কথঞ্চিৎ শমিত ভাব ধারণ করিলে, মাল্যমুকুটমণ্ডিত মনোহর মূর্ত্তি, মূর্ত্তিমান স্বধর্ম্মানুরাগ—মহাভাগ—মহামণ্ডল-সভাপতি তাহিরপুরাধিপতি রাজা শ্রীযুক্ত শশীশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রজত-সিংহাসন-বিরাজিত শ্রীশ্রী৺নারায়ণজীর চরণে প্রণতি-প্রার্থনা-পুরঃসর মঞ্চোপরে দণ্ডায়মান হইলেন। কাশীশ্বর বিশ্বনাথ ও আনন্দময়ী অন্নপূর্ণার প্রধান সেবকদ্বয় প্রসাদী পুষ্পদ্বারা রাজা বাহাদুরকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। এই সময়ে ধর্ম্মমহামণ্ডলের এই মহাধিবেশনের আলোকচিত্র (ফটোগ্রাফ) গৃহীত হইল; অকস্মাৎ এই সময় এক অপূর্ব্ব দৃশ্য সকলের নয়ন গোচর হইল। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী-স্থাপিত নব-সমাজের জনৈক প্রধান নেতা ও কাশী আর্য্যসমাজের প্রাণস্বরূপ পণ্ডিত কৃপারাম মহোৎসাহে মাতোয়ারা হইয়া শ্রীশ্রী৺নারায়ণজির সিংহাসন তলে নিপতিত হইয়া নারায়ণজীর প্রসাদ ভিক্ষা করিলেন। এবং প্রকাশ্যভাবে আর্য্য-

সমাজ সহিত সমস্ত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিলেন। অনেক পূজক সিংহাসন হইতে প্রসাদী পুষ্প লইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তৎপরে রাজা শশীশেখরেশ্বর বিগত পক্ষাধিক কালব্যাপী সভায় আলোচিত স্বধর্ম্ম রক্ষার উপায় সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তসমূহ উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিলেন; তৎপর ইন্দোরের পণ্ডিত বলবন্ত নলকর প্রভৃতি কতিপয় সুপণ্ডিত হিন্দী ভাষায় উহার বিশদ ব্যাখা করিয়া জন সাধারণকে বুঝাইয়া দিলেন। পরে 'বেদব্যাস'-সম্পাদক ও বাঙ্গালা ধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রধান উদ্যমশীল কার্য্য-নির্ব্বাহক পণ্ডিত ভূধর শর্ম্মা ভারত-ধর্ম্মমহামণ্ডলের গৌরব, উপকারিতা ও আবশ্যকতা এতদর্থে সমগ্র ভারতের প্রগাঢ় সহানুভূতির পরিচয়সূচক বহু স্থান হইতে আগত বহুপত্র ও টেলিগ্রামের উল্লেখ পূর্ব্বক সর্ব্ব-সাধারণ্যে অত্যুচ্চ স্বরে সুগভীর ভাষায় ঘোষণা করিলেন। এই সময়ে, এই অতি-বিস্তৃত স্থানব্যাপী মহাজনতায় সকলেরই শ্রবণসৌকর্য্যার্থে, সভাপতি মহাশয়, পণ্ডিত গৌরিনাথ, পণ্ডিত বদ্রিনারায়ণ প্রভৃতি কতিপয় প্রতিনিধিকে ভিন্ন ভিন্ন দিকে এক কালীন বক্তৃতা করিতে নিযুক্ত করিলেন; আর সর্ব্ব-মধ্যস্থলে মঞ্চোপরে দণ্ডায়মান হইয়া ৺কাশীধামের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত সর্ব্ব-শাস্ত্র পারদর্শী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবকুমার শাস্ত্রী মহাশয় অপূর্ব্ব শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় সকলকে চমকিত করিয়া ধর্ম্মব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তদবসানে ইন্দোর মহারাজের গুরু ও রাজধানীর পণ্ডিত-প্রধান মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী মহোদয়, তদনন্তর স্থানীয় খ্যাতনামা প্রধান রেইস সধর্ম্মানুরাগী স্বদেশহিতৈষী বাবু প্রমোদাদাস মিত্র প্রভৃতির উদ্দীপনী বক্তৃতায় শ্রোতাগণের মহামণ্ডলের মহিমাবোধ ও স্বধর্ম্মোৎসাহের সঞ্চার হইলে, মহামান্য সভাপতি মহাশয়, সভাবাটিকার অধিপতি কাশীনরেশ প্রভৃতিকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। মহামান্যা ভারতেশ্বরী প্রভৃতির উদ্দেশে পুনঃপুনঃ সাধুবাদ ও জয়ধ্বনি পূর্ব্বক, অবশেষে ভারত ধর্ম্মমহামণ্ডল ও সনাতন আর্য্যধর্ম্মের সু-উচ্চ জয়োচ্চারণ করিতে করিতে সভা ভঙ্গ হইল। এবং তখন ভক্তগণ কর্ত্তৃক উদয়ে-ভক্তিভাবোচ্ছ্বাস মত্ততার সহিত কিয়ৎক্ষণ শ্রীশ্রীমধুর হরিনাম সংকীর্ত্তন ও শ্রীশ্রী৺ বটুক ভৈরবজীর আরতি ও পূজা হইল। এইরূপে মধ্যাহ্ন হইতে রজনী প্রহরেক পর্য্যন্ত ভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের

শেষ মহাধিবেশনের মহানুষ্ঠান, দেবাদিদেব কাশীশ্বর বিশ্বনাথের প্রসাদে, ভারত-ধর্ম্ম-কেন্দ্র কাশীক্ষেত্রে সুসম্পন্ন হইল।

পণ্ডিত সমূহ কর্তৃক বিনীত ধর্ম্মাবনতির কারণ সকলের সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ।

(১) সংস্কার হ্রাস। (২) বিদ্যা হ্রাস। (৩) বৃত্তি হ্রাস। (৪) আশ্রম ধর্ম্ম হ্রাস। (৫) ভোজন নিয়মাভাব। (৬) প্রাণধারন শক্তিনাশ। (৭) যুগধর্ম্ম। (৮) ঈশ্বরেচ্ছা। (৯) ধনাভাব। (১০) রোগগ্রস্ততা। (১১) পুরোহিত যজমানে উচিত ব্যবহারাভাব। (১২) শিক্ষাপ্রণালী বৈপরীত্য। (১৩) বিদেশীয়শিক্ষাপ্রভাব। (১৪) সংস্কৃতশিক্ষাভাব। (১৫) যথোচিতদণ্ডহ্রাস। (১৬) সামাজিক শক্তিহ্রাস। (১৭) নেতার অভাব। (১৮) অপাত্রবিদ্যা। (১৯) উপদেষ্টার অভাব। (২০) ধর্ম্মশাস্ত্রীয় ব্যবস্থার উপেক্ষা। (২২) অসদুপদেশ।

সিদ্ধান্ত পত্র।

শ্রীমদ্বিশ্বেশ্বরাধিষ্ঠিতপরমপবিত্রনগর্য্যাং কাশ্যাং সনাতনধর্ম্মপুষ্ট্যৈ সমধিষ্ঠিতায়াং ভারতধর্ম্মমহামণ্ডলসভায়াং সভাপতিমহোদয়ৈরস্মিন্ ভারতে নিরন্তরং প্রচরিতস্য সনাতনধর্ম্মস্য কৈর্বা কারণৈরয়ং পরিদৃশ্যমানো হ্রাসঃ কে বা তন্নিবৃত্ত্যুপায়া ইতি পৃষ্টে— কাশীস্থ ধর্ম্মমহামণ্ডল বিদ্বাংস শিক্ষা--

হ্রাস, সামাজিকশক্তিহ্রাস, ধর্ম্মবিশ্বাস হ্রাস, এব প্রধানভূতা ধর্মহ্রাসহেতবঃ এতেবচান্তেষামপি ধর্মহ্রাসকারণনামন্ত র্ভাবো ভবিতুমর্হতি. এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান —সামাজিকশক্তি সম্পাদন—সুশিক্ষাপ্রচারা. এব মুখ্যতয়া ধর্ম্মহ্রাসনিবারকা ধর্ম্মপ্রচারোপায়াশ্চেতি নিশ্চিন্বন্তি।

পূর্বোক্তোপায়ত্রয়সংপাদনায় ধর্ম্মমহামণ্ডলদ্বারেদানীং নির্ণীতকার্য্যাণি যথা।

১—ধর্মানুষ্ঠানসম্পাদনায়াগামিবৈক্রম ১৯৪৯ সংবৎসরে আশ্বিন শুক্ল-নবম্যাং ভারতীয়সকলধর্ম্মসভাঃ পরস্পরং কৃতসম্মতিকাঃ পূর্ব্বং কৃতনিশ্চয়াঃ পরমশ্রদ্ধয়া সনাতনধর্ম্মাপরিহ্রাসায় ধর্মবিবৃদ্ধয়ে চ স্বস্বোপাস্যদেবতাঃ প্রার্থয়েরন্।

২—সামাজিকশক্তিসংপাদনায় সমস্তধর্ম্মসভানামৈকমত্যং পরমাবশ্যকমিতি সর্ব্বেষু প্রদেশেষু ধর্ম্মমহামণ্ডলোদ্দেশ্যানুসারেণ কার্য্যসংপাদক ধর্মমণ্ডলানি সংস্থাপনীয়ানি তত্রৈক। কেন্দ্রসভাপি সংস্থাপনীয়া।

৩—সুশিক্ষাপ্রচারায় ভারতবর্ষীয়সমস্তপ্রদেশেষু সনাতন ধর্মোপদেশকাশ্চ প্রেষণীয়াঃ। যে প্রতিদেশং স্বস্বোপদেশদ্বারা ধর্মমুপচিনুয়ুঃ। নৈতিকসামাজিক যুগধর্মাপদ্ধর্মাদিব্যবস্থাপকাশ্চ লঘবো নিবন্ধাশ্চপ্রকাশিতাঃ স্যুঃ যেন সাধারণ-জনা অপি যাথাতথ্যেন ধর্মতত্ত্বমধিগচ্ছেয়ুঃ। সংস্কৃতবিদ্যানাং সদাচারস্য চ প্রচারায় সংস্কৃতবিদ্যাভ্যাসিনো বিদ্যার্থিনঃ সুপরীক্ষিতাঃ বৃত্তিং পারিতোষি-কঞ্চ লভেরন এবং তেষাং যথাবিধি পঠনায় সংস্কৃতপাঠশালা অপি স্থাপিতা ভবেয়ুঃ।

পূর্বোক্ত সমস্তকার্য্যনির্বাহায়ৈকা কার্য্যকারিণী সভাপি স্থাপিতা স্যাৎ যদ্-দ্বারা পাঞ্চালবঙ্গাদিবিবিধদেশস্থিতপ্রাদেশিকধর্মমণ্ডলানি মিথঃ সংবাদপুরঃসরং কর্ত্তব্যাংশবিবেচনাদিকার্য্যাণি সাধু সম্পাদয়েয়ুঃ তদৈতৎকার্য্যনির্বাহকসভাস্থাপনায় পত্রান্তরলিখিতমহাশয়ানামেকা বাস্তরসভাপি স্থাপনীয়া।

বারাণশী মিং চৈত্র কৃষ্ণ ১ সম্বত ১৯৪৮।

শ্রীশশিশেখরেশ্বর শর্ম্মা।

মহাধিবেসনোপলক্ষে রচিত ও গীত, সঙ্গীত সমূহ।

শিবপদসরসিজযুগলমশঙ্কং চিন্তয় মনসি সদা শুভদং বুধদলিতভবার্জ্জিতপঙ্কম্। শ্রুতিপথমনুসর জহিহি কুরীতিং ভাবয় সুমতিজনেন সমং হৃদি সকলশুভাবহনীতিম্ ত্যজ মতমনুচিতমশুভনিদানং ধারয় মুনিবচনাদরমাস্তিকজনকৃতসদ্গুণগানম্।

গীতিপ্রকারান্তরম্।

জয়তু ভারতে ধর্ম্মমণ্ডলং কলিমলনাশনশীলম্।
বিবিধবিশারদধীসমুল্লসদ্দুর্মতমর্দনলীলম্॥
আস্তিকসজ্জনবিদ্বদগ্রণীসম্পাদিতদৃঢ়মূলম্।
সকলমহীতলবাসী ধার্মিকশ্রেয়সি ভৃশমনুকূলম্॥
বিপুলন্যয়যুক্তিকসূপদেশমকৃত্রদক্রতদুর্মতিতুলম্।
শ্রীশিবদয়য়া মোদতাং সদা বৈদিকমতমনুবেলম্॥

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর শাস্ত্রী।

পীলু।

ধর্ম্মদশাং পশ্যত পশ্যত হো ॥ ১ ॥
আর্যগণা ইতএতে ভাহো একাংস্মিং চৈনং রক্ষত হো ॥ ২ ॥
জৈনপীড়িতে যবনবিক্ষতেকথমস্মিন্দৃষ্টিং ন কুরুত হো ॥
হে ইঙ্লিশভাষাজ্ঞা ক্ষত ইহ কিমিতি লবণ মুষ্টিং বিকিরত হো ॥ ৪ ॥
ঈদৃশমথ্যাযাপি দুর্দশাং যেন জনকভাবোহপাল্যত হো ॥ ৫ ॥
কুস্বতেভ্যো হস্মচ্চিকিৎসাশাং কুরুতে যস্তং কিং নাবত হো ॥ ৬ ॥
ধর্ম্মমহামংডলমাগচ্ছত তত্রামালস্যং দবয়ত হো ॥
গোপীদাসো বিনয়েনযাচতে শ্রুতিমার্গে চেতাংসি ধরত হো ॥

রাগ যথারুচি।

মহৎস্বধর্ম্মমংডলং জয়েন বর্দ্ধতাম্
প্রপালনে চ তস্য নো মতিঃ প্রবর্ত্ততাম্।
প্রচারয়েচ্চ সদ্গুণান্ন ঈশ্বরো ভুবি
শ্রুতং সদত্র নীবৃতি জয়ং সমশাম্নুতাম্।
হরৌ চ নঃ সদৈব ভক্তিরস্তনিশ্চলা
পরস্পরং চ মিত্রতা জনেষু জায়তাম্।
দিনে দিনে চ নাশমাপ্নুবন্তু দুর্গুণাঃ
সদর্থনেয়মমীশ্বরেণ নঃ প্রপূর্যতাম্।
জনো হি গোপদাদিপাল এষ যাচতে
জনৈর্ম্মখেষু মানসং সদা প্রবর্ত্যতাম্।

ভজনের স্বর।

ইয়ে ধরম মণ্ডল হেঁা তোঁহারি নাথ, এ মহা আপদ মে উদ্ধারো।
তোঁহি করুণা বিনু কোয়ী শতক নাই কারুণা নেত্রে নেহারো ;—তোহি মাতাপিতা দাতা বিধাতা, শঙ্কট বিঘট নিবারো নাথ।
ভরসা চরণ ভরসা এক হরনাম, ভরসা পরশাদ তেরোং আওর ভরসা প্রভো দীন দয়াল হো, নোই এ্যায়ছে দীন সোবিচারো নাথ।

বাহার, মধ্যমান ঠেকা।১।

জাতীয় সম্মান গিয়েছে অনেক দিন, হে ভারত বাসীগণ, করিয়ে দেখ স্মরণ, সেই স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন, ভজন সাধন যত, সে দিন হয়েছে গত, যে দিন হয়েছে ভারত স্বধর্ম্ম হীন পাপাধীন।

আধুনিক পদ সম্মানে, আপনাকে ধন্যমানে, অভিমানে নাহি মানে মুনি সদৃশ প্রবীণ; আপন ভেবে যেমন কাকে, পরভিব পেলে থাকে, তেমনি মানে মানীলোকে, এমনি ভ্রান্ত মলিন।

কোথাগেল সে স্বভাব, কোথাগেল সে প্রভাব, কালের প্রভাবে এবে ভারত প্রভা বিহীন;—আর কি প্রভা প্রকাশিবে, যজ্ঞাগ্নি গিয়াছে নিভে, ইন্দ্র যায় ইন্দ্রত্বলভে, সে এক দিন আর এ এক দিন।

খাম্বাজ—একতালা।২।

ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলে, যোগ দান করি হিন্দু সকলে, মন্ত্র প্রায় ধর্ম্ম, ধারণ করি বলে, মুক্তি সাধন কর সুযুক্তি বিধানে।

ঘটেছে এককালে ধর্ম্ম নিবন্ধন, জলধি মন্থন জলধি বন্ধন, স্মরণ করি তাই হে আর্য্য নন্দন, কার্য্য কর বিশ্বেশ্বর সন্নিধানে।

বেদ প্রনিহিত ধর্ম্ম সুমহান, ভারত মাতার ধর্ম্ম মাত্র প্রাণ, মাতৃ হত্যা আজ হইয়ে সন্তান, দেখিতেছ কোন্ প্রাণে;—স্বধর্ম্মেনিধন যদি হতে হয়, সেও ভাল, পরধর্ম্মে বড় ভয়, আর জেনো যথাধর্ম্ম তথাজয়, বিদিত পূজিত পুরাণে প্রমাণে।

কীর্ত্তনাঙ্গ।৩।

এস আমরা বিপদ কালে, দুর্গাব'লে মাকে ডাকি। মাকে ডাকি মাকে ডাকি পিতা বিশ্বনাথকে ডাকি, তোমরা, জাননাকি ভারত ভ্রাতা, দুর্ব্বলের বল পিতামাতা বিশ্ব, পিতামাতায় ধর্ম্মের তরে, আমরা, ডাকি এস সকাতরে। হিন্দুর, ধর্ম্ম বই আর কি ধন আছে, বল, তাছেড়ে যাব কার কাছে।

সব গেলে সব সইতে পারি, প্রাণের ধর্ম্ম ধন যে ছাড়তে নারি।

পঞ্চ, পাণ্ডবের কাণ্ড সবাদি, তাঁরা ধর্ম্মের তরে বন বাসী। কোথা যোগেশ্বর যোগেশ্বরী, দাও ভয়ে অভয় চরণ তরী।

বিবাহ।

১

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

স্ত্রীপুরুষের বিবাহ বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে, আর্য্য মহর্ষিগণ সহবাস সম্বন্ধে যে সকল নিগূঢ় তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। পশুদের ন্যায় সহবাস সম্বন্ধে কোন নিয়ম পালন না করিলে—যথেচ্ছাচার ও অসংযমী হইলে স্ত্রীপুরুষের যেরূপ শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি হয়, তাহাদের সন্তান সন্ততিদেরও তদাপেক্ষা অধিকতর রূপে অনিষ্ট হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে সহবাস সম্বন্ধে কোন সুনিয়ম পালন নাকরায় এদেশের গুরুতর অনিষ্ট হইতেছে। "বাল্য বিবাহে" সমাজের কোন অনিষ্টই করিতেছে না, সহবাস সম্বন্ধে কোন নিয়ম প্রতিপালন না করাতেই সমাজের ক্ষতি হইতেছে। আমরা সহবাস সম্বন্ধে আর্য্য মহর্ষিদিগের উপদেশ এবং ব্যবস্থা সংক্ষেপে নিম্নলিখিত কয়েক ভাগে আলোচনা করিব। যথাঃ—

১। স্ত্রীজাতির ঋতুর সময়?
২। ঋতু কি?
৩। ঋতুর সময় যে যে নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য।
৪। সহবাসের সময়।
৫। পুত্র কন্যা হওয়ার কারণ।
৬। গর্ভাবস্থায় যে যে নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য।
৭। গর্ভ সঞ্চারের প্রণালী।
৮। সন্তান বিকৃতাঙ্গের বিবরণ।
৯। যমজ সন্তান হওয়ার কারণ।
১০। সন্তানের বিবিধ বর্ণের কারণ।

১। স্ত্রীজাতির ঋতুর সময়।

উষ্ণ প্রধান দেশে অধিকাংশ স্ত্রীলোকের অল্প বয়সে রজোদর্শন হয়। শীত প্রধান দেশে ১৫। ১৬ বর্ষের নীচে যুবতীরা প্রায়ই রজস্বলা হয় না। হারিস সাহেব বলেন এদেশের শতকরা ১। ২ জন ৯ বৎসরে, ৩। ৪ জন ১০ বৎসরে ৮ জন ১১ বৎসরে এবং ২৫ জন ১২ বৎসরে প্রথম ঋতুমতী হয়। কিন্তু লণ্ডন ও পারিশ সহরে হাজার করা একজন মাত্র ৯ বৎসরে ঋতুমতী হয়। ভারতবর্ষবাসী মেমদিগের দেরীতে ঋতু প্রকাশ পায়। ডাক্তার চর্চ্চিল সাহেব বলেন এদেশের অধিকাংশই ১১। ১২ বৎসরে প্রথম ঋতুমতী হইয়া থাকে এবং ৩০ হইতে ৫০ বৎসরে ঋতু বন্ধ হয়। ইংলণ্ডে ৪৫ হইতে ৬০ বৎসরে ঋতু বন্ধ হয়। লাপ্লাণ্ড দেশে ২০। ২৫ বৎসরে প্রথম ঋতুমতী হন। সেই দেশের বয়স ও নিয়মানুসারে আমাদের সমাজে বিবাহ হওয়া কর্ত্তব্য কি?

(ক) অকালে বালিকাদের ঋতুমতী হওয়ার কারণ।

ডাক্তার প্লেফেয়ার মহোদয় লিখিয়াছেন, "স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থা, বিদ্যাশিক্ষা, এবং আহার বিহারের অবস্থানুযায়ী ঋতুর তারতম্য ঘটে।" ধনবান অর্থাৎ বিলাসিনী কন্যাগণের শারীরিক পরিশ্রম না করায় উত্তেজক ও গুরুদ্রব্য আহারে অকালে ঋতুমতী হন। দরিদ্রা রমণীগণ (প্রাচীনা রমণীগণ ধনবানের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও দরিদ্রা রমণীদের ন্যায় শারীরিক পরিশ্রম করিতেন) নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম ও সাধারণ আহার ইত্যাদি কারণে বিলম্বে ঋতুবতী হন। পাশ্চাত্য দেশের যুবক ও যুবতীগণের অকাল বার্দ্ধক্য সম্বন্ধে বিখ্যাত ডাক্তার রডক মহোদয় লিখিয়াছেনঃ—"এদেশের (বিলাত মার্কিন প্রভৃতি দেশের) আধুনিক সামাজিক অবস্থা ও শিক্ষার দরুণ তথাকার লোকদিগের জীবনের অবস্থা এত শীঘ্র শীঘ্র পরিবর্ত্তন হয় যে, যে সকল চক্রের ক্রিয়া ও শারীরিক পরিবর্ত্তন কয়েক বৎসর পরে হওয়া উচিত তাহা কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই প্রকাশ পায়। এইরূপ বালক ও বালিকাদিগকে স্কুল পরিত্যাগের পূর্ব্বেই পূর্ণবয়স্ক যুবক ও যুবতী বলিয়া বোধ হয়।"

২। ঋতু কি?

গর্ভধারণের জন্য স্ত্রী জাতির প্রতি ২৮ দিন অন্তর জরায়ু হইতে যে রক্ত স্রাব হয় তাহাকে ঋতু বলা যায়। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে রক্ত কণা, শ্লেষ্মা বিন্দু, অধিক সংখ্যক বহিস্তকের আইর ইত্যাদি ঋতুর রক্তে দেখা যায়।

৩। ঋতুর সময় যে যে নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য।

১। প্লীনী নামক জনৈক পাশ্চাত্য বিজ্ঞাণবিৎ পণ্ডিত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, "ঋতুমতী নারী অতিশয় অপবিত্রাথাকেন। সে যে স্থানে অবস্থান করে তথাকার উদ্‌ভিদে বিশেষ প্রকার পীড়াজন্মে; "মদ্য অম্লত্ব প্রাপ্ত হয় এবং এই প্রকার অনেক বিকৃত অবস্থা সংঘটীত হয়।" ইংলণ্ডদেশেও কোন কোন স্থানে অদ্যাপিও ঋতুবতী নারীগণ বিশেষ সতর্কতার সহিত থাকেন। এদেশেরত কথাই নাই। অতি পূর্ব্বকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এদেশে হিন্দুদের মধ্যে সর্ব্বত্রই (কতিপয় সভ্য ও শিক্ষিত নামধারী হতভাগ্য লোক ইহাকে "কুসংস্কার" মনে করিয়া কোন নিয়মের অধীনে থাকেন না!!) ঋতুমতী নারী অতিশয় অস্পৃশ্য জীব। ঋতুকালে সে পতিতা থাকে ব্রহ্মচারীর ন্যায় স্বতন্ত্র স্থানে শয়ন, স্বতন্ত্র ভোজনাদি করিয়া থাকেন। পাঠক! ইহা "কুসংস্কার" প্রথা নয়। প্রাচীন হিন্দুগণ বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তত্ত্ব অবগত হইয়া এই সকল সুপ্রথা সমাজে প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন।

২। ঋতুর সময় সহবাস করিতে আর্য্য ঋষিগণ পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশের অনেক বিজ্ঞ বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলেন ও লিখিয়াছেন যে, ঋতুর সময় সহবাস করিলে পুরুষের প্রস্রাব যন্ত্রের কোন কোন গুরুতর পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে। এ ভিন্ন সে সময় অত্যাধিক উত্তেজনা প্রাপ্ত হইলে স্ত্রীলোকের অত্যাধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হইতে পারে। পেনডিক হিমোটাসিল (অর্থাৎ যে পীড়াতে স্ত্রীলোকের বস্তি কোঠরের গহ্বর মধ্যে কোন স্থানে রক্ত জমে এবং ঐ রক্ত থলীতে আবদ্ধ হয়, তবে তাহাকে "পেনডিক হিমোটাসিল কহে) নামক পীড়া ঋতুর সময় সহবাস বশতঃ উৎপন্ন হইতে পারে।

আয়ুর্ব্বেদে উক্ত আছে যে, যদি রজস্রাবের প্রথম কি দ্বিতীয় দিবসে

গর্ভ সঞ্চার হয় তাহা হইলে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার অত্যল্প কাল পরেই নিধন প্রাপ্ত হয়। তৃতীয় দিবসে সন্তান দুর্ব্বল পীড়িত, বিকলাঙ্গ ও অকালে নিধন প্রাপ্ত হয় কিন্তু যদি চতুর্থ দিবসেও শোণিত স্রাব হয় তবে শুক্র ধৌত হইয়া গেলে গর্ভ সঞ্চার হয় না। এই সকল গুরুতর নানা কারণেই হিন্দু শাস্ত্রকর্ত্তাগণ নানাবিধ সুনিয়ম প্রচলন করিয়া গিয়াছেন। আমরা সেই সকল সুনিয়ম গুলি ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিয়া "সভ্য" হওয়ার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি !! বর্ত্তমান সময়ে শিশুদের অকাল মৃত্যুর কারণ এই সকল সুনিয়ম গুলি উপেক্ষা করা সর্ব্বপ্রধান কারণ নয় কি? ফলতঃ এই সকল গুরুতর নানা কারণেই বোধ হয় ভগবান মনু লিখিয়া গিয়াছেন:—

"নোপগচ্ছেৎ প্রমত্তোঽপিস্ত্রিয় মার্ত্তব দর্শনে।
সমান শয়নে চৈব ন শয়ীত তয়া সহ॥"

মনুসংহিতা, ৪র্থ অধ্যায়। ৪০ শ্লোক।

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ একান্ত উত্তেজিত হইলেও রজোদর্শন নিষিদ্ধ দিনত্রয়ে স্ত্রীগমন করিবে না এবং তাহার সহিত এক শয্যাতে শয়ন করিবে না।

"রজসাভিপ্লুতাং নারীং নরস্য হ্যুপগচ্ছতঃ।
প্রজ্ঞাতেজো বলঞ্চক্ষু রায়ু শৈব প্রহীয়তে॥ ঐ॥ ৪১॥

অর্থাৎ যে পুরুষ পুষ্পিত নারীতে গমন করে তাহার বুদ্ধি, তেজঃ, বল, চক্ষু পরমায়ু সমুদয় নষ্ট হয়।

৩। হিন্দু শাস্ত্রকর্ত্তাগণ ঋতুস্নানের পর পতি অথবা সূর্য্য দর্শন করিতে ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহার ও অতি সুন্দর বৈজ্ঞানিক কারণ রহিয়াছে. আমরা "গর্ভাবস্থায় স্ত্রীজাতির যে যে নিয়মে থাকা কর্ত্তব্য" প্রস্তাবে এ সম্বন্ধে সবিস্তার উদ্ধৃত করিব।

৪। প্রজাপতি দক্ষ বলিয়াছেন:—

"অঞ্জনাভ্যঞ্জনে স্নানং প্রবাসং দন্তধাবনম্।
নকুর্য্যাৎ সার্ত্তবা নারীগ্রহাণামীক্ষণং তথা॥
নখানাং কৃন্তনং রজ্জু তাম পত্রাদি বন্ধনম।
দগ্ধে শরাচে ভুঞ্জীতে পেয়ং চাঞ্জলিনা পিবেৎ॥"

অর্থাৎ নারী রজস্বলা হইলে তিন দিবস পর্য্যন্ত অঞ্জন (চক্ষে কাজল পরা)

অভ্যঙ্গ (তৈল হরিদ্রাদি মাখা), স্নান, বিদেশে গমন, দন্তমার্জ্জন, চন্দ্রগ্রহণ কি সূর্য্য গ্রহণ দেখা, নখ কর্ত্তন এবং রজ্জু নির্ম্মানাদি কার্য্য করিবে না। মৃত্তিকা পাত্রে ভোজন করিবে এবং পেয় দ্রব্য অঞ্জলী দ্বারা পান করিবে। মহর্ষি বশিষ্টদেবও এইরূপ বলিয়াছেন যথা:—"রজস্বলা নারী তিন দিবস পর্য্যন্ত অঞ্জন ব্যবহার করিবে না; তৈল মর্দ্দন করিবে না। জলমগ্ন হইয়া স্নান করিবে না, খট্টোপরি শয়ন করিবে না, দিবা নিদ্রা যাইবে না, অগ্নির তাপ লাগাইবে ন, রজ্জু নির্ম্মাণ করিবে না, দন্তমার্জ্জন করিবে না ও মাংস ভোজন করিবে না।"

৪। সহবাসের সময়।

প্রাচীন আর্য্যেরা সকলেই একবাক্যে দিবাভাগে স্ত্রীগমন নিষিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। শ্রুতিতে দিবাভাগে সহবাস সম্বন্ধে লিখিত আছে যথা:—

"প্রাণং বা এতে প্রস্কন্ধতি যে দিবা রত্যা সংযুজ্যন্তে।
ব্রহ্মচর্চ্চাসমেব তৎযৎ রাত্রি সংযুজ্যন্তে॥"

অর্থাৎ যাহারা দিবসে স্ত্রীগমন করেন, তাঁহারা প্রাণকে ক্ষয় করেন।

যাহারা রাত্রি সংযুক্তা হন তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য করেন।

মহর্ষি শঙ্খ লিখিত স্পষ্টাভিধানে উল্লেখ করিয়াছেন:—"দিবাভাগে কখনও সহবাস করিবে না। ধর্ম্মবক্তা আপস্তম্ব মুনি বলেন:—"দিবাভাগে, সন্ধি সময় সহবাসে আয়ুনাশ হয়।

প্রাচীন আর্য্যেরা সহবাস সম্বন্ধে অনেক প্রকার নিয়ম পালন করিতেন। তন্মধ্যে কতিপয় তিথি ও নক্ষত্রে, সংক্রান্তি পর্ব্বদিনে, রুগ্নদেহে, হর্ষ ও বিষাদের সময় ইত্যাদিতে স্ত্রী সহবাস করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। ভগবান মনু বলিয়াছেন:—

"ঋতু কালাভিগামীস্যাৎ স্বদার নিরতসদা।
পর্ব্ববর্জ্জং ব্রজেচ্চৈনাং তদ্ব্রতো রতি কাম্যয়া॥
মনুসংহিতা, ৩য় অধ্যায়॥ ৪৫॥

অর্থাৎ পরদারের প্রতি অভিলাষ না করিয়া আপন ভার্য্যার প্রতি সতত অনুরক্ত থাকিবেক, অজাত পুত্র ব্যক্তি ঋতুকালীন অবশ্যই ভার্য্যা-গমন করিবেক, না করিলে পাপ জন্মে। ঋতু সময় ভিন্ন অন্য সময়ও সহবাস করিতে পারিবে, কিন্তু অমাবস্যাদি পুর্ব্বে গমন করিবে না।

আমাদের দেহ প্রকৃতির সহিত গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদির কি প্রকার সম্বন্ধ তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। সুতরাং তিথি বিশেষে নক্ষত্র বিশেষে সহবাস করিলে কি কি অনিষ্ট হয় তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু অমাবস্যাও পুর্ণিমা তিথিতে আমাদের শরীরে রসভাগ অধিক হয় সুতরাং শুক্রেরও পরিবর্ত্তন হয় অর্থাৎ শুক্রের রসভাগও অধিক হয়। সেই অত্যাধিক রসভাগ যুক্ত শুক্র অথবা বিকৃত শুক্র হইতে গর্ভ উৎপন্ন হইলে, সেই গর্ভস্থ সন্তান কখনই পুর্ণাঙ্গ, নিরোগী ও দীর্ঘায়ু হইতে পারে না। এ ভিন্ন অমাবস্যা ও পুর্ণিমা ইত্যাদি তিথিতে সহবাস করিলেই স্ত্রী এবং পুরুষের উভয়েরই অত্যন্ত বলক্ষয় হইয়া থাকে।

হর্ষ ও বিষাদ ও পর্ব্ব ইত্যাদি সময়ে মানসিক অবস্থা পরিবর্ত্তন হয়। অর্থাৎ কোন বিষাদের কারণ উপস্থিত হইলে মানসিক অবস্থা অত্যন্ত বিকৃত হয় সুতরাং শুক্রের অবস্থাও ন্যূনাধিক পরিমাণে বিকৃত কি অবস্থান্তর হয়, হর্ষ ইত্যাদি কারণেও শুক্রের অবস্থান্তর হওয়ার বিশেষ সম্ভব রহিয়াছে। এই সকল কারণেই ঐ সকল সময় সহবাস করিতে প্রাচীন ঋষিরা পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। বিকৃত অথবা অবস্থান্তর শুক্র ও শোণিতে কোন সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়া অকালে নিধন, অথবা দুর্ব্বল ও অল্পায়ু না হয়, কাজেই ইহাই তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য ছিল। আমরা এ সকল তত্ত্ব জানি না বুঝি না, "কুসংস্কার" ও "কুরুচি" বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকি !!

৫। পুত্র কন্যা হওয়ার কারণ।

এ সম্বন্ধে ভগবান মনু বলেন :—

"ঋতুঃ স্বাভাবিকঃ স্ত্রীণাং রাত্রয়ঃ ষোড়শ স্মৃতঃ।
চতুর্ভি-রিতবৈঃ সার্দ্ধমহোভিঃ সদ্বিগর্হিতৈঃ॥ ৪৬॥

তাসামাদ্যাশ্চতস্রস্তু নিন্দিতৈকাদশী চ যা।
ত্রয়োদশী চ শেষাস্তু প্রশস্তা দশ রাত্রয়ঃ॥ ৪৭॥
যুগ্মাসু পুত্রাজায়ন্তে স্ত্রিয়োঽযুগ্মাসু রাত্রিষু।
তস্মাদ্‌যুগ্মাসু পুত্রার্থী সংবিশেদার্ত্তবে স্ত্রীয়ং॥ ৪৮॥
পুমান পুংসোঽধিকে শুক্রে স্ত্রী ভবত্যধিকে স্ত্রীয়াঃ।
সমেহ পুমান পুংস্ত্রীয়ৌ বা ক্ষীণেঽল্পে চ বিপর্য্যযঃ ৪৯
নিন্দ্যাস্বষ্টাসু চান্যাসু স্ত্রীয়ো রাত্রিষু বর্জ্জয়ন।
ব্রহ্মচার্য্যেব ভবতি যত্র তত্রাশ্রমে বসন্॥ ৫০॥

অর্থাৎ স্ত্রীলোকের ঋতু ষোড়শ রাত্রি স্বাভাবিক জানিবে তন্মধ্যে শোণিত শ্রাবযুক্ত চারি রাত্রি অতি নিন্দিত হয়॥ ৪৬॥ তন্মধ্যে প্রথম চারি রাত্রি ও একাদশ ও ত্রয়োদশ রাত্রি, এই ছয় রাত্রি ঋতুমতী স্ত্রীগমণে নিষিদ্ধ হয়; তদতিরিক্ত দশরাত্রি গমনে, প্রশস্ত জানিবে॥ ৪৭॥ এই পূর্ব্বোক্ত দশ রাত্রির মধ্যে ছয়, অষ্ট, দশ প্রভৃতি যুগ্মদিনে স্ত্রীতে গমন করিলে পুত্র জন্মে এবং সাত প্রভৃতি অযুগ্ম দিনে গমন করিলে কন্যাজন্মে। অতএব পুত্র প্রার্থী ব্যক্তিগণ ঋতুকালে (ষোড়শ দিনের মধ্যে) যুগ্ম দিনে স্ত্রীতে গমন করিবেক॥ ৪৮॥ পুরুষের বীর্য্যাধিক্য হইলে অযুগ্ম রাত্রিতেও পুত্রজন্মে, স্ত্রীর বীর্য্যাধিক্য হইলে যুগ্ম রাত্রিতেও কন্যাহয়। যদি উভয়ের বীর্য্য সমান হয় তবে ক্লীব বা যমজ পুত্রকন্যা হয়, যদি উভয়ের বীর্য্য অসার বা অল্প হয় তবে গর্ভ হয় না। ৪৯। যিনি পূর্ব্বোক্ত নিন্দিত ছয় রাত্রি ও তদ্ব্যতিরিক্ত অনিন্দিত অষ্টরাত্রি এই চতুর্দ্দশরাত্রিতে স্ত্রী সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট পর্ব্ব বর্জ্জিত দুই রাত্রিতে স্ত্রী সংসর্গ করেন তিনি যে কোন আশ্রমবাসী হউন না কেন তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যের হানি হয় না। ৫০। আয়ুর্ব্বেদ কর্ত্তাগণ ভগবান মনুর এই ব্যবস্থামতেই তাঁহারা পুত্র কন্যা হওয়ার কারণ উল্লেখ করিয়াছেন। ভগবান মনু ৪৯ শ্লোকে যে কথা লিখিয়াছেন তাহা বিশেষ বিশেষ স্থলে হইয়া থাকে নতুবা সাধারণতঃ ৪৮ শ্লোক অনুযায়ীই পুত্র ও কন্যা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এখন যেমন লোক কিসে ঘোড়া ভাল হইবে, কিসে কুকুর ভাল হইবে, কিসে গাছ ভাল হইবে ইত্যাদি বাহ্যিক উন্নতির চিন্তা করিয়া থাকেন ও তাহার উপায় অবধারণ করেন, প্রাচীন কালের আর্য্য মহোদয়গণ তেমনি কিসে মানুষ ভাল হইবে কেবল মাত্র তাহারই চিন্তা করিতেন। কিকার্য্য করিলে, কি নিয়মে থাকিলে উৎকৃষ্ট সন্তান জন্মিবে তাঁহাদের ইহাই সর্ব্ব প্রধান চিন্তা ছিল। ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, বলশালী বিক্রমান্বিত ও সুশীল পুত্র কন্যা উৎপাদনকরাই তাঁহাদের সর্ব্ব প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বলা বাহুল্য যে, তজ্জন্য তাঁহারা প্রথম হইতে ক্ষেত্র সংস্কার অর্থাৎ যাহাতে সন্তান উৎপাদন করিতে হইবে, তাহার বিবিধ সংস্কার করিতেন। স্ব স্ব সহধর্ম্মিণীগণকে রজোদর্শনাবধি নানাবিধ নিয়মের অধীনে রাখিতেন। তাঁহারাও (প্রাচীন আর্য্য রমণীগণ) রজোদর্শন দিন হইতে প্রসবকাল পর্য্যন্ত আপন আপন পতির অথবা শাস্ত্রের ব্যবস্থানুসারে অবস্থান করিতেন। প্রাচীন কালের রমণীরা অশেষ বিধ কষ্ট স্বীকার করিয়া নানা বিধ কঠোর নিয়ম পালন করিতেন। সূক্ষ্মভাবে পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট দেখা যাইবে যে, প্রাচীন কালে অর্থাৎ যে সময় রমণীগণ ঐ সকল নানাবিধ সুনিয়ম পালন করিতেন, সে সময়ের লোক সকল অরোগী, দৃঢ়কায়, বলিষ্ঠ, সরল স্বভাব, ধার্ম্মিক ও দীর্ঘায়ু হইতেন। এখনকার "শিক্ষিতা" ও "সভ্যা" রমণীরা ইহার একটি সুনিয়মও রীতিমত পালন করেন না। পাশ্চাত্য দেশ সমুহেও সহবাস ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন প্রকার বিধিবদ্ধ নিয়ম নাই; এ ভিন্ন পাশ্চাত্য দেশের বিজ্ঞানেও এ পর্য্যন্ত এ সকল তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক তত্ব সমুহ বিষদরূপে আবিস্কার হয় নাই; সুতরাং পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষিত মহোদয়েরা যে ঐ সকল নানা বিধ সুনিয়মগুলিকে "কুসংস্কার" ইত্যাদি বলিয়া উপেক্ষা করিবেন ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? যাহাহউক বর্ত্তমান সময়ে প্রাচীন ঐ সকল সুনিয়ম প্রতিপালন না করায় সন্তান সন্ততিও সর্ব্ব প্রকারে হীন হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে যাহারা "বালিকা বিবাহে" দেশ রসাতলে গেল বলিয়া প্রতি নিয়তঃ চীৎকার করিতেছেন, তাঁহাদের উচিত সর্ব্বাগ্রে সমাজে সেই প্রাচীন নিয়ম সমূহ দৃঢ়ভাবে পুনরায় প্রচলন করা। নতুবা তাঁহাদের চীৎকারই মাত্র সার হইবে ফলে সমাজের কোনই মঙ্গল হইবেনা।

৬। গর্ভাবস্থায় কি কি নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য।

১। ভগবান মনু ও মহাযোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেনঃ—

" নারী রজোদর্শন দিনাবধি ১৬ দিন পর্য্যন্ত গর্ভধারণের যোগ্যা থাকে। অতএব ঐ ১৬ দিবস মধ্যে যুগ্মদিনে রাত্রি একবার মাত্র অভিগমন করিবে।"

২। সংস্কার ময়ুখ গ্রন্থে, স্ত্রীজাতির গর্ভাবস্থার সময় পতিও গর্ভিণীর নিম্ন লিখিত নিয়মগুলি পালন করিতে আদেশ আছে। তন্মধ্যে পতির নিয়ম গুলি অগ্রে উল্লেখ করা হইল। তথাঃ—

"বপনং মৈথুনং তীর্থং বর্জ্জয়েৎগুর্ব্বিণী-পতিঃ।
শ্রাদ্ধঞ্চ সপ্তমান্মাসাদূর্দ্ধঞ্চান্যচ্চ বেদবিৎ॥"

অর্থাৎ পত্নীর গর্ভ ছয় মাসকাল পূর্ণ হইলে পতি মস্তক মুণ্ডন, স্ত্রী-সঙ্গ, তীর্থ যাত্রা, শ্রাদ্ধান্নভোজন এবং অন্য শাস্ত্রে যাহা নিষিদ্ধ বলিরা নির্ণীত আছে, সেই সমস্ত বর্জ্জণ করিবেন।

"প্রযত্ন গর্ব্ভা পত্তিরব্ধিযানং মৃতস্য বাহং ক্ষুরকর্ম্ম সঙ্গম।
তস্যাস্ত যত্নেন গয়াদিতীর্থং যাগাদিকং বাস্তবিধং নকুর্য্যাৎ॥"

অর্থাৎ গর্ভবতী রমণীর পতি সমুদ্র যাত্রা, শব বহন, ক্ষুরকার্য্য গয়াতীর্থ গমন, যাগ, যজ্ঞ, বাস্ত বিধির অনুষ্ঠান করিবে না।

মহর্ষি অত্রি গর্ভ সময়ে সহবাস সম্বন্ধে বলিয়াছেনঃ—

"ষন্মাসাৎ কাময়েন্মর্ত্তো গর্ব্তিনীং স্ত্রিয়মেবহি।"

মনুষ্য ছয়মাস কাল পর্য্যন্ত গর্ব্তিণী রমণীকে প্রার্থনা করিবেন তৎপর আর নহে। ফলতঃ গর্ভাবস্থায় কোন সময়েই সহবাস করা উচিত নহে। মহর্ষি অত্রির বিধির উদ্দেশ্য এই যে যাহারা একান্ত ইন্দ্রিয় সংযমে অপারগ তাহারা ছয় মাসের মধ্যে প্রার্থনা করিবে।

৩। এত গেল পতির পক্ষে নিষেধ, এক্ষণে গর্ভিণীর পক্ষে কি কি নিষেধ তাহা পদ্মপুরাণ ও মৎস্যপুরাণ হইতে বাঙ্গালা অনুবাদ সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া হইল। যথাঃ—

" গর্ভবতী রমণী অপরিস্কার অর্থাৎ জঞ্জাল থাকে, সে স্থানে বসিবে না।

মুষল, উদূখল কি অন্য কোন উচ্চ পদার্থের উপর উপবেশন করিবে না। ডুব দিয়া স্নান করিবে না; শূন্য গৃহে বাস ও শয়ন করিবে না। নখের দ্বারা ভূমি আলোড়ন করিবে না। সদা সর্ব্বদা শয়ন করিয়া থাকিবে না। ব্যায়াম ও উৎকট্ শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম নিষিদ্ধ; তুষ, অঙ্গার, ভষ্ম ও অস্থির উপর শয়ন করিতে নাই। কলহ, গাত্রভঙ্গ অর্থাৎ হাঁইতোলা অথবা অঙ্গ মোট্টন নিষেধ। উত্তর শিরে ও অধঃ শিরে অর্থাৎ মাথানীচু করিয়া শয়ন অবৈধ। বিবস্ত্রা হওয়া, উদ্বিগ্ন হওয়া ও সদা সর্ব্বদা ভিজা পায়ে থাকা নিষিদ্ধ। সন্ধ্যাকালে ভোজনকরা গর্ভিণীর পক্ষে অকর্ত্তব্য। সদা সর্ব্বদা বৃক্ষমূলে গমন, উপবেশন নিষিদ্ধ। গর্ভিণী রমণী ঈষদ্ উষ্ণ জলে স্নান করিবে। দানশীলা ও ধর্ম্ম বিষয়ে সর্ব্বদা চিন্তা করিবে। হস্তী, অশ্ব, ও তৎপ্রকার অন্যকোন যানে উঠিবে না। পর্ব্বতারোহন. উচ্চ নীচ ভূমিতে চলাচল করা নিষেধ। ব্যায়াম, শীঘ্র গমন, দৌড়ান, শকটারোহন, শোক, রক্ত মোক্ষণ, ভয়, উপুর হইয়া বসা কামক্রীড়া দিবানিদ্রা রাত্রি জাগরণ এ সমস্ত গর্ভিণীর পক্ষে একান্ত নিষিদ্ধ। অত্যন্ত ঝাল ও অত্যন্ত অম্ল ভোজন ভাল নহে এবং বহুবার ভোজন নিষিদ্ধ। অত্যুষ্ণ, অতি শীতল ও গুরুতর দ্রব্য পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যে গর্ভিণী এই সকল নিয়ম পালন করেন, তাহার সন্তান হইলে দীর্ঘায়ু ও বুদ্ধিযুক্ত হয়। ইহার ব্যতিক্রম করিলে হয় গর্ভপাৎ না হয় সন্তানের ও গর্ভিণীর কোন না কোন অমঙ্গল ঘটনা হইয়া থাকে।"

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের শিক্ষিতা রমণীরা এ সকল নিয়ম প্রায়ই পালন করেন না!! ফলও সেইরূপই হইতেছে! যাহা হউক আমরা উপরিউক্ত সুনিয়ম গুলির বিষদ ব্যাখ্যা না করিয়া পাশ্চাত্য দেশের ডাক্তারগণ গর্ভিণীর কি কি নিয়মে থাকা কর্ত্তব্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। এ ভিন্ন গর্ভপাতের কারণ গুলিও উল্লেখ করিলাম পাঠক মহোদয়গণ! আর্য্য মহর্ষিরা প্রত্যেক বিষয়েই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অপেক্ষা কত অধিক পরিমাণে প্রত্যেক বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রতিও একটু বিশেষ দৃষ্টি করিয়া দেখিবেন।

ডাক্তার রভুক মহোদয় লিখিয়াছেন:—"গর্ভবতী রমণী অধিক ভ্রমণ,

পিছিল স্থানে ভ্রমণ, নৃত্য, গুরুদ্রব্য উঠান, অধিক নিদ্রা, নিতান্ত অল্প নিদ্রা, দিবা নিদ্রা নিষিদ্ধ, এ ভিন্ন থিয়েটার দেখা, বল খেলা ও কোন প্রকার জনতার মধ্যে যাওয়াও কর্ত্তব্য নহে।”

ডাক্তারেরা গর্ভপাতের কারণের মধ্যে ভ্রমণ, দৌড়ান, অত্যন্ত পরিশ্রম, মানসিক ভয়, ত্রাস, বিষাদ ইত্যাদি কারণ উল্লেখ করিয়া থাকেন। গর্ভাবস্থায় প্রসূতির কি কি অনিয়মে সন্তান বিকৃত, বিকলাঙ্গ, জড় ইত্যাদি হয়, তাহা ডাক্তারেরা পরিষ্কার ভাবে কোন তত্ব এ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

৭। গর্ভসঞ্চার প্রণালী।

পাশ্চাত্য দেশের ব্যারী প্রভৃতি ডাক্তারগণ স্থির করিয়াছেন যে, শুক্রকীটগণ স্ত্রীবীজ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে। ইতর জন্তুদের স্ত্রীবীজের মধ্যে শুক্রকীট থাকিতে ব্যারী সাহেব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কেবল কোন ইতর জন্তুর স্ত্রীবীজে একটী ছিদ্র থাকে, এই ছিদ্র দ্বারা শুক্রকীট তন্মধ্যে প্রবেশ করে! কিন্তু স্তনপায়ীদিগের স্ত্রীবীজে ঐ ছিদ্র দেখা যায় না। নিউ পোর্ট সাহেব বলিয়াছেন একটী স্ত্রীবীজ মধ্যে বহুসংখ্যক শুক্রকীট এবং কীটের সংখ্যা যত অধিক গর্ভ সঞ্চারের সম্ভাবনা তত অধিক। এইরূপ উভয়ের সম্মিলনে এক নূতন জীব সৃষ্ট হয়।

ফলতঃ পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতগণ এখনও জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন নিগূঢ় তত্ব অবগত হইতে পারেন নাই। এ সকল নিগূঢ় তত্ব ম্লেচ্ছ ও যবন প্রভৃতি জাতিগণ অবগত হইতে না পারাতেই হিন্দু-ধর্ম্মের সহিত তাহাদের এত বিরোধ। এ সম্বন্ধে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় “আস্তিক ও নাস্তিক * প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন আমরা তাহার কতিপয় স্থান এস্থলে উদ্ধৃত করিব। তিনি লিখিয়াছেন “ম্লেচ্ছ মনে করে যে, আঁতুড়েই জীবের সৃষ্টি; না হয় বড় জোর গর্ভেই জীবের সৃষ্টি; ওদিকে শ্মশানেই জীবের বিনাশ। আর না হয় ত মৃত্যুর পর অনন্ত স্বর্গ বা অনন্ত নরক। ম্লেচ্ছ মনে করে গর্ভ সঞ্চারের পূর্ব্বে জীব আদৌ কোথাও ছিল না। কোন

* বেদব্যাস পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।

এক রকমে অকস্মাৎ জড়পদার্থের সংঘাতেই জীবের উৎপত্তি হয়। সেই জড় সংঘাতের ক্রিয়া যখন বন্ধ হয়, জীবও সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে মিলাইয়া যায়। জীবকে যে কোটী কোটী জন্মে, কোটী কোটী যোনি পরিভ্রমণ করিয়া কোটী কোটী দেহে, কোটী কোটী বার সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়, ইহা ম্লেচ্ছ বুদ্ধির আয়ত্ত হয় না। এক জন্মের কর্ম্মফল জন্ম জন্মান্তরে জীবের অনুসরণ করে, অলক্ষিতে জীবের সুখ দুঃখের কারণ হয়, ম্লেচ্ছ একথা শুনিলে উপহাস যোগ্য প্রহেলিকা মনে করে। চৈতন্যই জড়ের আশ্রয় এবং, জড় চৈতন্যের আশ্রিত, ম্লেচ্ছ ইহা জানে না। ম্লেচ্ছ মনে করে যে, জড়ই চৈতন্যের আশ্রয়। জড় হইতেই চৈতন্যের উৎপত্তি হয়। ম্লেচ্ছ যেমন বুঝে তেমনই বুঝায়। এই সকল ধারণাই ম্লেচ্ছ শিক্ষার মূল ভিত্তি।

ব্রাহ্মণের শিক্ষা অন্যরূপ। জীবের সৃষ্টি হয় না, জীব অনাদি। দেহ ধারণের হেতু যে কর্ম্ম জীবের সুখ দুঃখের নিদান সেই কর্ম্মও অনাদি। কর্ম্ম-ফল ভেদে জীবের জাতিভেদ হয়, তাহা হইতে জীবের অধিকার ভেদ হয়। কর্ম্ম হইতেই ভিন্ন ভিন্ন জীবে সুখ দুঃখের ভেদ হয়। কর্ম্ম অনুসারেই জীবের আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে তারতম্য হয়। ইহাই ব্রাহ্মণের (হিন্দুর) ধারণা। সুতরাং শিক্ষার বিষয়, প্রয়োজন, সম্বন্ধ এবং অধিকার লইয়া ম্লেচ্ছের সহিত ব্রাহ্মণের (হিন্দুর) বিষম দ্বন্দ্ব।

ম্লেচ্ছ দেখে স্থূল, বুঝে স্থূল, ভাবেও স্থূল। স্থূল বুদ্ধি ম্লেচ্ছে সূক্ষ্ম বুদ্ধি নাই, হইতেই পারে না। স্থূলই ম্লেচ্ছের প্রমাণ। এই জন্যই ম্লেচ্ছ সকল মানুষকেই একই প্রকার মনে করে। মানুষে মানুষে জন্মগত অধিকারের বীজ ভেদ আছে এবং সেই হেতু মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি অবান্তর জাতিভেদ আছে, ম্লেচ্ছ তাহা দেখিতে পায় না, সুতরাং বুঝিতে পারে না, স্বীকারও করে না। কোন স্থূল পদার্থ কি ভাবে সংগ্রহ করিলে এবং কোন্ স্থূল পদার্থকে কি ভাবে ত্যাগ করিলে সেই অধিকার বীজের পুষ্টি বর্দ্ধন করিতে পারে এবং কাল ক্রমে উহা হইতে জাতির বিকাশ হয়, তাহা ম্লেচ্ছ বুদ্ধির অধিগম্য নহে এই কারণেই খাদ্যাখাদ্যের বিচার, সংসর্গ, বিসর্গের বিচার, ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার প্রভৃতি সূক্ষ্মতত্ত্বে ম্লেচ্ছ নিতান্তই অপটু। ম্লেচ্ছ বুদ্ধি অতিমাত্রায় তামসী বলিয়া পদার্থের স্বরূপ বা প্রকৃততত্ত্ব, তাহার সমীপে প্রতিভাত

হইতেই পারে না। অথচ তমঃ সম্ভূত অজ্ঞানের আধিক্য প্রযুক্ত ম্লেচ্ছ বুদ্ধি স্বকীয় ভ্রম বুঝিতে বা স্বীকার করিতে আরও কুণ্ঠিত হয়।"

আয়ুর্ব্বেদে ও হিন্দু শাস্ত্রে জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তত্ব লিখিত আছে, তাহা আমরা সংক্ষেপে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

সুশ্রুতে লিখিত আছে :—

"স্ত্রী পুরুষের সংসর্গ কালে বায়ুদ্বারা শরীর হইতে এক প্রকার তেজঃ (উষ্মা) উদ্ভূত হয়। ঐ তেজঃ ও বায়ুর সংযোগে পুরুষের শুক্র ক্ষরিত হইয়া গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে; এবং উহা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে—গর্ভাশয়াগত আর্ত্তব শোণিতের সহিত বিশিষ্টরূপে সংযুক্ত হইলে গর্ভরূপে পরিণত হয়।"

"ক্ষেত্রজ্ঞাঃ * * চেতনাবন্তঃ শশ্বতাঃ লোহিতরে তমোঃ সন্নিপা
তেষভিব্যজ্যন্তে ॥"

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপে শুক্র ও আর্ত্তবের সম্মিলনে অনির্ব্বচনীয় কারণে চেতনাবান্ ক্ষেত্রজ্ঞ (আত্মা) উহাতে প্রবিষ্ট হয়েন।

বাভট বলেন :—

"যেমন কাচ খণ্ড (সূর্য্যকান্ত মণি) ও সূর্য্য তেজঃ উপযুক্তরূপে সম্মিলিত হইলে তাহা হইতে অগ্নি উদ্গত হইয়া নিম্নস্থ কাষ্ঠাদি বস্তুতে অলক্ষিতভাবে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ জীবাত্মাও সংযুক্ত শুক্র শোণিতে অলক্ষিতভাবে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন।"

ভাবপ্রকাশে উক্ত আছে :—

"গর্ভাশয়স্থ শুক্র ও শোণিত চৈতন্যময় আত্মার সহিত সংমিলিত হইলেই তাহাকে গর্ভ বলা যায়।"

সুশ্রুতঃ লিখিয়াছেন।—

"অগ্নিঃসোমো বায়ুঃ সত্বংরজস্তমঃ পঞ্চেন্দ্রিয়ানি ভূতাত্মেতি প্রাণাঃ।"

অর্থাৎ, ক্ষিতি, আকাশ, অগ্নি (পাচক, ভ্রাজক, আলোচক, রঞ্জক, সাধক) সোম, (জলাত্মক, শ্লেষ্ম, শুক্র ও রস প্রভৃতি) বায়ু (প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান) মনোরূপে পরিণত সত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণত্রয়, পঞ্চেন্দ্রিয় (শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, রসন ও ঘ্রাণশক্তি) ও জীবাত্মা এই সমস্তই গর্ভের প্রাণ।"

সুশ্রুত বলেন।—

"সেই চেতন্যাবস্থিত পঞ্চভূতাত্মক গর্ভকে, বায়ু অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির বিভাগ দ্বারা বিভক্ত করে। তেজঃ, পরিপাক ক্রিয়া দ্বারা একরূপ হইতে রূপান্তরিত করে। জল, স্বীয়গুণে ক্লেদযুক্ত করে। পৃথিবী, স্বীয়গুণে কঠিন করে! আকাশ অবকাশ দানে দিন দিন বর্দ্ধিত করে।"

ভাব প্রকাশে লিখিত আছে :—

"এইরূপ বিবর্দ্ধিত গর্ভ যখন হস্ত পদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যুক্ত হয়, তখন তাহাকে শরীরী বলে।"

হিন্দু শাস্ত্র সমূহে জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তত্ত্ব লিখিয়া গিয়াছেন আমরা জাতি ভেদ প্রস্তাবে তাহা সবিস্তার উল্লেখ করিব।

৮। সন্তানের বিকৃতাঙ্গের বিবরণ।

ঋতুকালে যেরূপ অহিত ব্যবহার করিলে গর্ভের যে যেরূপ বিকৃতি হইতে পারে তাহা ঋতুবিবরণে কথিত হইয়াছে। গর্ভাবস্থায় যে সকল অহিত ব্যবহার করিলে গর্ভের যে যেরূপ বিকৃত হইতে পারে তাহা গর্ভিনী-চর্য্যা প্রকরণে কথিত হইয়াছে। অবশিষ্ট কতিপয় বিকৃত বিবরণ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

ভাব প্রকাশে লিখিত আছে :—

"গর্ভিনীর অধিকাংশ মধুর দ্রব্য, এবং স্নিগ্ধ, হৃদ্য, দ্রব, লঘুপাক, সুসংস্কৃত ও অগ্নিদীপ্তিকর দ্রব্য ভোজন করা কর্ত্তব্য। এবং দুর্গন্ধ বস্তু আঘ্রাণ, নয়নের অপ্রিয় বস্তু দর্শন, কর্ণের অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ, শুষ্ক পর্য্যুষিত, বা দুর্গন্ধ অন্ন ভোজন, অত্যুচ্চস্বরে বাক্য কথন, গাত্রে অধিক তৈল মর্দ্দন বা গাত্র মার্জ্জন, কঠিন আসনে উপবেশন, অত্যুচ্চ স্থানে শয়ন নিতান্ত অকর্ত্তব্য।"

বাভট বলেন :—

"কারণ ঐ সমস্ত অহিত আহার ও আচরণ করিলে গর্ভস্রাব, অথবা কুক্ষি মধ্যেই গর্ভ শুষ্ক বা মৃত হইতে পারে।"

সুশ্রুত লিখিয়াছেন :—

"গর্ভিনীর যে যে দ্রব্যে অভিলাষ জন্মে, তাহা প্রাপ্ত না হইলে গর্ভস্থ"

সন্তান কুব্জ, কুণী (বিকৃত হস্ত), মূক (বোবা) মিম্মিন (সানুনাসিক ভাষী) খঞ্জ (খোড়া) জড়, বামন, বিকৃতচক্ষু (ট্যারা) অথবা অন্ধ হইতে পারে। কারণ মাতার অভিলাষেই গর্ভস্থ সন্তানের অভিলাষ প্রকাশ পায়, তাহা পূর্ণ না হইলে অসম্পূর্ণতা হেতু সন্তান বিকৃতাঙ্গ হইতে পারে।"

৯। যমজ ও ক্লীব সন্তান হওয়ার কারণ!

এ সম্বন্ধে সুশ্রুতঃ বলেন :—

"স্ত্রী এবং পুরুষের সংযোগ কালে গর্ভাশয়ে পতিত বীজ (শুক্র) গর্ভাশয়স্থ বায়ু কর্ত্তৃক দুই অথবা অধিকভাগে বিভক্ত হইলে যমজ সন্তান উৎপন্ন হইয়া থাকে।"

"শুক্র এবং শোণিতের সাম্যাবস্থায় থাকিলে নপুংসক সন্তান জন্মে।"

১০। সন্তানের বিবিধ বর্ণ প্রাপ্তির কারণ ?

এ সম্বন্ধে সুশ্রুতঃ গ্রন্থে লিখিত আছে :—

"পঞ্চভূতান্তর্গত তেজঃধাতু পার্থিবাদি ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া বিবিধ বর্ণের উৎপত্তি করে। গর্ভোৎপত্তিকালে তেজধাতু অধিকাংশ জলীয় ধাতুর সহিত মিলিত হইলে গর্ভগৌর বর্ণ হয়, ঐ তেজঃ ধাতু অধিকাংশ পার্থিব ধাতুর সহিত মিলিত হইলে গর্ভ কৃষ্ণ বর্ণ হয়। অধিকাংশ পার্থিবও আকাশীয় ধাতুর সহিত মিলিত হইলে কৃষ্ণ শ্যামবর্ণ হয়। এবং ঐ তেজধাতু অধিকাংশ জলীয় ও আকাশীয় ধাতুর সহিত মিলিত হইলে গৌর শ্যামবর্ণ হয়।"

ধর্ম্ম রক্ষা।

(প্রাপ্ত, বৃদ্ধের লেখা)

এই সংসারে অনাদিকাল হইতে সনাতন ধর্ম্ম চলিয়া আসিতেছে সত্য কিন্তু বর্ত্তমানে বাহ্য দৃষ্টিতে সেই সনাতন ধর্ম্ম মলিন বলিয়া বোধ হইতেছে। এরূপ মলিন হইবার হেতু কি ও তাহা কি প্রকারেই বা সংশোধন হয়, এই প্রশ্নই হিন্দু হৃদয়ে সর্ব্বদা সমুত্থিত হইয়া থাকে।

কিন্তু ধর্ম্ম কখন মলিন হয় নাই, ধর্ম্ম চিরকাল সমান আছে তাহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই। যথা—

মাসাব্দ যুগ কল্পেষু গতাগম্যে ষনেকধা
নোদেতি নাস্ত মেত্যেকা সম্বিদেষা স্বয়ম্প্রভা।

ধর্ম্ম কখন মলিন হয় নাই, মলিন হইবার বস্তু নয়। তবে সংসারের লোকের মন্দ বাসনাতে বুদ্ধি মলিন হইয়াছে, বুদ্ধি দোষে ধর্ম্মকে মলিন বোধ হইতেছে।

যেমন মেঘাচ্ছন্ন ও কুজ্ঝটিকাদিতে সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে, তাহাতে সূর্য্যকে মলিন দেখায়, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সূর্য্য মলিন হয় নাই ও তাহার প্রকাশ-সভাব আবরিত হয় নাই। সূর্য্য প্রকাশেই আবরণ গুলি প্রকাশ পাইতেছে, সূর্য্য যেমন তেমনি আছে, তিনি জানেন না যে তাঁহাকে আবরণ করিয়াছে। তদ্রূপ ধর্ম্ম মলিন হয় নাই, বুদ্ধির মলিনে ধর্ম্মের মলিন বোধ হইতেছে।

বুদ্ধি যত্ন করিলে পরিষ্কার হয়। বুদ্ধি নির্ম্মল হইলেই নির্ম্মল ধর্ম্ম প্রকাশ পায়, কেবল বুদ্ধির মলিনে ধর্ম্ম মলিন বোধ হয় এইমাত্র।

পিতলের দ্রব্য ভস্ম ও মৃত্তিকাদির দ্বারা পরিষ্কার হয়, বুদ্ধি তাহা হয় না। বুদ্ধি গুণেতে পরিষ্কার ও অপরিষ্কার হয়। রজস্তমোভিভূত বুদ্ধি মলিন হয়, সত্ত্ব-গুণেরআবির্ভাব হইলে পরিষ্কার হয়। মলিন সত্ত্বতে অসৎ কার্য্য ও মলিন বাসনা উৎপত্তি করে, তজ্জন্য বুদ্ধি মলিন হয়। শুদ্ধ সত্ত্বতে সৎকার্য্য ও সৎ বাসনা হয়, তাহাতে বুদ্ধি পরিষ্কার হয়।

সৎ কার্য্য কি? নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য, ঈশ্বরারাধনা, বেদবিহিত কার্য্যের অনু-ষ্ঠান ও নিষিদ্ধ কার্য্য পরিত্যাগ। ঈশ্বর পূর্ণ সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট, ঈশ্বরারাধনা করিলে সত্ত্ব গুণের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলেই মলিনসত্ত্ব ও রজস্তম দূর হয়। ঈশ্বর সৎ শব্দ বাচ্য সত্য স্বরূপ, যে ব্যক্তি সত্যকে আশ্রয় করে সেই পুরুষ ধন্য, তাহার অভাব কিছুমাত্র থাকে না। এখন আক্ষেপ করিতেছি, কিন্তু যখন আমাদের ১৫।১৬ বৎসর বয়ক্রম হইয়াছিল, ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিতে পারিয়াছিলাম তদবধি যদি মিথ্যা ব্যবহার না করিতাম ও মিথ্যা কথা না বলিতাম, সত্যরূপে ব্যবহার ও সত্যের সহিত আলাপ করিতাম, মিথ্যা কাহাকে বলে না

জানিতাম, কেবল সত্যের সহিত আলাপ রাখিতাম, তবে এক্ষণ যাহা করিতাম বা যাহা বলিতাম তাহা সমস্ত সত্যই হইত। এক্ষণ অন্তকরণের ভাব ওজন করিয়া দেখিতেছি, মিথ্যার সঙ্গে সম্পূর্ণ আলাপ, সত্যের সহিত আলাপ নাই বলিলেই হয়। যদি কিছু সত্য বলি তাহা মিথ্যাতে মিশাইয়া যায়, যে হেতু মিথ্যার ওজন বেশি হইয়াছে। যেমন বার সের কালিতে দুই সের জল ঢালিলে তাহাও কালি হইয়া যায়, আর যদি বার সের জলে ২।৪ ফোটা কালি পড়ে তাহা মালুম হয় না, জলে মিশিয়া যায়। অতএব সত্যের প্রতি যার নির্ভর সে যদি ২।১ টা মিথ্যাও বলে তাহাও সত্য হইয়া যায়, যে হেতু তাহার মিথ্যার সহিত আলাপ নাই।

বিধাতার সৃষ্টি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ। সত্ত্বগুণে ব্রাহ্মণ, রজগুণে ক্ষত্রিয়,রজস্তম মিশ্রিত বৈশ্য, তমগুণে শূদ্র, এইরূপ গুণভেদে চারি বর্ণ হইয়াছে।

তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ, হইতেই সংসারের মঙ্গল হয়। কি প্রকারে সংসারের মঙ্গল হইবেক ব্রাহ্মণের কেবল এই চেষ্টা। ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট, তাহার নিজের স্বার্থ কিছুই নাই, নিজে কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়া পরের উপকার করাই ব্রাহ্মণের কার্য্য। এইরূপ চিরকাল করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতেই জগতের মঙ্গল হইয়াছে; ধর্ম্মের হানি বোধ হয় নাই। এক্ষণ সেই ব্রাহ্মণ সকল আপন বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অপর জাতির বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন তজ্জন্য সত্ত্বগুণের হ্রাস হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। প্রধানের দোষ হইলে সকলের দোষ হয়। ব্রাহ্মণ সকল যদি স্বধর্ম্মে থাকিতেন তবে অন্যান্য জাতি তদনুসারে ও তদনুগামী হইয়া চলিতেন, তাহারা কখনই বিপথগামী হইতে পারিতেন না। ব্রাহ্মণ সকল কুপথগামী হওয়াতেই অন্যান্য জাতি তাহারাও কুপথগামী হইয়াছে। সকলেই জানেন যে—স্বধর্ম্মে মরণং শ্রেয় পরধর্ম্ম ভয়াবহ।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে কালের দোষ। কিন্তু কালত চিরকাল আছে সে কাহাকেও সৎপথে চলিতে মানা করে না, কাহারো অনিষ্টও করে না তবে যে কালের দোষ দেওয়া অবিবেক মাত্র। কাল কাহাকে বল, কাল বস্তু কি?

কল্পনাৎ সর্ব্ব ভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং নিমেষতঃ।
কাল শব্দেন নির্দ্দিষ্টো হ্যখণ্ডানন্দো অব্যয়ঃ।

কাল কাহারো বিরোধি নয়। চারিটি যুগ। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। সত্য যুগ শৈশবাবস্থা, ত্রেতা যুগ যৌবনাবস্থা, দ্বাপর প্রৌঢ়াবস্থা, কলিযুগ বৃদ্ধাবস্থা। যেমন যুগের অবস্থা তদ্রূপ জীবের অবস্থা। সত্যযুগে জীবের বাল্যাবস্থা, ত্রেতাযুগে যৌবনাবস্থা, দ্বাপর যুগ প্রৌঢ়াবস্থা, কলিযুগ জীবের বৃদ্ধাবস্থা। অবস্থানুসারে কার্য্যও চলিয়া আসিতেছে। এক্ষণে বৃদ্ধাবস্থা। বৃদ্ধাবস্থাতে যৌবন কালের কার্য্য হয় না ও অন্যান্য কালের কর্ম্ম হয় না। মনের আশা মাত্র থাকে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে ঘোরতর তপস্যাদি কঠিন কার্য্য করিবার সামর্থছিল তাহা তৎকালিন করাও হইয়াছে। বর্ত্তমানে মনুষ্য সকল বীর্য্য হীন দুর্ব্বল, তদ্রূপ কঠিন কার্য্য করিবার যোগ্য নয়, তবে যেমন সামর্থ তাহারি মধ্যে মহৎ উপায় রহিয়াছে। কঠিন পরিশ্রম করিতে হইবে না, যেমন সামর্থ তাহাতেই কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে।

তাহা কি। সত্যকে আশ্রয় করা, মিথ্যার সঙ্গে আলাপ এক বারে পরিত্যাগ করা। এক সত্যকে আশ্রয় করিলে তৎপ্রতাপে হিংসা দ্বেষাদি পলায়ন করিবেক, তাহা হইলে পরোপকারে মতি হইবে। পরোপকার তুল্য কোন ধর্ম্ম নাই, পরস্পর উপকার করিলে সুখের সংসার হইবে, ধর্ম্মও উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশ পাইবে। যাহা প্রকাশ করিলাম তাহা সমস্তই প্রকাশই আছে, কিন্তু থাকিলে কি হইবে? জেনেও যেন না জানা হইয়া রহিয়াছে। এদোষ কিসে সংশোধন হয়? শাস্ত্রও আছে, সকলি আছে, একমাত্র উপদেশের অভাব দেখিতেছি ও দেখা যাইতেছে। যদি বা উপদেশ হয় তাহা কোন কার্য্যকারক হয় না, কারণ গোঁপের বাড়িতে গোঁপ বসেনা, তবে যখন ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষগণ সংসারের প্রতি সুদৃষ্টি করিয়া এই মহামণ্ডলী সভা স্থাপন করিয়াছেন তখন ভরসা হইয়াছে যে উত্তম রূপে সদুপদেশ হইবেক, সৎব্যক্তির উপদেশ সকলে গ্রহণ করিবেন। শাস্ত্রে এই নিয়ম্ আছে। অবিচারে যে দোষ জন্মে তাহা বিচারে সংশোধন হয়। সদুপদেশ দেওয়া সৎব্যক্তিরই কার্য্য—অন্যের নয়। যথা:—

উপদেশ মবাপ্যৈব মাচার্য্যা তত্ত্ব দর্শিনঃ॥

তত্ত্বদর্শি আচার্য্যের উপদেশ কে না শুনিবে? সকলে একাগ্রচিত্ত হইয়া

শ্রবণ করিবে এবং তাহার ভাব গ্রহণ করিবে। সর্ব্বদা সৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ করিতে করিতে পূর্ব্ববুদ্ধি পরিত্যাগ হইয়া সৎবুদ্ধির উদয় হইবেক। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ সকল ব্যক্তির গতি জানেন। কোন বুদ্ধিকে কোন উপদেশে নির্ম্মল করিতে হয়, তাহার কৌশল জানেন। নানা লোকের নানা বুদ্ধি, তজ্জন্য শাস্ত্রোপদেশও মত নানা রূপ কহিয়াছেন। যথা—

লোকানাং বুদ্ধি মালোক্য মতং নানা প্রকাশয়েৎ।

ব্রাহ্মণ সকল ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় রহিয়াছেন, বিচাররূপ বায়ুর দ্বারা ভস্ম দূরিকরণ করিলে অগ্নি প্রকাশ হইবে। ব্রাহ্মণ জাতি বড় বুদ্ধিমান ও সুচতুর, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ ব্যতিরেকে তাহাদের বুদ্ধি সংশোধন বা সংশয় ছেদন করা অন্যের সাধ্য নয়। অধিক কি লিখিব, একমাত্র ব্রাহ্মণগণ অসদ্বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া সৎবৃত্তিতে প্রবর্ত্ত হইলেই জগতের মঙ্গল হয় নির্ম্মল ধর্ম্মও প্রকাশ পায়।

পতির প্রতি পত্নীর ব্যবহার।

অসদ্ভার্য্যার-লক্ষণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইতরা চ ধনং বিত্তং মাসং বীর্য্যং বলং সুখম্।
সাশঙ্কা বাল ভাবেতু যৌবনেঽভিমুখী ভবেৎ॥

কিন্তু ইহারা পতির ধন, বিত্ত, মাংস, বীর্য্য, বল ও সুখ সকলেই শোষণ করে; ইহারা বাল্যবস্থায় ভীতা ও যৌবনাবস্থায় অভিমুখী হয়।

দ—সং—৮।

তৃণবন্মন্যতে নারী বৃদ্ধভাবে স্বকং পতিম্।
স্বকার্য্যে বর্ত্তমানা চ স্নেহান্ন চ নিবারিতা॥

এই সকল নারীরা বৃদ্ধাবস্থায় পতিকে তৃণতুল্য জ্ঞান করে এবং স্নেহ পূর্ব্বক নিবারিত হইলেও স্বকার্য্য সাধনে তৎপর থাকে।

দ—সং—৪।৯।

ক্রোধে ক্রোধবতী নারী ভোজনে রাক্ষসী সমা।
বিপদে কটুভাষী চ সা ভার্য্যা প্রাণঘাতিকা॥

যে স্ত্রী পতির ক্রোধাবস্থায় কোপনা ও ভোজনকালে রাক্ষসীর ন্যায় এবং বিপৎকালে কটুভাষিণী হয়, সেই স্ত্রী প্রাণ নাশিণী।

ক—রা।

যস্য ভার্য্যা বিরূপাক্ষী, কশ্মলা কলহ প্রিয়া।
উত্তরোত্তর বাদাস্যা সা জরা ন জরা জরা॥

যে ভার্য্যা বিরূপাক্ষী, কশ্মলা (দুবৃত্তা), কলহ প্রিয়া এবং সমান, উত্তর দায়িনী সেই নারীই পুরুষের জরা, বার্দ্ধক্যাবস্থা জরা নহে।

গ—পু—১।১০৮।২৩।

যস্যা ভার্য্যাশ্রিতান্যত্র পরবেশ্মাভিকাঙ্খিনী।
কুক্রিয়া ত্যক্ত লজ্জা চ স জরা ন জরা জরা॥

যে ভার্য্যা অন্যাশ্রিতা, পরগৃহাভিলাষিণী, কুক্রিয়াশক্তা ও নির্লজ্জা, তাহাকেই জরা বলা যায়, বার্দ্ধক্যাবস্থা জরা নহে।

ঐ—২৪।

দুষ্টা ভার্য্যা শঠং মিত্রং ভৃত্যশ্চোত্তর দায়কঃ।
স সর্পে চ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ।

ভার্য্যা যদি দুষ্টা হয়, মিত্র যদি শঠ হয়, ভৃত্য যদি উত্তর দায়ক হয় এবং সসর্প গৃহে যদি বাস করা যায় তাহা হইলে তাহাই মৃত্যু সন্দেহ নাই।

গ—পু—১।১০৮।২৬।

স্ত্রীলোকদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিরূপণ।

স্ত্রীণাঞ্চ পতিদেবানাং তচ্ছুশ্রূষানুকূলতা।
তদ্বন্ধুষমুবৃত্তিত্বং নিত্যং তদ্ব্রত ধারণং॥

পতি দেবতা মহিলাগণের প্রত্যহ পতিশুশ্রূষা, পতির অনুকূলতা, পতির

বন্ধুগণের সন্তোষোৎপাদন এবং পতি যে নিয়ম প্রতিপালন করেন সেই নিয়ম ধারণ, এই চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম।

ভা—পু—৭।১১।২৪।

সম্মার্জ্জনোপলে পাভ্যাং গৃহমণ্ডল বর্ত্তনৈঃ।
স্বয়ঞ্চ মণ্ডিতা নিত্যং পারিমৃষ্ট পরিচ্ছদা।
কামৈরুচ্চাবচৈঃ সাধ্বীপ্রশ্রয়েন দমেন চ।
বাক্যৈঃ সত্যৈঃ প্রিয়ৈঃ প্রেম্নাকালে কালে ভজেৎপতিং।
সন্তুষ্টা লোলুপা দক্ষা ধর্ম্মজ্ঞা প্রিয় সত্যবাক্।
অপ্রমত্তা শুচিঃ স্নিগ্ধা পতিংত্বপতিতং ভজেৎ।

পতিপরায়ণা নারীগণ যথাকালে সম্মার্জ্জন ও লেপন দ্বারা গৃহের শোভা ও সৌগন্ধ সম্পাদন ও গৃহোপকরণ দ্রব্যাদি পরিষ্কার করিবেন এবং স্বয়ং বেশ ভূষা করিয়া পতির নানাবিধ অভিলাষ পূর্ণ করিবেন; পতির প্রণয়িনী হইবেন এবং তাঁহাকে স্বেচ্ছামত কার্য্য করিতে দিবেন; তাঁহার উপর ক্রোধ কিম্বা অভিমান করিবেন না; তাঁহার নিকট সত্য অথচ প্রিয় বাক্য কহিবেন এবং প্রেম সহকারে তাঁহাকে ভজনা করিবেন; যখন যাহা কিছু প্রাপ্ত হইবেন তখন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবেন; লোভ পরিত্যাগ করিবেন; আলস্য পরিহার করিবেন; ধর্ম্মশিক্ষা করিবেন; প্রিয় অথচ সত্য বাক্য প্রয়োগ করিবেন; সর্ব্বদা সাবধান ও শুচি থাকিবেন এবং শান্ত স্বভাব হইবেন। পতিকে এই ভাবে ভজনা করিবেন, যদি সেই পতি মহাপাতকের পাতকী না হন।

ভা—পু—৭।১১।২৬।২৭।

যা পতিং হরি ভাবেন ভজেচ্ছ্রীরিব তৎপরা।
হর্য্যাত্মনা হরের্লোকে পত্যাশ্রীরিব মোদতে॥

যে রমণী লক্ষ্মী সদৃশ পতি পরায়ণা হইয়া পতিকে হরিভাবে ভজনা করেন, তিনি হরির লোকে হরির সহিত একাত্মভূত হইয়া পতিকে লইয়া লক্ষ্মীর ন্যায় আনন্দে কালযাপন করেন।

ভা—পু—৭।১১।২৮।

উচ্চাসনং ন সেবেত ন ব্রজেৎ পরবেশ্মসু।
ন ত্রপাকর বাক্যানি বক্তব্যানি কদাচন॥

স্ত্রী কখন উচ্চাসনে উপবেশন, পর গৃহে গমন ও লজ্জাকর বাক্য প্রয়োগ করিবে না।

কা—খ—৩।৩৮।

অপবাদো ন বক্তব্যঃ কলহংদূরতস্ত্যজেৎ।
গুরুণাং সন্নিধৌ ক্বাপি নোচ্চৈরুয়ান্ন বা হসেৎ॥

এবং পরনিন্দা, কলহ, গুরুজন সান্নিধ্যে উচ্চৈঃস্বরে বাক্য প্রয়োগ ও হাস্য এই সকল একবারেই ত্যাগ করিবে।

কা—খ—৪।৩৯।

বাহ্যা দায়ান্তু মালোক্য তরিতা চ জলাসনৈঃ।
তাম্বুলের্ব্যজনৈশ্চৈব পাদসম্বাহনা দিভিঃ।
তথৈর চাটুবচনৈঃ-খেদসংনোদনৈঃপরৈঃ।
যা প্রিয়ং প্রীণয়েৎ প্রীতা ত্রিলোকী প্রীণিতা তয়া॥

স্বামীকে স্থানান্তর হইতে আসিতে দেখিয়া, যে রমণী ত্বরা পূর্ব্বক জল, আসন, তাম্বুল, ব্যজন, পাদ সম্বাহন, চাটু বচন, খেদসংনোদন ইত্যাদি উপায়ে প্রীতি সহকারে তাঁহার তৃপ্তি বিধান করে, ত্রিভুবন তাঁহার প্রতি প্রীত হয়।

ঐ—৪৬।৪৬।

নেক্ষেৎপতিং ক্রুরদৃষ্ট্যা শ্রাবয়েন্নৈব দুর্ব্বচঃ।
না প্রিয়ং মনসা বাপি চরেদ্ভর্ত্তুঃ পতিব্রতা॥

স্ত্রীলোক পতিকে ক্রুর দৃষ্টিতে অবলোকন করিবে না এবং দুর্ব্বাক্য ও শ্রবণ করাইবে না; ফলতঃ পতিব্রতা নারী মনোদ্বারাও স্বামীর অপ্রিয়াচরণ করিবে না।

ম—নি—ত—৮।১০।৩

স্বর্ভর্ত্তরি চ কৃষ্ণে চ ভেদবুদ্ধিং করোতি যা।
কটূক্ত্যা তাড়য়েৎ কান্তং সা গোহত্যাং লভেৎ ধ্রুবং।

যে নারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ও স্বীয় ভর্ত্তাতে ভেদজ্ঞান করে এবং কটুবাক্য দ্বারা কান্তকে তাড়ন করে, সেই স্ত্রী গোহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে।

ব্র—বৈ—পু—২—৩০—১৮৩।

যা স্ত্রী মূঢ়া দুরাচারা স্বপতিং হরি রূপিণং।
ন পশ্যেত্তর্জ্জনং কৃত্বা কুম্ভীপাকং ব্রজেৎ ধ্রুবং॥

যে দুরাচারিণী মূঢ়া নারী স্বীয় পতিকে হরি স্বরূপ দর্শন না করিয়া তাহার প্রতি তর্জ্জন করে, দেহাবসানে সে কুম্ভীপাক নরকে গমন করে ইহাতে সন্দেহ নাই।

ব্র—বৈ—পু—৪।৭৫।৪১।

বাক্তর্জ্জনাৎ ভবেৎ কাকো হিংসনাৎ শূকরো ভবেৎ।
সর্পো ভবতি কোপেন দন্তে চ গর্দ্দভো ভবেৎ॥
কুক্কুরী চ কুবাক্যেনাপ্যন্ধশ্চ বিষ দর্শনাৎ।
পতিব্রতা চ বৈকুণ্ঠং পত্যাসহ ভবেৎ ধ্রুবং॥

নারী পতির প্রতি বাক্তর্জ্জনে কাক, হিংসাতে শূকর, কোপ প্রকাশে সর্প, দন্তে গর্দ্দভ, কুবাক্য প্রয়োগে কুক্কুরী ও বিষ দৃষ্টিতে অন্ধরূপে জন্মান্তরে সঞ্জাত হয়। কিন্তু পতিব্রতা নারী দেহান্তে নিশ্চয় পতির সহিত বৈকুণ্ঠধামে বাস করিতে পারে।

ঐ—৪২।৪৩।

ঋতু স্নাতা তু যা নারী ভর্ত্তারং নোপসর্পতি।
সা মৃতা নরকং যাতি বিধবা চ পুনঃ পুনঃ॥

যে স্ত্রী ঋতু স্নাতা হইয়া স্বামীর নিকট উপগতা না হয়, সে মৃত্যুর পর নরকে গমন করে এবং অনেক জন্ম বৈধব্য যন্ত্রনা ভোগ করে।

প—সং—৪।১৪

পতিং যা নাভিচরতি মনোবাগ্দেহসংযতা।
সা ভর্ত্তৃলোকানাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে॥

যে স্ত্রী কায়মনো বাক্যে সংযত হইয়া পতির অভিচার না করেন, তিনি ভর্ত্তৃলোক প্রাপ্ত হন, এবং সল্লোকেরা তাঁহাকে সাধ্বী বলিয়া প্রশংসা করেন।

ম—সং—৫।১৬৫।

পতিং হিত্বাপকৃষ্টং স্বমুৎকৃষ্টং যা নিষেবতে।
নিন্দৈব সা ভবেল্লোকে পর পূর্ব্বেতি চোচ্যতে॥

যে স্ত্রী অপকৃষ্ট পরিত্যাগ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট পুরুষকে পতি ভাবে ভজনা করে, সে ইহলোকে নিন্দনীয়া হয় এবং সকলে তাহাকে পর পূর্ব্বা (অর্থাৎ পূর্ব্বে ইহার অন্য পতি ছিল এই কথা) বলে।

ঐ—১৬৩

কামান্মোহাদ্যদা গচ্ছেত্ত্যক্ত্বা বন্ধূন সুতান পতিং।
সা [illegible] র লোকে মানুষেষু বিশেষতঃ॥

যদি কো [illegible] হেতু ও মোহ হেতু ভর্ত্তাকে, পুত্রগণকে ও বন্ধুগণকে পরি[illegible] মন করে, সে ইহলোকে বিশেষত পরলোকে নষ্টা হয়।

প—সং—১০।৩২

[illegible] ব্যাধিতঞ্চৈব ভর্ত্তারং যাহবমন্যতে।
[illegible] শূকরী সা জায়তে চ পুনঃ পুনঃ॥

যে [illegible] ক দরিদ্র বা ব্যাধিত দেখিয়া অবমাননা করে, সে পুনঃ [illegible] ও শূকরী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে।"

সং—সং—৪।১৮

অপত্যলোভাদ্যাতু স্ত্রী ভর্ত্তারমতিবর্ত্ততে।
সেহ নিন্দামবাপ্নোতি পতিলোকাচ্চ হীয়তে॥

যে স্ত্রীলোক অপত্য লোভে ভর্ত্তাকে অতিক্রম করিয়া ব্যাভিচারিণী হয়, তাহার ইহলোকে নিন্দাহয় ও পরলোকে স্বর্গ লাভ হয় না।

ম—সং—৫। ১৬১।

সর্ব্বাসামেক পত্নীনামেকাচেৎ পুত্রিনী ভবেৎ।
সর্ব্বাস্তাস্তেন পুত্রেণ প্রাহ পুত্রবতীর্ম্মনুঃ।।

এক পতির বহুস্ত্রীর মধ্যে এক জনও পুত্রবতী হইলে সেই পুত্রে সকলেই পুত্রবতী হইবে, ইহা মনু আদেশ করিয়াছেন। ঐ—৯।১৩৮।

ক্রমশঃ—

সম্পাদকের নিবেদন।

দেখিতে দেখিতে বেদব্যাসের জীবনের আর একটী বৎসর অতীত হইল। বিগত বৎসর আমরা নানাবিধ দুর্ঘটনা চক্রে পড়িয়া যথা সাধ্য স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে সক্ষম হই নাই, সে জন্য পাঠকগণ সমীপে আমরা অপরাধী। কিন্তু এ অপরাধ আমাদের ভাগ্য দোষে ঘটিয়াছে। ভাগ্য চক্রের গতি অতিক্রম করা মানুষের কি দেবতারও অসাধ্য। তাহাতে আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল মনুষ্য যে ভাগ্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে সক্ষম হইবে তাহা একান্তই অসম্ভব। মানুষ সামান্য বহির্জগতের ঘটনায় আত্মহারা হইয়া যায়, আপনার কর্ত্তব্য স্থির রাখিতে পারে না। অদৃষ্টের বিষম বিপাকে পড়িয়া আমাদিকে আধিভৌতিক আধিদৈবিক, ও আধ্যাত্মিক ত্রিবিধ বিপ্লবে বিপর্য্যস্ত হইতে হইয়াছে। কেবল একমাত্র সেই সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী, সর্ব্বসন্তাপহারিণী, সর্ব্বদুঃখাপসারিণী মহামায়া জগদম্বার কৃপামাত্র অবলম্বন করিয়া এ ঘোর বিপ্লব হইতে আত্মরক্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছি, অতএব গ্রাহকগণ সমীপে প্রার্থনা যে আমাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্যের ত্রুটীর কারণ অবগত হইয়া আমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

কেবল ব্যক্তি বিশেষ মাত্রের স্কন্ধে বেদব্যাস পরিচালন রূপ দুরূহ কার্য্যের যাবতীয় ভার ন্যস্ত থাকাতে নানাবিধ গোলযোগ ঘটিবার কারণ হইয়াছে। এক দিকে গ্রাহকগণের মূল্য প্রদানে অনবধানতা বশতঃ অর্থ সংকুলনের চিন্তা, অন্য দিকে, শাস্ত্রীয় উদ্দেশ্য শাস্ত্রীয় মর্ম্ম বজায় রাখিয়া, শাস্ত্র তত্ত্ব প্রকাশ করার ভাবনা। এই দুই চিন্তা একাধারে সুসিদ্ধ হওয়া অসম্ভব। সংসারে অর্থের জন্য বিব্রত হইয়া পড়িলে কোন সদনুষ্ঠান দ্বারা

হইতে পারে না, ইহা সর্ব্বসিদ্ধান্তিত সত্য। বেদব্যাসের গ্রাহকগণের ন্যায় প্রবীণ, ধার্ম্মিক, বিবেচক গ্রাহকগণ এ সমস্ত অবগত থাকিয়াও বেদব্যাসকে অর্থ সাহায্যরূপ উৎসাহ প্রদানে পরাঙ্মুখ থাকেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। ধর্ম্ম পত্রিকার গ্রাহকগণকে ইহার অধিক সূচিত করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। যাহা হউক, আগামী বর্ষে এককালীন উক্ত দুই বিসম্বাদী ভাবনায় বিব্রত হইয়া যাহাতে স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ না হইতে হয় তজ্জন্য নূতন রূপ ব্যবস্থায় বেদব্যাস পরিচালনে সংকল্প করিলাম। আমরা আগামী বৎসর হইতে অর্থাৎ সন ১২৯৯ সাল হইতে বেদব্যাস সম্বন্ধীয় আর্থিক যাবতীয় স্বত্ব ধর্ম্ম মণ্ডলীকে প্রদান করিলাম। বেদব্যাস এখন হইতে ধর্ম্ম মণ্ডলীর মুখপত্র স্বরূপ হইয়া পরিচালিত হইবে। বার্ষিক মূল্য সমর্থ পক্ষে চারি টাকা ও অসমর্থ পক্ষে দুই টাকা ধার্য্য হইল। ইহার ন্যুন মূল্যে আর কাহাকেও বেদব্যাস দেওয়া হইবে না। বৃহৎ আকারে, সুন্দর আয়তনে, উত্তম কাগজে পরিষ্কার রূপে মুদ্রিত হইয়া যথা নিয়মে প্রকাশিত হইবে। অর্থাৎ জমিদারী পঞ্চায়েৎ নামক পত্রিকা যেরূপ আকারে প্রকাশিত হইতেছে ঐরূপ ভাবে অন্যূন চারি ফর্ম্মায় প্রকাশিত হইতে থাকিবে। স্বধর্ম্মানুরাগী প্রসিদ্ধ চিন্তাশীল সুলেখক কর্ত্তৃক সুন্দর সুন্দর ভাবপূর্ণ রচনা যাহাতে অধিকতর প্রকাশিত হয়, তাহার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। সংক্ষেপতঃ বেদব্যাসকে যথোচিত আসন প্রদান জন্য যেরূপ অর্থ ব্যয় ও বুদ্ধি পরিচালনের প্রয়োজন তাহাতে কিছুমাত্র ত্রুটী হইবে না। বেদব্যাসের যাহাতে অকাল বিশ্রাম না হয় সাধ্যমতে সেপক্ষে যত্নবান বলিয়াই আমরা এ বন্দোবস্তে অগ্রসর হইলাম। সেই জন্যই ধর্ম্ম মণ্ডলীর সহিতও আমরা এই সর্ত্তে এ ব্যবস্থায় সম্মত হইলাম যে ধর্ম্ম মণ্ডলী যদি কখন বেদব্যাস পরিচালনে অনিচ্ছুক বা অক্ষম হন অথবা কোনরূপ শৈথিল্য প্রকাশ করেন তখন পুনরায় উঁহার উক্ত স্বত্ব ধর্ম্মমণ্ডলী আমাদিগকে প্রত্যার্পন করিতে বাধ্য থাকিবেন। অতএব হে স্বধর্ম্মানুরাগী পাঠকগণ! আপনারাও বেদব্যাসকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য নববর্ষ হইতে স্বীয় কর্ত্তব্যানুরূপ সাহায্য প্রদানে অগ্রসর হইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করুন।